পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গল্প

জার্মানী

অনুবাদক

মনোজিৎ বসু

মিত্র ও ঘোষ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

— সাড়ে তিন টাকা—

মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে শ্রীভানু রায় কর্তৃক প্রকাশিত। দত্ত প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ২৪, বাগমারী রোড, কলিকাতা হইতে শ্রীবিভূতিভূষণ পাল কর্তৃক মুদ্রিত।

লেখক-পরিচিতি

জে. ফ্রেড্‌রিক. কাইণ্ড্

জার্মান সাহিত্যে প্রাচীন শ্রেষ্ঠ লেখকদের অন্যতম হ'লেন জে. ফ্রেড্‌রিক. কাইণ্ড। খ্রী:১৭৬৮ অব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। "ভিক্ষুকের বিবাহ যৌতুক" গল্পটি তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। ইনি খুব ভাবপ্রবণ সাহিত্যিক। তাঁর বর্তমান গল্পটি ভাব ও নীতির দিক থেকে মনকে সহজেই আকর্ষণ করে। একটা বিশ্বজনীন-সুর যেন বেজে উঠেছে প্রতি ছত্রে ছত্রে। খ্রী: ১৮৪৩ অব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

ক্যাশপার ফ্রেড্‌রিক গট্‌শ্যাক

ইনিও প্রাচীন জার্মান-সাহিত্যিক। খ্রী: ১৭৭২ অব্দে এঁর জন্ম। বর্তমান সঙ্কলনে তাঁর "কৃপণ" গল্পটি সন্নিবেশিত করা হয়েছে। গল্পটি নীতি, উপদেশ ও চরিত্র গঠনের দিক দিয়ে সারগর্ভ। এঁর রচনা থেকেই অষ্টাদশ শতকের শেষ দিককার জার্মান গল্পের ধারা কোন পথ অনুসরণ ক'রে চলেছিল, তা অনেকটা বোঝা যায়।

গ্রিম ভ্রাতৃদ্বয়

গ্রিম ভাইরা হ'লেন বিশ্ববিখ্যাত লেখক। রূপকথা-রচনায় জার্মান-সাহিত্যে এঁরা অগ্রণী ও অদ্বিতীয়। এক ভাই হলেন জেকব (১৭৮৫—১৮৬৩); অন্য ভাই হ'লেন উইল্‌হেল্‌ম্ (১৭৮৬—১৮৫৯)। বর্তমান খণ্ডে তাঁদের দু'টি বিখ্যাত ছোট গল্প জুড়ে দেওয়া হ'লো। তাঁদের প্রত্যেকটি গল্পই শিল্প-নৈপুণ্যে অতুলনীয়। তাই কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা

রাখা যায় সেটা একটা সমস্যা। শিশুদের জন্যই তাঁরা লিখেছেন বটে, কিন্তু বয়স্করাও তাঁদের রচনায় যথেষ্ট রস গ্রহণ ক'রবেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

থিয়োডার ফোরনার

ইনি উনবিংশ শতকের প্রথমদিককার একজন শ্রেষ্ঠ জার্মান-সাহিত্যিক। খ্রীঃ ১৭৯১ অব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। "বীণার ঝঙ্কার" গল্পটিতে প্রেমের সঙ্গে পরলোকের যে একটা যোগসূত্র রচিত হয়েছে তার একটা আলাদা বিশেষত্ব আছে বই কি! লেখক বাস্তবধর্মী নন, কাব্যধর্মী। তাই তাঁর অধিকাংশ রচনাই পাঠককে স্বপ্নাতুর ক'রে তোলে।

পল্ ভন্ হেসী

উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ জার্মান-লেখকদের মধ্যে ইনিই সর্বাধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। গদ্য ও পদ্য উভয়বিধ রচনাতেই ইনি স্বীয় প্রতিভার সম্যক্ পরিচয় দিতে সক্ষম হন। তাঁর বর্তমান গল্পটি স্বকীয় বিশিষ্ট ভাবধারায় উজ্জ্বল। মানব মনের নিভৃত প্রদেশে প্রতিনিয়ত যে সংঘাত চলেছে তাকে কেন্দ্র ক'রেই এই গল্পটির দানা বেঁধে উঠেছে। মনস্তত্ত্বের দিক থেকেও তাই গল্পটি রসোত্তীর্ণ। ইনি খ্রীঃ ১৮৩০ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং খ্রীঃ ১৯১৪ অব্দে মারা যান।

হারমান সুডারম্যান

ইনি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। "নববর্ষের পূর্বদিনের স্বীকারোক্তি" গল্পটি তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প। জার্মান-সাহিত্যে এই গল্পটি বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছে। তার প্রধান কারণ এর নাটকীয় উপাদান এবং দ্বিতীয় কারণ টেক্‌নিকের বৈশিষ্ট্য। ইনি খ্রীঃ ১৮৫৭ অব্দে জন্মগ্রহণ ক'রে খ্রীঃ ১৯২৮ অব্দে পরলোক গমন করেন।

জেকব ওয়াসারম্যান

জার্মান-সাহিত্যিকদের মধ্যে এঁর বিশেষ খ্যাতি হ'লো মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে পারদর্শী ব'লে। এঁর "আদম আরবাস্" গল্পটি পৃথিবীর যে কোন সর্বশ্রেষ্ঠ গল্পের সমকক্ষ। এই গল্পের প্রধান উপাদানই হ'লো মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ। এই কার্যে তিনি যে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন তার কোনো তুলনা হয় না। ইনি খ্রীঃ ১৮৭৩ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

স্টেফান্ ট্সোয়াইগ্

"অদৃষ্টের পরিহাস" গল্পটি আধুনিক জার্মান-ছোটগল্পের মধ্যে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছে। লেখক যেভাবে এই গল্পে ব্যর্থপ্রেমের চিত্র অঙ্কন ক'রে একটি চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলেছেন, তা বিশেষভাবে প্রশংসার যোগ্য। বিংশশতাব্দীর শ্রেষ্ঠ লেখকদের মধ্যে এঁর স্থান সুনির্দিষ্ট। ইনি খ্রীঃ ১৮৮১ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

আর্থার স্কলিজ্লার

ইনি পূর্বোক্ত লেখকের সমসাময়িক। খ্রীঃ ১৯৩১ অব্দে এই জার্মান-সাহিত্যিক মাত্র ৪৯ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেছেন। আধুনিক জার্মান-সাহিত্যের অগ্রণী লেখকদের মধ্যে ইনি অন্যতম। "জমিদারের অদৃষ্ট" গল্পটি তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। দুইটি বিপরীতমুখী চরিত্র সৃষ্টিতে এই গল্পের বিশেষত্ব পরিস্ফুট হয়েছে। লেখকের বর্ণনাভঙ্গীও স্বকীয়তায় উজ্জ্বল।

লড্উইগ্ টীক্

লড্উইগ্ টীক্—বিখ্যাত নাট্যকার ও কথাসাহিত্যিক। (১৭৭৩-১৮৫৩) প্রথম ব্লু বেয়ার্ড ও পুস্ ইন্ বুট্স্-এর নবনাট্যরূপ দিয়ে বিখ্যাত হন। শেক্স্পীয়ারের অনুবাদে সাহায্য করেন। নিজস্ব নাটকও অনেকগুলি আছে। এঁর গল্পও নাটকীয় প্রভাবে পূর্ণ।

—সুচীপত্র—

জে. ফ্রেডরিক কাইণ্ড

ভিক্ষুকের বিবাহ-যৌতুক

কয়েক বছর নানান্ জায়গায় ঘুরে বেড়িয়ে অটো ভন্ ডি যখন দু'বছর ধ'রে ফ্রান্সের বিলাস-নগরী রাজধানী প্যারিসে কাটাচ্ছিল, তখন হঠাৎ দেশের বাড়ি থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে এলো তার পিতার মৃত্যু-সংবাদ। সে জার্মানীতে ফিরে এলো। বাড়িতে এসে দেখে নানা দিকে বিশৃঙ্খলা। ব্যয়বাহুল্যে সমস্ত সংসার ভারাক্রান্ত। ভালো ক'রে দেখা-শোনার লোক না থাকাতেই এই কাণ্ডটা যে ঘটেছে তা বুঝতে আর বাকি রইলো না তার। একথাও সে বুঝলো যে হিসেব ক'রে না চল্লে, ধ্বংস অনিবার্য। তবে সাহসী ছেলে এই অটো ভন্ ডি। অল্প দিনের মধ্যেই সে সংসারের যত রকম বাড়তি খরচ সব কমিয়ে ফেলে, পুরোনো ধার-দেনা পরিশোধ ক'রে ফেলল। এমন কি, যে বিরাট্ ঋণের বোঝা ঘাড়ে ক'রে সমস্ত সম্পত্তি এতদিন টিঁকে ছিলো,—অটো তাকে ধীরে ধীরে ঋণমুক্ত ক'রে পরিবারে শান্তি ফিরিয়ে আন্‌লো। নিজেও কতকটা স্বস্তি বোধ কর'ল।

কিন্তু সংসারে অটো এখন সঙ্গীহীন। এ জীবন তার আর ভালো লাগে না। সে চায়, জীবনে এখন এমন একজন সাথী জুটুক, যে তার ভবিষ্যতের দিনগুলি মধুময় ক'রে তুলবে, তার জীবন-সংগ্রামে বন্ধুর মতো সহায়তা করবে। অটো যখন বিদেশ যাত্রা করে, তখন তার প্রতিবেশী ভন্ জেডের ছোট মেয়ে আদেলাইদের বয়স মাত্র চোদ্দ বছর। দেশে ফিরে অটো যখন তাকে দেখল, তখন অপূর্ব যৌবন-সুষমায় সে পূর্ণ বিকশিত। তার বাপ-মা যখন অটোকে তাঁদের বাড়িতে ডেকে নিয়ে

গিয়ে আদর-আপ্যায়ন ক'রলেন, তখন তাঁদের আচরণে এবং আদেলাইদের অকারণ-লজ্জায় রঙীন হয়ে ওঠার ভঙ্গীতে, অটোর আর বুঝতে বাকী রইলো না যে, তার মনের গোপন বাসনা তাহ'লে ব্যর্থ হবার নয়।

তাই আর অযথা দেরি না ক'রে সে একদিন সুযোগ বুঝে বিবাহের প্রস্তাব ক'রে বস্‌লো। মেয়ের বাপ-মাও এই সুযোগ খুঁজছিলেন। তাঁরা তখুনি আনুষঙ্গিক ক্রিয়াকলাপ সেরে বিয়ের দিন ধার্য ক'রে ফেল্‌লেন। অবশেষে বিয়ের দিনও এসে পড়লো। খুব ধুমধামের সঙ্গেই বিয়ে হ'লো। বিবাহোৎসবে জার্মানীর কোন কোন অঞ্চলে এখনো যে-সব অনুষ্ঠান ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, অটোর বিয়েতে তার কোনটাই বাদ গে'লো না।

বিবাহ উপলক্ষে বিরাট্‌ ভোজের আয়োজন হয়েছে। বর-কনে সাদা-পোশাকে সেজেছে চমৎকার। তাদের নিয়ে শোভাযাত্রা এগিয়ে এলো। পাড়ার চাষী মজুরেরা তাদেরই জন্য বিরাট প্রাঙ্গণে অপেক্ষা করছিল। তাদের ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে ছিল গ্রাম্য বাজন্‌দারের দল। বিয়ের বাজনায় তারা চতুর্দিক মুখরিত ক'রে তুলেছে।

নানাজনে নানা উপহার এনে হাজির ক'রলো। বিবাহিত মহিলারা আনলেন একটা দোলনা আর বাচ্চা ছেলের উপযোগী কিছু ভাল কাপড়। নিজের হাতে বুনেছেন তাঁরা। ছেলের দল উপহার দিলো সুন্দর একটা ডিশ আর একসেট্‌ ঘোড়ায় চড়বার পোশাক। তরুণীদের উপঢৌকন তুষারশুভ্র সুন্দর একটি মেষ-শাবক। আর, খুব ছোট ছেলেমেয়েরা দিলো সুন্দর সুন্দর ঘুঘু পাখী আর রাশি রাশি ফুল। আদেলাইদ্‌ নীরবে সমস্ত উপহার হাতে তুলে নিল। অটোও দু'চারবার এ'র ও'র সঙ্গে মিষ্টি ক'রে কথা বল্‌ল। তারপর, সবাইকে সে শ্বশুরের নাম ক'রে সবুজ-লনের ওপর গিয়ে সমবেত হ'তে অনুরোধ জানাল। সেখানে একসঙ্গে নাচের ব্যবস্থা করা হয়েছে আজ।

সামিয়ানা খাটানো হয়েছে লনের ওপর। আলোগুলোও সব জ্বালিয়ে দেওয়া হ'য়েছে। নাচের বাজনা শুরু হ'লো একটু পরেই। সুমধুর সেই বাজনা। ঠিক এমনি সময় নাচের জায়গায় একজন অপরিচিত লোক এসে উপস্থিত। গাড়োয়ানের মত তার চেহারা। পরনে শতচ্ছিন্ন একটা ময়লা কোট। তার অঙ্গভঙ্গীর অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য ক'রে চতুর্দিকে একটা হাসির ফোয়ারা উঠ্‌লো। অনেক প্রশ্ন করবার পর লোকটার ভাঙা ভাঙা জার্মান কথা থেকে এইটুকু বোঝা গেল যে, সে একজন ভদ্রলোককে নিয়ে গাড়ি চালিয়ে আসছিল। হঠাৎ তার গাড়িখানা উল্টে গেছে, একখানা চাকাও গিয়েছে ভেঙে। সে বল্‌লে—"এখন বলুন তো আপনারা, কি ক'রি আমি? চাকা ভালো ক'রে যে এখুনি আমায় গাড়ি চালিয়ে চ'লে যেতে হবে!"

ক'নের বাপ তখন টেবিলের ওপরে-রাখা মেয়ের বিয়ের সব উপহার-গুলি দেখছিলেন আর মনে মনে একটা গর্ব ও আনন্দ অনুভব ক'রে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠ্‌ছিলেন। লোকটার কথাগুলি তাঁর কানে গেলো। তিনি বল্লেন—"কে? কে বল্‌ছে চাকা ভালো ক'রে আজই তার রওনা হ'তে হবে?"

পরক্ষণেই তিনি মুখেচোখে এমন একটা বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ করলেন যার অর্থ হয়—'আরে, লোকটা বলে কি!' প্রকাশ্যে তিনি ব'লে উঠ্‌লেন —"ক্ষেপেছ তুমি! আজ কি আর যাওয়া চলে? তোমার গাড়ির সমস্ত চাকা খুলে যাক, তোমার যাওয়া চল্‌বে না। আজকের এই উৎসব ছেড়ে কাউকেই আমি এ-বাড়ি থেকে যেতে দেব না। তুমি গিয়ে তোমার আরোহী-ভদ্রলোককে এ-কথা বলে এসো। আচ্ছা দাঁড়াও। চলো আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।"

এই ব'লে তিনি সেই লোকটার সঙ্গে বড় রাস্তার দিকে এগিয়ে

গেলেন। তাঁর পেছনে পেছনে কৌতূহলী জনতার ভিড়। সেখানে গিয়ে তাঁদের নজরে পড়লো অয়েল ক্লথ দিয়ে ঢাকা একটা ছোট ফিটন গাড়ি উল্টে আছে। পেছনের একটা চাকা এমন ভাবে ভেঙে গিয়েছে যে, দেখে মনে হয় কে যেন কুড়ুল দিয়ে তা টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে রেখেছে। গাড়ির ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে আছে একটা লোক। লম্বা রোগা চেহারা। পরনে তার সাদাসিধে ধরনের একটা নীল রঙের কোট। ডান হাতটায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। সেটা আবার গলায় ঝোলানো এক টুক্‌রো কাপড়ের সঙ্গে ঝুলছে। তার বাঁ-চোখের ওপরে আবার একটা পট্টি বাঁধা। তার এক চোখের সেই শোকাতুর দৃষ্টিতেই যেন তার অন্তরের পরিচয় মেলে। এ চেহারার সঙ্গে কোনো রাজ-রাজড়া বা জমিদারের চেহারার কোন মিল নেই। লোকটা নেহাৎই সাধারণ। গাড়ির পাশেই সে পরিশ্রান্ত ঘোড়াটির লাগাম ধ'রে দাঁড়িয়েছিল।

সেই দলটিকে আসতে দেখেই লোকটা তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে, তাদের দলপতিকে উদ্দেশ ক'রে ফরাসী ভাষায় সম্বোধন ক'রে উঠ্‌লো। তার কথাবার্তার মধ্য দিয়ে তার বিনীত আচরণই ফুটে উঠ্‌ছিল। আর তার বক্তৃতার মধ্যেও ছিল না কোনো জড়তা। কিন্তু হ'লে হবে কি! আমাদের ঐ বুড়ো জেড্‌ বিশুদ্ধ ভাষায় কথা বল্‌তে ভুলে গিয়েছে অনেক দিন। এখন তার মুখ দিয়ে আর সে-সব কথা বেরোয় না। তাই মুস্কিলে পড়লো সে। শেষটায় বেশি কথা না ব'লে সে একরকম আকারে ইঙ্গিতে সেই আগন্তুককে এ-কথাটা বেশ ভালো করেই বুঝিয়ে দিল যে, আজ আর তার কোনো মতেই রওনা হওয়া চল্‌বে না। মেয়ের বিয়ের ভোজসভায় তাকে অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকতেই হ'বে।

আগন্তুক রাজী হয়ে বল্‌ল—"অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে।" তারপর সে পকেট থেকে একটা ঝাড়ন বের ক'রে তার টুপির ও কোটের ধুলোবালি

বেশ ক'রে ঝেড়ে ফেলে জামার কলারটা ঠিক ক'রে নিল। তারপর ওভার কোটটার বোতামগুলো খুলে দিতেই, তার তলা থেকে একটা বিশেষ ধরনের পোশাক বেরিয়ে পড়ল। এইভাবে নিজেকে তৈরী ক'রে নিয়ে সে বগলের নিচে ক্রাচ্-ষ্টিক্‌টা দিয়ে তাদের সঙ্গে এগিয়ে চল্‌ল। যাবার সময় অনেকেই লক্ষ্য ক'রলো যে, তার বাঁ-পাটাও অকেজো, যদিও সেটা ঠিক খোঁড়া-পায়ের মত দেখাচ্ছিল না।

তারপর তারা আবার সেই সবুজ গাছে ঘেরা লনে গিয়ে হাজির হ'লো। আগন্তুক তখন অনুরোধ করল বর-কনের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে। অনুরোধ করতেই তারা এসে হাজির। বরকে তার অন্তরের আনন্দ জানিয়ে, সে তখন কনের হাতখানি ধ'রে একটা চুম্বন করলো। বুড়োর চোখেমুখে একটা অব্যক্ত আনন্দের ছাপ পরিস্ফুট, কনের সঙ্গে ফিস্ ফিস্ ক'রে নিজের ভাষাতেই সে কত না হাসি ঠাট্টার কথা ব'লে গেল আনন্দে।

তাদের এই পরিচয়ের পালা সাঙ্গ হ'তেই, আবার সবাই নাচ-গান নিয়ে মেতে উঠ্‌লো। অটো তার স্ত্রীকে নিয়ে অন্য কোণে গিয়ে বস্‌লো। বুড়োর কথাবার্তা যারা বুঝতে পারেনি, তারা সকলেই তার কাছ থেকে স'রে গিয়ে এখানে ওখানে আসন অধিকার করলো। আর বুড়ো এক কোণে একটা বেঞ্চে ব'সে উৎসব দেখ্‌তে লাগলো একরকম সঙ্গীহীন অবস্থায়। একে তার কথাবার্তা ভালো ক'রে কেউ বুঝতেই পারে না, তার ওপর সে বুড়ো—তাই তার পাশে ব'সে কে আর গল্পগুজব ক'রছে বলুন!

খাবারের ডাক পড়লো। সবাই আগন্তুককে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে খাবারের ঘরে প্রবেশ ক'রলো। সেখানে তাকে সম্মান দেখাবার জন্যেই, বসিয়ে দেওয়া হ'লো বর-কনের পাশে। চারদিকেই তখন একটা খুশির

জোয়ার বয়ে যাচ্ছিল—আনন্দ কলরবে চতুর্দিক তখন মুখর হ'য়ে উঠেছে। কেউ কেউ হাসি ঠাট্টা নিয়ে ব্যস্ত, কেউ বা মজার মজার কথা ব'লে সবাইকে হাসিয়ে মারছে। এমন সময়ে একজন চাকর এসে ঘরে ঢুকল একটা প্যাকেট নিয়ে সে বল্‌লে—"এটা একজন নিয়ে এসেছে এইমাত্র। আর ব'লেছে এটা যেন জামাইবাবুর হাতেই দেওয়া হয়।" সবাই তখন কৌতূহলী হয়ে উঠেছে প্যাকেটটার মধ্যে কি আছে তাই দেখবার জন্যে। অটোকে তারা তখুনি ওটা খুলে ফেলার জন্যে অনুরোধ করলো। কাগজের পর কাগজ দিয়ে প্যাকেটটা জড়ানো। কাগজের স্তূপ থেকে অবশেষে বেরুল একটা কাঠের তৈরী সাধারণ পান-পাত্র, রূপোর পাত দিয়ে ধারটা মোড়া। তাতে এনগ্রেভ্‌ করা আছে এই কয়েকটি কথা —'জেকাসের ছোট্ট উপহার।'

ভাবাবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে, কাপটাকে চুম্বন করে অটো। বলে— 'জেকাস! জেকাসের উপহার!' সে যেন একটা চরম আনন্দ লাভ করেছে এটি পেয়ে। তার এই হাবভাব দেখে আদেলাইদ তার কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকে স্বামীর দিকে। তারপর সে কাপ্‌টাকে কাছে এনে ভালো করে পরীক্ষা ক'রে দেখতে যায়। কিন্তু সে যেই না সেটাকে টেবিল থেকে তুলতে গেছে, হঠাৎ তার হাত ফস্‌কে গেল। তাড়াতাড়ি সাম্‌লে নিয়ে সে সেটাকে আবার টেবিলে রাখতে গিয়েই দেখে, তলাটা খুলে গেছে। তার মধ্য থেকে বেরিয়ে এলো একটা লাল রঙের ছোট বাক্স। সেটাকে খুলে ফেলতেই দেখা গেলো একজোড়া বহু মূল্যবান হালফ্যাশানের ব্রেসলেট। চুনীপান্নায় ঝক্‌মক্‌ করছে। বাক্সের সাটিনের ওপর সুতো দিয়ে লেখা ছিল এই কথাগুলি—'অন্তরের স্নেহাশীর্বাদ।'

আপনারা সহজেই বুঝবেন যে, চারধারে তখন কি কৌতূহল আর বিস্ময়। সেই আগন্তুক ছাড়া, অতিথিরা আর সবাই তখন নিজের নিজের

আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন জিনিসটাকে দেখবার জন্যে। বুড়ো লোকটি কিন্তু নিতান্ত নির্লিপ্তের মতই ব'সে রইল তার চেয়ারে। সামনে কি ঘটছে না ঘটছে সেদিকে তার কোনো দৃষ্টিই নেই। সম্পূর্ণ উদাসীন সে। তার এই আচরণ কিন্তু অটোর দৃষ্টি এড়ায় না। গোড়া থেকেই সে এই লোকটিকে তেমন প্রীতির চোখে দেখেনি। এবাব সে আরও বিরূপ হ'য়ে উঠ্‌ল লোকটার ওপর। কিন্তু সেদিকে আর না তাকিয়ে সে এখন তার স্ত্রী ও অন্যান্য অতিথিবর্গের নানারকম প্রশ্নের জবাব দিতে তৎপর হ'য়ে উঠ্‌ল।

কথা বল্‌তে গিয়ে তার সারা মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। সে বলে—"যে এই উপহার পাঠিয়েছে সে একজন ভিক্ষুক। নাম তার জেকাস্‌। ভিক্ষুকই বটে সে, কিন্তু তাব উপহার নিতে আমি একটুও অগৌরব বোধ করছি না। সে আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু। অল্প কথায় বল্‌তে গেলে সেই আমার জীবন ও সম্মান রক্ষা করেছে। আজকার এই উৎসবে নিজের যৌবন-চাপল্যের দোষে, এক সময় যে ভীষণ বিপদে পড়েছিলাম সেই সব কথা খুলে বল্‌তে যাওয়া আমার পক্ষে যতই কেননা বেদনাদায়ক হোক তবু আমি সব কথা খুলেই বলছি। কারণ তা না হ'লে এই উদারপ্রাণ সরল বৃদ্ধের প্রতি আমি শ্রদ্ধা জানাতে পারব না, তার এই উপহারের সঠিক মর্যাদা দান করাও হবে না। তার এই বিবাহ-যৌতুক চিরদিনের জন্য আমার কাছে ও আমার আদেলাইদের কাছে সবচেয়ে প্রিয়, সবচেয়ে মূল্যবান অলঙ্কার হ'য়ে থাকবে।

আদেলাইদ্‌ তখন খুশিতে উচ্ছল হ'য়ে ব'লে ওঠে—"তাহ'লে ওটা আজ আমাকে পরতে দাও।" এই বলেই সে লাল বাক্সটা থেকে ব্রেসলেট জোড়া তুলে নিয়ে তার শুভ্র—কোমল হাত দুটিতে প'রে ফেলে।

অটো তখন সমাগত অতিথিবর্গকে লক্ষ্য ক'রে বল্‌তে শুরু করে—

"আমি যখন প্যারিসে, তখন প্রায় রোজই পঁত্নয় নদীর ধারে বেড়াতে যেতাম। নদীর ওপরে যে পুলটা ছিল তার ঠিক মুখটাতে রোজই দেখতাম একটা ভিখিরীকে ব'সে থাকতে। রোজই সে ঠিক ঐ একই জায়গায় ব'সে থাকত। লোকটাকে দেখে মনে হ'তো বছর পঞ্চাশ বয়স হবে; লোকমুখে শুনেছি সে নাকি ঠিক ঐ একই জায়গায় ব'সে তিরিশ বছর ধবে একই ভাবে ভিক্ষে ক'রে চলেছে। সবাই তাকে বুড়ো জেকাস্ ব'লে ডাকত। ঠিক দয়াপরবশ হ'য়ে নয়, আমি তার ঐ সাধারণ চেহারার প্রতিই কেমন যেন একটু আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলাম। প্রায়ই যখন ওর পাশ দিয়ে চ'লে যেতাম তখন ওর টুপির দিকে একটা ক'রে আনি ছুঁড়ে দিতাম। ক্রমশঃ এটা আমার অভ্যাসের মধ্যেই দাঁড়িয়ে গেল। ওর পাশ দিয়ে যাবার সময় আপনা থেকেই আমার পকেটে হাত পড়ত।

"আমাকে সে প্রত্যেক দিনই তার অন্তরের সবরকম শুভ-কামনা জানাত। হাতে যখন সময় থাকতো তখন ওর কাছে দাঁড়িয়ে গল্প করতাম। শহরের অনেক রকম খবরই তার কাছ থেকে পাওয়া যেত। কোনরকম বিপদে পড়বার সম্ভাবনা থাকলে সে আমাকে সাবধান ক'রে দিতেও ভুলতো না। সংক্ষেপে, মাস দুয়েকের মধ্যেই তার সঙ্গে আমার কেমন যেন একটা অন্তরের যোগসূত্র রচিত হ'য়ে গেল। আমরা দু'জনেই দুই ভিন্নজাতের লোক,—আমি তখন ধনী পিতার একমাত্র পুত্র আর সে একজন নগণ্য ভিক্ষুক। তবু আমরা যেন দু'জনেই দু'জনের কথাবার্তায় খুশি হ'য়ে উঠতাম।

"প্যারিসে আমার সুখেই দিন কাটছিল। কোনরকম অসুবিধা বা অশান্তি ছিল না বল্লেই চলে। আমার সামর্থ্য অনুযায়ী আমি বেশ ভালোভাবেই বাস ক'রছিলাম। কোন রকম বাজে খরচও করতাম না। কিন্তু এখানে আসবার কিছুদিন আগে আমি পড়লাম বড় বিপদে। আমার

অদৃষ্টদেবতা তখন যেন বিরূপ হ'য়ে উঠ্‌লেন। পড়লাম কুসঙ্গে। কয়েকটি তরুণ জুয়াড়ী আমার সঙ্গী হ'লো। তাদের পাল্লায় পড়ে ধীরে ধীরে আমি সর্বস্বান্ত হ'তে বসলাম। একটু একটু ক'রে আমার সব টাকাই জলের মত উড়ে যেতে লাগল। পরিণাম যে কি দাঁড়াবে তা বুঝতে পারলেও, যতক্ষণ না সব টাকা খোয়ালাম, ততক্ষণ জুয়াখেলা থেকে নিবৃত্ত হ'তে পারলাম না। আমার ঐসব তথাকথিত বন্ধুদের কাছে ক্রমে ঋণী হ'য়ে পড়লাম অসম্ভব রকমে। তখন আমার এক সাংঘাতিক অবস্থা। মনের মধ্যে তখন দারুণ প্রতিক্রিয়া চল্‌ছে।

"যদিও খুব দেরি ক'রে ফেলেছি, তবু আমি ঠিক ক'রে ফেল্‌লাম যে আর নয়, এবার কোনো রকমে বন্ধুদের দেনাগুলি শোধ ক'রেই রাজধানী ছেড়ে চলে যাব। বাবাকে চিঠি লিখলাম টাকা পাঠাবার জন্যে, যাতে ক'রে আমি এই ঋণভার থেকে রেহাই পাই। কিন্তু সে-চিঠি এবং পরে আরও খানকয়েক চিঠি লিখেও তাঁর কোনো জবাব পেলাম না। এদিকে ঋণ-পরিশোধ করবার সময়ও হ'য়ে এলো। রোজই তাগাদার পর তাগাদা আসছে। আমি কি করব ভেবে পেলাম না। ভাবী বিপদের আশঙ্কায় অস্থির হ'য়ে উঠ্‌লাম।

"মনের যখন এইরকম অবস্থা, তখন জেকাসের পাশ দিয়ে চ'লে গেলেও তার দিকে ফিরে তাকাতাম না। আমার মনের মধ্যে তখন তোল্‌পাড় চলেছে। ভগ্নহৃদয়ে, বিষন্নচিত্তে, পথ দিয়ে তখন হেঁটে চলেছি নীরবে। সে কিন্তু গভীর আশা নিয়ে আমার দিকে চেয়ে আছে একদৃষ্টে। সে দৃষ্টি আমার সহ্য হতো না। পরদিন থেকে তার উল্টো ফুটপাথ দিয়ে হাঁটা শুরু ক'রলাম। অবশেষে বহুদিন প্রতীক্ষার পর বাড়ি থেকে চিঠি গেল। ভেবেছিলাম টাকা আসবে। সেই টাকা দিয়ে দেনাদারদের অসহ্য তাগাদার হাত থেকে মুক্তি পাব। কিন্তু তার বদলে এলো বাবার

আকস্মিক মৃত্যুর সংবাদ। ক'দিনের অসুখেই তিনি মারা গেছেন। চিঠিতে লেখা ছিল এ-অবস্থায় বাড়ি থেকে এক আমার গাড়ি ভাড়ার টাকা পাঠানো ছাড়া আর কিছু পাঠানো একেবারেই অসম্ভব। গাড়ি ভাড়ার সব টাকাও পাঠানো সম্ভব হবে কিনা তারও ঠিক নেই।

"স্বচ্ছলতার মধ্যেই আমি এতদিন লালিতপালিত হয়ে উঠেছি, এবং কোনদিনই আমার কোনো আবদারই অপূর্ণ থাকেনি। কাজেই এ সংবাদের জন্য যে আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না, আপনারা সহজেই তা বুঝবেন। বাবার মৃত্যু সংবাদে আরও মুষড়ে পড়লাম। ভবিষ্যতের সমস্ত আশা ভরসা যেন একসঙ্গে নিভে গেলো। এরকম অবস্থায় আর পড়িনি কখনো। মনে হ'লো ঋণের টাকা যদি শোধ না দিতে পারি তো বিদেশে জেল খাটা অনিবার্য। ভাবতে ভাবতে আমি যেন পাগল হ'য়ে উঠ্‌লাম। যতই ভাবি, ততই যেন নিজের অসহায় অবস্থাব কথা চিন্তা ক'রে হতাশায় ভেঙে পড়ি। এ অবস্থায় মানুষ আত্মহত্যার কথা ছাড়া যেন আর কিছুই ভাবতে পারে না। আমাব অবস্থাও হ'লো ঠিক সেইরকম। সারা রাত ঘুম হ'লো না কিছুতেই! ভোর বেলায় উঠেই চল্‌লাম নদীর ধার দিয়ে এগিয়ে। আমি যখন পঁতনয়ের কাছাকাছি গিয়ে পড়েছি, তখন হঠাৎ জেকাস্ আমার সামনে এসে দাঁড়াল। এভাবে কোনদিন সে আমাব সাম্‌নে আসে না। আমি কিন্তু তার দিকে তাকিয়ে দেখলাম না।

"আমার কোটের কোণটা ধ'রে সে খুব শান্ত কণ্ঠে ব'লে উঠ্‌ল—'একটা কথা শুনুন।' কোটটা ছাড়িয়ে নিয়ে আমি বেশ জোরেই জবাব দিলাম—'বুড়ো! আজ আমাকে ছেড়ে দাও। আজ আমি ফতুর হ'য়ে গেছি।' সে যেন আমার কথার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যটা অতি সহজেই বুঝতে পারলে।

"পরক্ষণেই আবার ধীরকণ্ঠে সে ব'লে উঠ্‌লো—'দোহাই আপনার।

সমস্ত দেবতার নামে অনুরোধ করছি—কি হয়েছে আমাকে খুলে বলুন।'

"আমি বল্‌লাম—'সে কথায় তোমার কি? তুমি তো আমাকে কোনরকম সাহায্য করতে পারবে না?'

"সে বল্‌লে—'কে জানে!···যাই হোক, আপনি শুধু একবারটি বলুন কিসের জন্য আপনার এই ভাবান্তর। সে-কথা না জানা পর্যন্ত আমি যে স্থির হ'তে পারছি না। আপনার দুঃখের কারণ কি আমার কাছে খুলে বলুন আপনি।'

" 'কি হবে ব'লে? হাজার খানেক টাকার বড় দরকার আমার।' জবাব দিলাম আমি।

" 'শুধু সেই জন্যে? ভালো রে ভালো! এর জন্যে ভাবনা কি? আমি আপনাকে ও-টাকা ধার দেব'খন।' জেকাস ব'লে ওঠে।

"আমি তো বিস্ময়ে হতবাক! বল্‌লাম—'তুমি কি ব'লছ জেকাস? তুমি দেবে এত টাকা? আজ সকালে উঠেই বুঝি খুব নেশা করেছ?'

"সে শুধু বল্‌লে—'আজ রাত্রে একবার কষ্ট ক'রে আমার কুঁড়ে ঘরে আসবেন। তার আগে, দোহাই আপনার, হঠাৎ কিছু ক'রে ব'সবেন না যেন।'

"জেকাসের কথার আন্তরিকতায় আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। কম অবাক্‌ও হইনি। ভাবলাম্—আমি যখন মৃত্যুর পথই বেছে নিয়েছি, তখন দেখাই যাক না তার কথা শুনে। ঠিক করলাম, তার কথা মত রাত্রে তার বাড়িতে যাব। সে তার ঠিকানাও দিয়েছিল আমাকে। দূর শহরতলীর ঠিকানা একটা। তাকে কথা দিলাম যে, সন্ধ্যাবেলায় তার বাড়িতে নিশ্চয়ই গিয়ে হাজির হব!

"যতটা না আশান্বিত হয়েছিলাম, তার বেশি হয়েছিলাম কৌতূহলী।

সেই কৌতূহলের বশবর্তী হয়েই, নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে উপস্থিত হ'লাম। দেখি ছোট্ট একখানা ঘরে জেকাস ব'সে আছে। ঘরখানা ছোট্ট হ'লে কি হবে, অত পরিষ্কার ঘর সচরাচর চোখে পড়ে না। আসবাবপত্রের বাহুল্য নেই, কিন্তু যা আছে, তা বেশ গুছিয়ে রাখা হয়েছে। আমাকে দেখেই জেকাস উঠে এলো। তার দৃষ্টিতে কেমন একটা খুশির ভাব, বন্ধুকে পেয়ে বন্ধুর যেমন হয়। লক্ষ্য ক'রে দেখলাম জেকাসের গায়ে এখন বেশ সুন্দর একটা কোট ঝুলছে।

"আমাকে দেখেই সে বল্লে—'আসুন! ভেতরে আসুন। এখানে যা দেখছেন সবই আপনার ব'লে মনে করবেন। আমার ছেলেপুলেও নেই, আত্মীয়স্বজনের কোনো বালাইও নেই। রোজ ভিক্ষে ক'রে আমি যা পাই, তাতেই আমার আর আমার এই ঘর যে দেখাশোনা করে তার খরচ কুলিয়ে যায়।'

"জেকাসের এই কথা শুনে আমার মনের সন্দেহ আরও দৃঢ় হ'লো। যা ভেবেছিলাম তাই। লোকটাকে এখন বোকাই ভাব্ব, না পাগল ঠাওরাব বুঝে উঠ্তে পারলাম না। কারণ, ভিক্ষে ক'রে ও রোজ যা পায়, তা আমার দানের পরিমাণ থেকেই কতকটা আন্দাজ ক'রে নিতে পারি। এই ভেবে আমার তখন অনুশোচনা হ'লো, কেন এই ভিখিরী বুড়োর কথায় আস্থা স্থাপন করেছিলাম। কিন্তু একটু পরেই জেকাস আমার সকল ভাবনা দূর ক'রে আমাকে বিস্ময়ে হতবাক্ ক'রে দিল। সে মেঝের একটা পাটাতন সরিয়ে ফেলে একটা ভারী কাঠের বাক্স টেনে তুললে। অনেক কষ্টে সেটাকে টেবিলের ওপর রেখে সে বাক্সটার ঢাক্নাটা খুলে ফেলতেই, আমি বিস্মিত হ'য়ে চেয়ে দেখি বাক্সটা মোহরে একেবারে ভর্তি।

"মৃদু হেসে সে বল্লে—'আপনার যা দরকার এই থেকে আপনি নিন্।

এতে প্রায় বারশো টাকা আছে। নগদ এই আমার কাছে এখন রয়েছে, তবে আপনার যদি আরও দরকার হয়, তো শিগগির তাও যোগাড় ক'রে এনে দিতে পারি। আমাকে ভুল বুঝবেন না যেন। এই সাধারণ ভিক্ষুকদের মত ভাববেন না যে আমিও একজন সেই দলেরই লোক, কুড়েমি ক'রে আর লোক ঠকিয়ে দিব্যি ব্যবসা ফেঁদে বসেছি। গরীব হ'য়ে জন্মালেও আমি বনেদী বংশের ছেলে। ছেলেবেলায় বাপ-মা মারা যান। ষোল বছর বয়সে আমি সেক্স-রাজবংশের সেনাদলে যোগ দেই। যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে পুরস্কার পাই এই ক্রশ্‌।' এই ব'লে সে মোহরের মধ্যে থেকে একটা 'সেণ্ট লুই ক্রশ্‌' তুলে দেখালে।

"সে আবার ব'লে চল্‌ল—'আমার যখন কুড়ি বছর বয়স, সেই সময় এক যুদ্ধে, বোমার আঘাতে আমার এই ডান হাতটা উড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে সেনাদলের চাকরী থেকেও ছুটি! আমি তখন সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় যেন নতুন এক জগতে এসে পড়লাম। মনের মধ্যে তখন কোন আশাই ছিল না যে বেঁচে থাকতে পারব। ব্যবসা-বুদ্ধিও ছিল না যে, কোনরকম ব্যবসা ক'রে কিছু উপায় করব। তার ওপর ডান হাত নেই, কিছু খেটে যে আয় করব তা থেকেও বঞ্চিত হয়েছি। ভারী বিমর্ষচিত্তে দিন কাটতে লাগলো। ভেবে ভেবে কঠিন ব্যারামে পড়লাম। দীর্ঘদিন ভুগলাম সেই অসুখে। ভালো হয়ে যখন উঠ্‌লাম, তখন এই ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করা ছাড়া আর কোনো উপায়ই রইলো না। একে বয়স অল্প, তার ওপর রুগ্ন ও হাত নেই। কাজেই লোকের দৃষ্টি আমার ওপরে সহজেই আকৃষ্ট হ'লো। রোজ আমার ভাগ্যে যা জুটতো, তা থেকে আমার খরচ চালিয়েও কিছু কিছু জমাতে পেরেছিলাম। সেই জমানো টাকাই অল্প অল্প ক'রে প্রচুর অর্থে পরিণত হ'লো। আমার মতো যারা গরীব, যাদের আরও দুরবস্থা ঐ টাকা থেকে আমি তাদেরও সাহায্য করতাম। তাতে

ক'রে তাদের মধ্যে আমার বেশ একটা খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো। কিন্তু লক্ষ্য ক'রলাম, তারা সকলেই স্বার্থের খাতিরে আমার পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়ায়। তাদের এই আচরণে আমি বিরক্ত হ'য়ে উঠ্‌লাম। আমি তখন একটি অজ্ঞাতকুলশীল অসহায় ছেলেকে ঘরে নিয়ে এলাম। নিজের ছেলের মতই তাকে লালন-পালন করতে লাগলাম স্নেহ ভালবাসা দিয়ে। তাকে মানুষ ক'রে তোলবার আশায় আমি আরও কষ্টে দিন চালাতে লাগলাম। অনেক যত্নে, অনেক কষ্টে আমি তাকে বড় ক'রে তুলেছিলাম। ষোল বছর পর্যন্ত তাকে লেখাপড়াও শিখিয়েছিলাম নিজের কাছে রেখে। এই সময় একজন সরকারী কর্মচারী ছেলেটিকে দেখে সন্তুষ্ট হ'য়ে তাঁর দপ্তরে একটা কাজে ঢুকিয়ে দিলেন। এই ছেলে, এই ফ্রান্সিসের জন্যই আমি কত না চোখের জল ফেলেছি। কিন্তু হায়! সে এখন লেখাপড়া শিখেছে, মানুষ হয়েছে, ভালো চাকরী করে—আর সে এখন এই ভিখিরীর সঙ্গে কেন সম্পর্ক রাখতে যাবে? এই তো আপনি যেদিন আমাকে প্রথম ভিক্ষে দিলেন, সেই দিনই সে আমার সামনে দিয়ে এমন ভাবে পাশ কাটিয়ে চ'লে গেল, যেন সে আমাকে কোনোদিন চেনেই না। আমাকে দেখে সে এখন লজ্জা পায়—অথচ এই বুড়োই একদিন ভিক্ষে ক'রে তাকে মানুষ ক'রে তুলেছিল। তার ঐ অস্বাভাবিক আচরণে আমার বুক যেন ভেঙ্গে গেল। আমি তখন কেঁদে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে বল্‌লাম—'হে ভগবান! তুমি আমাকে আর একটি ছেলে দাও, আর একটি ছেলে এনে দাও। আমার প্রার্থনা শেষ হ'তে না হতেই চোখের সামনে দেখি 'তুমি' দাঁড়িয়ে আছ। আমাকে দেখে, তোমার যেন দয়া হ'লো, তুমি আমার দিকে একটা আনি ছুঁড়ে দিলে।"

কথা বল্‌তে বলতে অটোর চোখে জল এসে গিয়েছিল। সে একটু থেমে বল্‌ল—"জেকাস্‌ এই প্রথম আমাকে 'তুমি' ব'লে সম্বোধন ক'রল।

আমাকে সে বল্‌ল—'তুমি আমাকে ভিখিরী ব'লে অবহেলা করবেনা, ঘৃণা করবে না? তুমি এখন বিপদে পড়েছ, এসো আমি এখন তোমাকে সাহায্য করি। তোমাকে সাহায্য ক'রে এই বুড়ো ভিখিরীকে সুখী হ'তে দাও।'

"আপনারা সহজেই বুঝতে পারবেন আমার মনের অবস্থা তখন কি রকম। আমি যখন মনে মনে আত্মহত্যা করার সঙ্কল্প ক'রে আছি, ঠিক সেই সময় ভগবানের একি অনুগ্রহ! আমি তাকিয়ে রইলাম—বুড়োর মুখের দিকে। একটা স্বর্গীয় দীপ্তিতে যেন তার সারা মুখখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আমি তখন তার কাছ থেকে ঐ ভালোবাসার দান গ্রহণ করতে আর দ্বিধাবোধ করলাম না। তাকে আর আমার অবস্থা তখন খুলে ব'লতে হ'লো না, কারণ আমি লক্ষ্য করলাম ইতিমধ্যে সে আমার সম্বন্ধে সব খোঁজখবরই নিয়েছে। আমি তখন তাকে এক হাজার টাকা গুণে দিতে বল্‌লাম। আর এও বল্‌লাম—'কালি-কলম নিয়ে এসো, একটা রসিদ লিখে দিই।' কিন্তু জেকাস্ এসব কথায় কান দিল না মোটে। শুধু বল্‌ল—'তোমার যত খুশি তুমি নিয়ে যাও। তুমি যদি মারাই যাও, তাহ'লে না হয় স্বর্গে গিয়েই টাকাটা শোধ দিয়ো। এখানে আমার খুব সামান্যই প্রয়োজন। ভগবান তোমাকে আমার সন্তানরূপেই পাঠিয়েছেন —সেকথা তুমি মানো আর নাই মানো। আর এটুকু বোধহয় তোমার কাছ থেকে আশা করতে পারি, যে আমি যদি তোমাকে পুত্র ভেবে মনে মনে শান্তি পাই, তাহ'লে সে-সুখ থেকে তুমি আমায় বঞ্চিত করবে না।'

"আমি তখন তার বুকে মুখ লুকিয়ে বল্‌লাম—'নিশ্চয়ই না। তুমি শুধু আমার পিতা নও, আমার জীবন-রক্ষকও বটে। আজ তুমি আমাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছ। বাবাকে আজ আমি হারিয়েছি। তিনি আর বেঁচে নেই। কিন্তু আমার যেন মনে হচ্ছে তিনি যেন তোমার

মধ্যে দিয়েই আত্মপ্রকাশ করেছেন।' অনেক রাত্রে নিজের বাসায় ফিরে এলাম। আমার মনের বোঝা তখন হাল্‌কা হয়ে গিয়েছে। পরম শান্তিতে সে-রাত্রি আমার ঘুমিয়ে কাটলো।

"পরদিন সকালে সমস্ত পাওনাদারদের টাকা কড়ায়গণ্ডায় শোধ ক'রে, জেকাসের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। কারণ দেশে ফিরে আসবার জন্যে আমি তখন ঠিক ক'রে ফেলেছি সব। জেকাসের সঙ্গে অনেক কথাবার্তা হ'লো আসবার আগে। বাড়ি ফিরে আমার সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান কর্তব্য ছিল এই শ্রদ্ধার ঋণ পরিশোধ করা। কিন্তু আসবার আগে জেকাস্‌ আমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিল যে, এক বছরের মধ্যে আমি যেন তার টাকা শোধ দেবার কোনো সঙ্কল্পই না করি। তার সে প্রতিজ্ঞা আমি রক্ষা করেছিলাম। এই কিছুদিন আগে তার টাকা পাঠিয়ে দেবার সময়, আমার এই বিয়ের কথাও তাকে জানাতে ভুলিনি।"

আদেলাইদ্‌ এই সময় তার স্বামীর হাত ধ'রে ব'লে উঠল—"তুমি যদি তাঁকে পিতার আসনে বসিয়ে থাক, তাহ'লে আমিও তাঁকে আমার পিতা ব'লেই সম্বোধন করব। আজ থেকে তিনিও আমার পিতা হলেন।" তারপর সে তার পানপাত্র পূর্ণ ক'রে সমাগত অতিথিবর্গকে উদ্দেশ ক'রে বল্‌ল—"আসুন। আমরা এবার আমার পিতা ভন্‌ জেড্‌ আর ভিক্ষুক-পিতা জেকাসের স্বাস্থ্যপান করি। ভগবান তাঁদের দীর্ঘজীবন দান করুন।"

উপস্থিত সকলেই উঠে দাঁড়িয়ে এই উৎসবে যোগ দিল। দিল না শুধু সেই বৃদ্ধ আগন্তুক। আগের মতই সে নির্লিপ্তভাবে বসেছিল। হঠাৎ চেয়ারটা পেছন দিকে ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। তার মুখচোখের ভাব দেখে মনে হ'লো, সে যেন বল্‌তে চায়—'একটা নগণ্য ভিক্ষুককে নিয়ে সবাই বড্ড বেশি বাড়াবাড়ি করছে।'

অটো তার এই আচরণে ক্রুদ্ধ হ'য়ে ব'লে ওঠে—"আপনি মশাই আতিথ্যের অবমাননা করছেন।" এই কথা ব'লে সে তখন সভামণ্ডপ থেকে তাকে বাইরে বের ক'রে দেবার জন্যেই যেন এগিয়ে যায়।

বুড়ো লোকটি এবার সহজ সুরেই ব'লে ওঠে—"আপনারা আমায় মাপ করুন।" তারপর সে তার বাঁ-চোখের পট্টিটা তুলে ফেলে আগের মতই ব'লে ওঠে—"যাক্‌ এখন আমি নিশ্চিন্ত। আমি ঠিক লোককেই বেছে নিয়েছিলাম। চিনতে আমার ভুল হয়নি আর। অটো! তুমি দেখছি এখনো আমাকে ভোলনি। তোমার বৌ হয়েছে খাসা! চমৎকার বৌ। সে-ও আমাকে বাবা ব'লে ডেকেছে। এ যে আমার কি আনন্দ কেমন ক'রে বোঝাব আমি। শুধু তোমার এই আন্তরিকতা পরীক্ষা করবার জন্যই আমি এই দীর্ঘপথ ছুটে এসেছি। বাড়ির সামনে গাড়ি উল্টে যাওয়া, সেও আমারই পূর্বকল্পিত।"

কথা বল্‌তে বল্‌তে জেকাস্‌ আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে ওঠে। সবাই তখন তাকে ঘিরে বসে। চারিদিকেই তখন তার প্রশংসা আর সুখ্যাতি। অটো নিভৃতে তার নবপরিণীতার অধর চুম্বন ক'রে বলে—"আজ আমার জীবনের এক পরম শুভদিন।"

জেকাস্‌ তার বুক পকেট থেকে কি যেন একটা বের করতে করতে আবার ব'লে ওঠে—"জীবনের বাকী ক'টা দিন তোমাদের কাছেই কাটিয়ে যাব ব'লে এসেছি। এই নাও তোমার কাগজপত্তরগুলো।" এই ব'লে সে পকেট থেকে ভাঁজ করা কতগুলি কাগজ বের ক'রে দেয়। তারপর বল্‌তে থাকে—"আমি তোমার বোঝা হ'য়ে থাকব না অটো। বছরে আমি হাজার বারো শো টাকা পাব বাড়ি ভাড়া থেকে। আমার আব কিছুরই দরকার নেই। তোমার বাড়িতে শুধু একখানা ঘর আমায় দেবে,

সেখানে আমি জীবনের বাকী ক'টা দিন শুধু একটু আরামে ও শান্তিতে কাটিয়ে যাব। আর কিছুই চাই না আমি।"

অটো ভাবাবেগে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বুড়ো জেকাস্‌কে।

সেই ভোজের আসরে তখন সেই কাঠের পানপাত্রটি পূর্ণ হ'য়ে হাতে হাতে ফিরে চলে।

—ক্যাশপার ফ্রেড্‌রিক গটস্যাক

কৃপণ

তিরিশ সালের যুদ্ধের সময় নাকি পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীরা তাদের টাকাকড়ি এবং সমস্ত জিনিসপত্র খুব তাড়াতাড়ি কুইসেনবার্গের প্রাসাদে স্থানান্তরিত করে, সৈন্যদের অত্যাচার ও লুণ্ঠনের হাত থেকে তাদের রক্ষা করবাব জন্যে। শোনা যায়, এখনো নাকি সেই ধন-সম্পদ মাটির নিচেকার কোন গুপ্ত-কক্ষে এক প্রকাণ্ড তাম্রপাত্রে লুকানো আছে। আর তাকে যক্ষের মতো আগলে রয়েছে প্রাসাদের কোন অশরীরী প্রেতাত্মা।

এদিকে কোন এক রবিবারে সেই এলাকার একজন অধিবাসী,—তাকে পাড়াগেঁয়ে লোক ব'লেই মনে হয়,—সেই পুরোনো প্রাসাদের দিকে এগিয়ে চল্‌লো। ধ্বংসস্তূপের মধ্যে এসে চতুর্দিকে সে যেন কি খুঁজে বেড়াতে লাগলো তন্ন তন্ন করে। অবশেষে সে একটা পথ খুঁজে পেল। সে-পথ ক্রমশ নেমে গেছে মাটির মধ্যে। ঘাস আর লতাগুল্মে ঢেকে গিয়েছে সেই পথ। তাব মধ্য দিয়েই সে কোন রকমে নেমে যেতে লাগলো। অবশেষে একটা অন্ধকার সুড়ঙ্গের সামনে এগিয়ে গেল সে। কৌতূহলী হ'য়ে তার মধ্য দিয়েই চল্‌তে লাগল পা ফেলে। সে এখন সম্পূর্ণ মাটির নিচে। ওপরকার গর্ত দিয়ে একটা ক্ষীণ আলো এসে পড়েছে,—সে শুধু দেখতে পেল। কিছুক্ষণ সে যখন সেখানে দাঁড়িয়ে আছে, হঠাৎ তার সামনে এক অশরীরী প্রেতের আবির্ভাব হ'লো। মেয়েদের একটা প্রকাণ্ড ঢিলে জামায় তার সমস্ত দেহ আবৃত। সহসা সেই জায়গাটি আলোকিত হয়ে উঠ্‌তেই, ভীতিগ্রস্ত লোকটি দেখতে পেল তার সামনে সেই বহু-খ্যাত

তাম্রপাত্রে ভরা মোহরগুলি ঝক্‌ঝক্ করছে। এরই কাহিনী সে তার প্র-পিতামহীর কাছে শুনেছে বহুবার।

কিছুক্ষণ সে হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। বুঝে উঠ্‌তে পারল না কি করবে। সে কি ফিরে যাবে, না মোহর নিতেই এগিয়ে যাবে সাহস ক'রে? সেই মুহূর্তে অশরীরী আত্মা ব'লে উঠ্‌ল—"তুমি একটি মোহর নিতে পার। রোজই একটি ক'রে মোহর নিতে আসতে পার তুমি। কিন্তু মনে রেখ একবারে একটি ক'রে, তার বেশি নয়!"

এ কথা ব'লেই সে অদৃশ্য হয়ে যায়। লোকটি তখন হাত দিয়ে তুলে নেয় একটি মোহর। কতকটা আনন্দে আর কতকটা ভয়ে—কম্পিত বক্ষে সে তাড়াতাড়ি তার দাঁড়াবার জায়গায় ফিরে আসে। একটা চিহ্ন ক'রে রাখে সেখানে। তারপর প্রেতের সেই উপহারটি নিয়ে নিজের বাড়িতে চলে যায়। পথে সে হাজার বার দেখে সেই মোহরটি। পরদিনও সে তেমনি ক'রে আর একটি মোহর নিয়ে আসে। সেদিন অবিশ্যি সেখানে প্রেতের আবির্ভাব হয় না—কিন্তু সেই বিরাট জালাটি সোনায় ভরা থাকে। এমনি ভাবে সে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ দিন ক'রে, এক বছরের ওপর রোজ একটি ক'রেই মোহর নিয়ে আসে।

তার ছোট্ট বাড়িটি ক্রমে বিরাট এক প্রাসাদে পরিণত হয়। চাষের জমি সে বাড়িয়ে ফেলে ধাঁ ধাঁ করে। অসংখ্য গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া তার মাঠে চরতে থাকে প্রতিদিন। যা কাণ্ড সে করেছিল, কোন গ্রামবাসীর পক্ষেই তা সম্ভব হয়নি। এদিকে যতই তার ধনসম্পদ বাড়তে লাগল, ততই সে আয়াসী হয়ে ওঠে। সে বলে—"আমি আর এখন কিসের জন্য খেটে মরি। আমার এখন আরাম ক'রে ব'সে থাকবার দিন!"

এই ভেবে সে তার জমি চাষের জন্য মেয়ে-পুরুষ মজুর ঠিক ক'রে
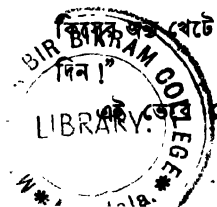
ফেলে। আর সে নিজে, হয় নতুন আরাম কেদারায় ব'সে থাকে, নয় তো সুন্দর এক ঘোড়ার গাড়িতে চেপে তার জমি-জমা দেখে বেড়ায়। একদিন নিজের হাতে সে এই সব শস্য লাগিয়েছে।

ওদিকে রোজ সেই তাম্রপাত্র থেকে একটি ক'রে মোহর আনতে আনতে সে প্রায় পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ল। কিন্তু ধনলিপ্সা তার কমে না একটুও। প্রবল হয়ে দেখা দেয় দিন দিন। যদিও একটি স্বর্ণমুদ্রা প্রায় কুড়ি ডলারের সমান, তথাপি তার মনে হ'লো যে, ঐ একটি স্বর্ণমুদ্রার জন্য রোজ রোজ পাহাড়িয়া পথ অতিক্রম ক'রে অতদূরে যাবার পথশ্রম আর পোষায় না। বড় কষ্টকর! তাই সে মনে মনে ঠিক করে যে, এরপর থেকে রোজ দুটি ক'রে মোহর নিয়ে আসবে।

তাই সে নিয়ে আসে একমাসের ওপর। তবু সে এই দ্বিগুণ অর্থে সন্তুষ্ট হয় না। নিজের মনে বল্‌তে থাকে—"হে ভগবান! রোজ রোজ এমনি ক'রে দুটি মোহরের জন্য এই অনন্ত পরিশ্রম আর সহ্য হয় না। এটা ঠিক যে, ঐ সমস্ত ঐশ্বর্যই আমার ভোগের জন্য। কাজেই সে সমস্ত আমি একটি দুটি ক'রে নিয়ে আসি বা সমস্তই একসঙ্গে আনি, একই কথা। কাজেই, আমি একদিনেই সেই সুন্দর বিরাট তাম্রপাত্রটি খালি ক'রে নিয়ে আসব। এরপর থেকে আর আমাকে কোনো ঝঞ্ঝাটই পোয়াতে হবেনা।"

যে কথা, সেই কাজ। কতগুলি থ'লে নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে সে পাহাড়ের পথ ধরে ওপরে উঠে যায়। অফুরন্ত অবসর এবং আনন্দের মধ্য দিয়ে তার দিন কাটে ব'লে, সে বড় মোটা এবং আয়াসী হয়ে পড়েছে। তাই, সেই অতি পরিচিত সুড়ঙ্গ পথের সামনে আসবার আগেই যেন তার দম ফুরিয়ে আসে। ব'সে একটু জিরিয়ে নিতে থাকে আর ভাবে—যে, তার এই পথশ্রম চিরদিনের মত শেষ হ'তে চলেছে, আর তাকে কষ্ট করতে হবে না। সে ভাবে, এরপর সে কি করবে। সে যখন দেখতে পাবে

তার নিজের বাড়িতে থলেগুলি মোহরে ভর্তি হ'য়ে রয়েছে, তখন সে একটি বিরাট তালুক কিনে ফেলবে, জমিদার হ'য়ে বসবে। চারখানা গাড়ি সে করবে কিনা সে-কথাও সে ভাবে। চমৎকার একটি টেবিল সে রাখবে। তার চারপাশে ঘিরে বসবে সম্ভ্রান্ত অতিথিরা। প্রতিবেশী কিফাউসেন প্রাসাদের নাইট-মশাই এবং তার আত্মীয়বর্গ উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও সে তাদের নিয়ে কেমন হৈ হুল্লোড় ক'রে মদ্যপান করবে।

এই কথা ভেবে সে উঠে দাঁড়ায়। তারপর, থলেগুলি নিয়ে অন্ধকার পথে অদৃশ্য হ'য়ে যায়। এখন সে বিরাট তাম্রপাত্রের কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। সে অবাক হ'য়ে দেখে যে, এতদিন সে এত মোহর নিয়ে গেল, অথচ পাত্রটি আবার যেন নতুন ক'রে স্বর্ণমুদ্রায় পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠেছে। হাঁটু গেড়ে সে তাম্রপাত্রের সামনে ব'সে পড়ে। তারপর যেই সে দুই হাত দিয়ে মোহর তুলে নিয়ে থলেতে ভরতে যাবে, অমনি তার হাতের নাগাল থেকে পাত্রটি সরে যায়। ভয়ঙ্কর শব্দ করতে করতে মাটির নিচে অদৃশ্য হয়ে যায় পাত্রটি। আর দেখা যায় না। তার চতুর্দিকে তখন জ্বলন্ত কাঠ আর গন্ধক পুড়তে থাকে। জ্ঞান হারিয়ে সে সেইখানেই লুটিয়ে পড়ে।

•

সমস্ত ঐশ্বর্য কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল! সেই সঙ্গে সঙ্গে তার সুখস্বপ্ন, তার প্রাসাদের পরিকল্পনাও, বাতাসের মতই মিলিয়ে গেল।

তাম্রপাত্রটি আর দেখা গেল না। কিন্তু তার ধনলিপ্সা পূর্বের মতই প্রবল হয়ে রইল। সে যদি রোজ একটি ক'রে মোহর নিয়ে সন্তুষ্ট থাকত, তাহ'লে আর এমন কাণ্ড ঘটতো না, সে যা পেয়েছিল তাই নিয়েই সুখী হ'তে পারত।

অর্থলিপ্সা যার এমনি ক'রে প্রবল হয়, সে এমনি ক'রেই তার ফল ভোগ করে।

—গ্রিম ভ্রাতৃদ্বয়

বারজন নাচিয়ে রাজকুমারী

এক সময় একজন রাজা ছিলেন।

তাঁর ছিল বারটি টুটটুকে সুন্দরী মেয়ে। রাত্রে তারা একই ঘরে বারটি বিছানায় ঘুমোত। তারা শুলে পর ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দেওয়া হ'তো। কিন্তু প্রত্যেকদিন সকালে উঠেই দেখা যেত, তাদের জুতোগুলো এমনভাবে ছিঁড়েছুঁড়ে নষ্ট হ'য়ে গেছে, যেন তারা সারারাত ধ'রে জুতো প'রে নেচেছে। রোজই এমনটা হয়, কিন্তু কেউই ধরতে পারে না কি ক'রে এমন কাণ্ড ঘটে, কোনখানেই বা রাজকুমারীরা যায়।

রাজা তখন সারা দেশে ঘোষণা ক'রে দিলেন, যে এই রহস্য উদ্‌ঘাটন ক'রে বল্‌তে পারবে যে, রাজকুমারীরা রাত্রে কোথায় গিয়ে নৃত্য করেন— তাহ'লে রাজা তাঁকে তার পছন্দ মত এক রাজকন্যার সঙ্গে বিয়ে দেবেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর সে-ই হবে দেশের রাজা ; কিন্তু তিনদিন তিনরাত ধ'রেও যে একাজ ক'রতে সমর্থ হবে না, তার গর্দান কাটা যাবে।

এক রাজার ছেলে এলেন।

তাঁকে খুব আদর আপ্যায়ন করা হ'লো। সন্ধ্যাবেলায় তাঁকে নিয়ে যাওয়া হ'লো রাজকুমারীদের শোবার ঘরে। সেখানে সারি সারি বারটি পালঙ্ক পাতা।

রাজকুমার বল্লেন, তিনি সেই ঘরে বসেই লক্ষ্য করবেন, রাজকন্যারা কোথায় যায় নাচতে। পাছে তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়, তিনি যদি শুনতে না পান,—এই জন্যে তাঁর অনুরোধে সে-রাত্রে রাজকুমারীদের শোবার ঘরের দরজা খুলে রাখাই হ'লো। কিন্তু রাজকুমার বেশি রাত জেগে বসে থাকতে পারলেন না, ঘুমিয়ে পড়লেন একটু পরেই। সকাল বেলায় ঘুম ভাঙতেই দেখেন, রাজকন্যারা সারারাত ধরেই নৃত্য করেছেন। কারণ জুতোর তলাকার চামড়া নষ্ট হয়ে গিয়েছে, ফুটো ফুটো হয়ে গিয়েছে একেবারে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাত্রেও সেই একই ঘটনা ঘটলো। কাজেই রাজা হুকুম করলেন—'রাজকুমারেব গর্দান নাও।'

রাজকুমারের পর আরও অনেকে এলো। কিন্তু সকলের বরাতেই সেই একই ঘটনাব পুনরাবৃত্তি হ'লো। একইভাবে তাঁদের প্রাণ গেল একে একে।

এদিকে হয়েছে কি, একজন বুড়ো সৈনিক যুদ্ধে ঘায়েল হ'য়ে দেশে ফিরেছে। তার আর লড়াই করবার শক্তি নেই। সে যাচ্ছিল এই রাজার রাজ্য দিয়েই। বনের মধ্য দিয়ে যাবার সময়, এক বুড়ীর সঙ্গে তার দেখা। সে বল্লে—"কি হে লড়ুয়ে-বীর, যাচ্ছ কোথায় ?"

সৈনিকটি তখন জবাব দিল—"কোথায় যাব, আর কি-ই বা করব এখনো তা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। কিন্তু ভারী ইচ্ছে হচ্ছে রাজ-কন্যেরা কোথায় গিয়ে নাচেন, সে জায়গাটা একবার যদি বেব করতে পারতাম, তাহ'লে একদিন রাজা হ'য়ে বস্তাম।"

বুড়ী বল্ল—"এ আর বেশি কথা কি! তবে একটা কথা মনে রেখো, সন্ধ্যাবেলায় রাজকুমারীদের একজন যখন তোমার কাছে এসে মদ খেতে অনুরোধ করবে, তুমি তখন তা খাবে না। সে যখন তোমার কাছ থেকে

চলে যাবে, তখন তুমি এমন ভাণ ক'রে পড়ে থাকবে, যেন কত গভীর ঘুমই না ঘুমোচ্ছ।"

তারপর বুড়ী তাকে একটা আলখাল্লা দিয়ে বল্‌লে—"এটা তুমি রাখ। যেই এটা পরবে, তৎক্ষণাৎ তুমি অদৃশ্য হ'য়ে যাবে। কেউ আর তোমাকে দেখতে পাবে না। তখন তুমি অনায়াসেই রাজকন্যাদের পিছু নিয়ে দেখতে পারবে, তারা কোথায় যায়।"

এসব সৎ-পরামর্শ শুনে সৈনিকের ইচ্ছে হ'লো—'দেখাই যাক না বরাতের জোরটা একবার পরীক্ষা ক'রে।' সে তখন রাজার কাছে হাজির হয়ে বল্‌লে—"মহারাজ! আমাকে একবার পরীক্ষা করবার আদেশ দিন।"

আর সবাইকে যেমন ক'রে আদর-আপ্যায়ন করা হয়েছিল, তাকেও তাই করা হ'লো। রাজা তখন তার জন্যে রাজকীয় পোশাক-পরিচ্ছদ আনবার হুকুম করলেন। সন্ধ্যায় সময় তাকে রাজকুমারীদের শয়নকক্ষে নিয়ে যাওয়া হ'লো।

সে যখন ঘুমোতে যাবে, ঠিক সে-সময় বড় রাজকুমারী এক গ্লাস মদ নিয়ে তার সাম্‌নে এসে উপস্থিত। সৈনিকটি তার হাত থেকে সেটা তুলে নেয়। কিন্তু গোপনে ফেলে দেয় দূরে। এক ফোঁটাও মুখে ছোঁয়ায় না।

তারপর সে তার জন্যে নির্দিষ্ট বিছানায় এসে শুয়ে পড়ে। অল্পক্ষণ পরেই দারুণভাবে নাক ডাকতে শুরু করে তার। ভাবখানা এই, না জানি সে কি গভীরভাবেই ঘুমিয়ে পড়েছে!

বারজন রাজকুমারী তো তার এই নাক ডাকার শব্দ শুনে হেসেই লুটোপুটি। বড় রাজকুমারী তখন বলে—"আহা বেচারা! এভাবে বেঘোরেই প্রাণটা দেবে গা!"

তারপর তারা নিজেদের বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে। বাক্স প্যাঁটরা খোলে। ভালো ভালো কাপড় জামা বের করে সাজতে থাকে আয়নার

সামনে দাঁড়িয়ে। তারপর ঘরময় তারা লাফাতে শুরু ক'রে দিলে। যেন নাচবার জন্যে তাদের পায়ের পাতা চুল্‌বুল্‌ করছে।

কিন্তু ছোট রাজকুমারী তখন হঠাৎ বলে উঠ্‌ল—"না ভাই! তোমরা তো খুব ফুর্তি করছ, কিন্তু আমার এদিকে কেমন যেন ভয় করছে। আমার ঠিক মনে হচ্ছে, আজ একটা অঘটন ঘটবেই ঘটবে।"

বড় রাজকুমারী তখন জবাব দিল—"এই ছোট! তুই থাম। সব সময়েই তোর ভয়! তোর কি মনে নেই, কত রাজার ছেলেই তো এলো আমাদের পরীক্ষা করতে, কিন্তু ধরতে পারলো কি কেউ? আর এই সৈনিক? আরে রামচন্দর্—একে আমি যদি মদের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ নাও দিতাম, তাহ'লেও ও ঘুমিয়ে পড়ত অঘোরে—নাক ডাকা দেখে বুঝছিস্‌ না?"

তারপর তারা সব তৈরী হ'য়ে যাবার আগে সৈনিকটিকে দেখতে গেল একবার। কিন্তু সে বেচারা তখন হাত-পা না নেড়ে চিৎপাত হ'য়ে শুয়ে কেবল নাকই ডাকাচ্ছে। কাজেই তারা ভাবল—আর তাদের ভয় নেই। বড় রাজকুমারী তখন নিজের বিছানায় উঠে, হাততালি দিতেই, বিছানাটা ঘরের মেঝে ফুঁড়ে নিচে নেমে গেল একেবারে। আর সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল একটা গুপ্তদ্বার।

সৈনিকটি তখন কিন্তু সব দেখছে। একে একে তারা সবাই সেই গুপ্ত পথ দিয়ে চলে গেল। বড় রাজকুমারীই তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চল্‌ল। আর অপেক্ষা করবার সময় নেই দেখে সৈনিকটি তখন ঝাঁপিয়ে প'ড়ে তাদের অনুসরণ করলো। বলা বাহুল্য ইতিমধ্যেই সে বুড়ীর দেওয়া সেই আলখাল্লাটা পরে নিয়েছে। সিঁড়িতে নামতে গিয়ে সে হঠাৎ ছোট রাজ-কুমারীর পোষাক ধরে টান দেয়। রাজকুমারী তো ভয় পেয়ে চীৎকার ক'রে ওঠে। আর বোনদের তখন বলে—"ওমা! কে যেন আমার ঘাগরা ধরে টানছে!"

বড় রাজকুমারী তখন ধম্‌কে ওঠে—"বোকা মেয়ে কোথাকার! দেয়ালের পেরেকে লেগে গেছে কিনা তাই দেখ।"

তারপর তারা সবাই নিচে নেমে যায়।

সেখানে নেমে তারা দেখে কি চমৎকার কুঞ্জবন। গাছের পাতাগুলো সব রূপো দিয়ে তৈরী। কি চকৃমকে আর ঝকৃঝকে। সৈনিকটি ঠিক করলো এমন জায়গার একটা নিদর্শন নিয়ে যাওয়া চাই। এই ভেবে সে গাছের একটা সরু ডাল ভেঙ্গে ফেল্‌ল। সঙ্গে সঙ্গে গাছ থেকে কারা যেন উঠ্‌ল কলরব ক'রে। ছোট রাজকুমারী তখন আবার বল্‌লে—

"আমার ঠিক মনে হচ্ছে, কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। তোমরা কি গাছের শব্দ শুনতে পাচ্ছ না? কই, এর আগে তো এমনটা হয় নি কোনদিন?"

বড় রাজকুমারী কিন্তু জবাব দেয়—"তুই ভুল করেছিস ছোট! আমাদের এখানে আসার খবর পেয়েই রাজকুমারেরা আনন্দে কলরব ক'রে উঠেছেন, এ তারই শব্দ।"

তারপর তারা আর একটা কুঞ্জে গিয়ে হাজির হ'লো।

এখানকার গাছের পাতা সব সোনার। তারপর, যখন তারা আবার তৃতীয় কুঞ্জে গিয়ে পৌছুল, তখন সৈনিকটি দেখতে পেল সেখানকার গাছের পাতা সব হীরে দিয়ে তৈরী! ছ'জায়গার গাছ থেকেই সে একটা ক'রে ডাল ভেঙে নিল। প্রত্যেকবারই আগের মত দারুণ কলরব শোনা গেল। তার ফলে প্রত্যেকবারই ছোট রাজকুমারী ভয় পেয়ে শিউরে ওঠে। কিন্তু বড় রাজকুমারী প্রত্যেকবারই জবাব দেয়, এ হচ্ছে রাজকুমারদের আনন্দ-ধ্বনি।

অবশেষে তারা যেতে যেতে প্রকাণ্ড একটা সরোবরের ধারে এসে

থামল। সেখানে বারখানি নৌকো ছিল সরোবরের জলে বাঁধা। বারজন রাজপুত্র ছিলেন তাতে। তাঁরা যেন রাজকন্যাদেব জন্যেই সাগ্রহে অপেক্ষা কবছিলেন।

একে একে রাজকুমারীরা এক এক নৌকোয় গিয়ে উঠল। আর ছোট রাজকুমারীর সঙ্গে তার নৌকোয় গিয়ে বসলো সেই সৈনিকটি।

তারপব তাঁবা তখন সবাই নৌকো বেয়ে চলেছেন। সৈনিক আর ছোট বাজকুমারীকে সঙ্গে নিয়ে যে রাজকুমার নৌকো বাইছিলেন, তিনি ব'লে উঠলেন—

"আজ আমাব কি হ'লো! প্রাণপণ জোরেই তো নৌকো বেয়ে চলেছি, কিন্তু অন্যদিনের মত নৌকো জোরে যাচ্ছে কই! বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি এবই মধ্যে। আজ নৌকোটাকে বড় ভার ভার ঠেকছে।"

রাজকুমারী জবাব দিলেন—"বোধহয় গরম হাওয়ার জন্যেই আজ তুমি বাইতে পারছ না। আমারও ভারী গরম লাগছে আজ।"

সরোবরের অন্যদিকে দেখা গেল বিবাট এক রাজপুরী। আলোয় ঝল্‌মল্ করছে। সেখান থেকে ভেসে আসছে ঢাকঢোল আর শিঙ্গাধ্বনি! সেখানে গিয়ে তারা সবাই নৌকো থেকে নামল। তারপর সবাই চললো প্রাসাদেব দিকে। প্রত্যেক রাজকুমার তাঁর নির্দিষ্ট রাজকন্যার সঙ্গে সেখানে নাচলেন। সেই সৈনিকটিও কিন্তু তাদের সঙ্গে নাচল সবার অলক্ষ্যে থেকে।

তারপর, এক একজন রাজকুমারী যেই এক একটি পাত্র আনে মদে পূর্ণ করে—সৈনিকটি তা অদৃশ্য থেকেই তৎক্ষণাৎ পান ক'রে ফেলে। কাজেই মদের গ্লাস মুখে তুলতে গিয়েই রাজকুমারীরা লক্ষ্য করে তা শূন্য।

এই কাণ্ড দেখে তো ছোট রাজকুমারী ভয়ে সারা। কিন্তু প্রত্যেক বারই বড় রাজকুমারী তাকে ধমকে ঠাণ্ডা করে। রাত তিনটে পর্যন্ত তারা

একটানা নেচে চল্‌লো। তাদের সকলের জুতোই তখন ছিঁড়ে একেবারে নষ্ট হয়ে যাবার মতো। কাজেই তারা তখন নাচ থামিয়ে বিদায় নেবার জন্যে প্রস্তুত হ'লো। রাজকুমারেরা আবার নৌকো বেয়ে রাজকন্যাদের সরোবরের ওপারে পৌছে দেয়। ওপারে পৌছে তারা বিদায় নেয় পরস্পরের কাছে। রাজকুমারীরা তাঁদের প্রতিশ্রুতি দেন আবার তারা সামনের রাত্রেই আসছেন।

রাজকুমারীরা যেই সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠবেন, সৈনিকটি তার আগেই ঘরে ঢুকে নিজের বিছানায় এসে শুয়ে পড়ে। তারপর, রাজকুমারীরা যখন ক্লান্ত হ'য়ে একে একে ঘরে ঢোকে তখন শুনতে পায়, সৈনিকটি তখনও নাক ডাকিয়ে চলেছে। কাজেই তারা পরম নিশ্চিন্ত মনে বল্‌লে—"যাক্ বাবা বাঁচা গেছে। সব ঠিক হ্যায়!"

তারপর তারা সেই সুন্দর পোষাক-পরিচ্ছদ ছেড়ে ফেলে। জুতো খুলে বিছানায় শুয়ে পড়ে।

পরদিন সকালে উঠে কিন্তু সৈনিকটি কিছুই বলল না। এই অদ্ভুত অভিযান সে আরও দু'দিন দেখবে ব'লে ঠিক করলো। দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাত্রে সে আবার রাজকুমারীদের অনুসরণ করলো। আগের রাত্রের মতই সব ঘটনা ঘটে গেল একে একে। প্রত্যেক রাত্রেই জুতো নষ্ট না হওয়া পর্যন্ত রাজকুমারীরা নাচত, তারপর ফিরে আস্‌ত প্রাসাদে।

তৃতীয় দিন রাত্রে কিন্তু সৈনিকটি সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলো একটা সোনার পানপাত্র। রাত্রে রাজকুমারীরা কোথায় যায়, এ যেন তারই একটা প্রমাণ বা চিহ্ন।

রহস্য উদ্‌ঘাটনের যখন সময় হ'লো, তখন তাকে নিয়ে হাজির করা হ'লো রাজার সামনে। সৈনিকটি তার সঙ্গে নিয়ে গেল—গাছের সেই

ডাল তিনটি, আর সেই সোনার গ্লাসটা। রাজকুমারীরা দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলো সে কি বলে রাজার সামনে।

রাজা যখন জিজ্ঞাসা করলেন—"এবার বল তো, প্রত্যেক রাত্রে আমার এই বারোটি মেয়ে কোথায় গিয়ে নাচে?" সৈনিকটি তখন জবাব দেয়—"মাটির নিচে। সেখানে বারোজন রাজপুত্রের সঙ্গে তাঁরা নাচেন।"

তারপর যা যা ঘটেছিল, একে একে সে তা রাজার কাছে খুলে বলে। আর, সেই ডাল তিনটি আর সোনার গ্লাসটি এনে দেখায় রাজামশাইকে।

রাজা তখন রাজকন্যাদের ডেকে পাঠান।

তারা এলে বলেন—"সৈনিক যা বলছে, এ কি সব সত্যি?" রাজকুমারীরা দেখল তারা তো ধরা পড়েই গেছে, আর লুকিয়ে লাভ কি। তাই সকল কথাই তারা স্বীকার করলো।

রাজা তখন সৈনিকটিকে ডেকে বললেন—"তোমারই জিৎ। এবার কোন রাজকন্যাকে তুমি বিয়ে করতে চাও, বলো।"

সৈনিকটি জবাব দিল—"আজ্ঞে, বয়স তো আমার নেহাৎ কম হ'লো না। আমি তাই বড় রাজকুমারীকেই বিয়ে করতে চাই।"

সেইদিনই ধুমধাম ক'রে তাদের বিয়ে হ'য়ে গেলো।

রাজামশাই ঘোষণা করলেন—"এই সৈনিকই হবে আমার উত্তরাধিকারী।"

শালগম

দুই ভাই ছিল সৈনিক। একজন ধনী, আর একজন গরীব। যে গরীব সে ভাবে তাকে নিজের দুঃখ ঘোচাতে হবে। এই ভেবে সে তার লাল কোটটা খুলে বাগানের কাজে লেগে যায়। জমি ভালো ক'রে খুঁড়ে তাতে শালগমের বীজ বোনে।

বীজ থেকে যখন চারা হয়, তখন দেখা যায় একটা চারা আর সব চারাকে মাথা ছাড়িয়ে উঁচুতে উঠেছে। ক্রমেই সেটা বাড়তে থাকে। মনে হ'লো এটা যেন বেড়েই চলবে। কাজেই, এটাকে শালগমের রাজা বলা যেতে পারে। কারণ, এত বড় শালগম এর আগে কেউ কোনদিন চোখে দেখেনি, দেখবেও না আর কখনো। অবশেষে এটা এতই বড় হ'লো যে, একটা গোরুর গাড়ি ভ'রে গেল। দুটো বলদেও সে গাড়ি যেন আর টেনে নিতে পারে না।

গরীব ভাইটি তখন বুঝে উঠতে পারে না, এই প্রকাণ্ড শালগম দিয়ে সে কি করবে। এটা তার পক্ষে বর না অভিশাপ তাই বা কে জানে? একদিন সে নিজেকে নিজেই প্রশ্ন ক'রে বলতে লাগলো—

"এটা দিয়ে কি করব? যদি এটা বিক্রী করি তাহ'লে কি অন্য শালগমের চেয়ে বেশি দাম পাওয়া যাবে? আর, খাওয়ার পক্ষে এরচেয়ে ছোট ছোট শালগমই তো ঢের ভালো। তার চেয়ে এক কাজ করা যাক। এটা রাজাকে সেলামী পাঠাই। সেই হবে সব চেয়ে ভালো।"

তারপর সে বলদ জোড়া ছুটিয়ে দিল। রাজদরবারে পৌঁছে, একেবারে রাজার কাছেই শালগমটাকে নিয়ে হাজির করে। হাত জোড়

করে বলে—"মহারাজ! আপনাকে এটা আমি দিচ্ছি। এটা আমার সেলামী।"

রাজা বললেন—"কি অদ্ভুত জিনিস! জীবনে অনেকরকম মজার জিনিসই তো দেখেছি। কিন্তু এরকম বিদ্‌ঘুটে প্রকাণ্ড শালগম তো আর চোখে পড়েনি! তুমি এর বীজ পেলে কোথায়? না, তোমার ভাগ্যে এটা আপনা আপনি এমন ফলেছে? তাই যদি হয় তো তোমার মহা সৌভাগ্য বলতে হবে।"

শালগমওয়ালা জবাব দিলে—"কি যে বলেন মহারাজ, আমার আবার সৌভাগ্য? আমি একজন গরীব সৈনিক, কষ্টেসৃষ্টে কোনরকমে দিন চলে। ভাবলাম আর কিছু উপায় করতে হবে, তাই একদিন নিজের কোটটা খুলে জমিতে চাষ করতে লেগে যাই। আমার এক ভাই আছে। সে খুব বড় লোক। হুজুর তাকে ভাল করেই চেনেন। সকলেই তাকে জানে। কিন্তু যেহেতু আমি গরীব, আমাকে তাই কেউই আর মনে রাখে না!"

রাজা তখন দয়াপরবশ হ'য়ে তাকে বললেন—"আর তোমাকে গরীব থাকতে হবে না। আমি তোমাকে এত ধনদৌলত দেব যে, তুমি তোমার ভাইয়ের চেয়েও বড়লোক হ'য়ে উঠবে।"

এই ব'লে রাজা তখন তাকে মোহর দিলেন, জমি দিলেন, এবং গোরু বাছুর দান ক'রলেন। এতে ক'রে সে এমন বড় লোক হ'য়ে উঠলো যে তার কাছে বড় ভাইয়ের ধন দৌলত সব তুচ্ছ হ'য়ে গেল।

বড় ভাই যখন এসব কথা শুনলো এবং জানতে পারলো যে এক শালগমের দৌলতেই তার গরীব ভাই রাতারাতি বড় লোক হ'য়ে উঠেছে, সে তখন হিংসেয় মরে আর কি! নিজের মনে মনে সে তখন উপায় ঠাওরাতে থাকে, কি ক'রে সে ওর মত ঐশ্বর্য লাভ ক'রতে পারে। শেষটায় সে বুদ্ধি খাটিয়ে তার ভাইয়ের চেয়েও খাসা উপায় বের করলো।

সোনার একটা দামী উপহার আর কয়েকটা সুন্দর সুন্দর ঘোড়া সে ঠিক ক'রে নিলে রাজাকে দেবার জন্যে। আর মনে মনে ভাবলো, রাজা তাকে নিশ্চয়ই তার ভাইয়ের চেয়ে বেশি কিছু দান ক'রবেন। কারণ, তার ভাই যদি একটা শালগমের জন্যেই অত পেয়ে থাকে, তো তার উপঢৌকনের জন্যে নিশ্চয়ই মোটারকম কিছু মিলবে।

রাজা তার উপঢৌকন সাদরেই গ্রহণ ক'রলেন। বল্লেন—"আমি তো বুঝতে পারছি না এর বিনিময়ে ঐ প্রকাণ্ড শালগম ছাড়া আর কি দামী জিনিস তোমাকে দেওয়া যেতে পাবে ?" কাজেই, সৈনিকটি তখন বাধ্য হয়েই ঐ শালগম গাড়িতে বোঝাই ক'রে বাড়ি ফিরলো। বাড়িতে ফিরে কার ওপরে সে রাগ ঝাড়বে ভেবে পেলো না। শেষটায় তার মাথায় দুষ্টুবুদ্ধি জাগলো। সে ঠিক কবলো তার ভাইকেই মেরে ফেলবে।

এই ভেবে সে কতগুলো ভাড়াটে গুণ্ডা নিয়ে এলো ভাইকে খুন করবার জন্যে। তারপর, তাদেব কোনখানে লুকিয়ে থাকতে হবে দেখিয়ে দিয়ে, সে তার ভাইয়ের কাছে গিয়ে বল্লো—"ভাই হে! আমি একটা গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছি। এসো মাটি খুঁড়ে সেটা বের করি, তারপর নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি ক'রে নিই।"

ভাইটি কিন্তু এতে তার কোনরকম বদমায়েসী আছে সেরকম কোনো সন্দেহ ক'রলো না। দুজনেই তখন বেরিয়ে পড়লো। পথে যেতেই সেই গুণ্ডাবা এসে তার ওপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে তাকে বেঁধে ফেল্লো। তারপর তাকে গাছে ঝুলিয়ে ফাঁসি দেবার জন্যে নিয়ে চল্লো টানতে টানতে।

কিন্তু যখন তাদের আয়োজন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, ঠিক সেই সময় দূর থেকে একটা ঘোড়ার খটাখট্ আওয়াজ ভেসে এলো। ভয় পেয়ে তারা তখন তাড়াতাড়ি তাদের বন্দীকে একটা ছালার মধ্যে বন্ধ ক'রে

দড়ি দিয়ে গাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখে ছুটে পালালো। ইতিমধ্যে বহু চেষ্টায় সেই লোকটি ছালার মধ্যে একটা বড়রকমের ফুটো ক'রে মাথাটা বের ক'রে দিল।

অশ্বারোহী যখন কাছে এসে পড়েছে তখন তাকে দেখে বোঝা গেলো সে একজন ছাত্র। ঘোড়ায় চ'ড়ে সে গান গাইতে গাইতে চলেছে। বেশ স্ফূর্তিবাজ ছেলেটি। ছালার মধ্যে সেই লোকটি যখন দেখল সে ঠিক গাছের নিচ দিয়েই চলেছে, তখন সে চীৎকার ক'রে ব'লে উঠলো—"সুপ্রভাত! বন্ধু, সুপ্রভাত!"

ছাত্রটি এদিক্ ওদিকে তাকিয়ে দেখে কেউ কোথাও নেই। কাজেই কোন দিক থেকে স্বরটা ভেসে এলো বুঝতে না পেরে সে চেঁচিয়ে ব'লে উঠলো—"আমাকে কে ডাকছে?"

গাছের সেই লোকটি তখন জবাব দিল—"চোখটা একবার উপরে তুলে দেখ ভাই। আমি এখানে জ্ঞান-ভাণ্ডারে ব'সে আছি। অল্প-সময়ের মধ্যে আমি অনেক বড় বড় জিনিস শিখে ফেলেছি। অনেক বিস্ময়কর জিনিসেরও হদিস পেয়েছি এখানে ব'সে। এই আসনে ব'সে যে জ্ঞানলাভ হয়, তার তুলনায় ইস্কুলের বিদ্যে তো তুচ্ছ, একদম ফাঁকি। আর কিছুক্ষণ এভাবে থাকলে আমি এমন জ্ঞানলাভ ক'রব যা পৃথিবীতে কোনদিন কোনো বড় পণ্ডিতও পারেন নি। এখানে ব'সে আমি আকাশের রহস্য বুঝতে পারি, তারার গতিবিধি টের পাই। কি ক'রে বাতাসকে সংযত করা হচ্ছে, সমুদ্রতীরে কত বালুকণা প'ড়ে আছে, কি ক'রে রোগীর রোগ সারানো যায়, এবং সাধারণ মানুষ, পাখী ও মূল্যবান পাথরের কি কি গুণ আছে তাও এখানে ব'সে আয়ত্ত করেছি। একবার যদি তুমি এখানে এসে বসো ভাই, তাহ'লেই তুমি সব টের পাবে এবং এই জ্ঞানের কি অসীম শক্তি তা-ও বুঝতে পারবে।"

এসব কথা শুনে ছাত্রটি ভারী অবাক হ'লো। তারপর সে বল্লে—"আজ আমার কি শুভদিন যে পরম শুভমুহূর্তে আপনার দেখা পেয়েছি। আপনি কি কিছুক্ষণের জন্যে আমাকে ঐ আসনে বসিয়ে দিতে পারেন না ?"

গাছের সেই লোকটি তখন অনিচ্ছার ভাব দেখিয়ে বল্ল—"জায়গা তো বড় কম। তা হোক্! তবু না হয় আমি তোমাকে এখানে কোন রকমে বসবার জায়গা ক'রে দিতে পারি, কিন্তু আমাকে যে তার জন্যে ভালোরকম পুরস্কার দিতে হবে, আর, আমার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করতে হবে বন্ধু! কিন্তু তোমাকে আরও ঘণ্টাখানেক নিচে অপেক্ষা করতে হবে। ততক্ষণ আমি আমার অজানা আরও একটা বিদ্যা শিক্ষা ক'রে নিতে চাই।"

কাজেই, ছেলেটিকে তখন সেই গাছের নিচে কিছুক্ষণ ধরে অপেক্ষা করতে হ'লো। কিন্তু সময় যেন আর কাটতে চায় না। ছাত্রটি ক্রমে অস্থির হ'য়ে উঠলো। তারপর সে একান্ত অনুরোধ জানিয়ে বল্লো—"আমাকে এইবার গাছে উঠতে দিন। আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না। জ্ঞান লাভের জন্য আমি অধীর হ'য়ে উঠেছি।"

গাছের সেই লোকটি তখন তাকে অনুগ্রহ করবার ভাব দেখিয়ে বলল—"আগে ঐ দড়িটা টেনে আমার এই জ্ঞানের থলিটা নামিয়ে নাও। তারপর ওর মুখের বাঁধনটা খুলে তুমি অনায়াসেই ওর মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে।"

ছাত্রটি তখন তার কথামত দড়িটা খুলে ছালাটা নিচে নামিয়ে লোকটাকে মুক্ত ক'রে দিলো। তারপর সে বল্লে—"এখন আমাকে তাড়াতাড়ি উপরে তুলে দিন।"

এই বলে ছাত্রটি যেই ছালার মধ্যে পা ঢোকাতে যাবে, তখন সেই

লোকটি বলে উঠল—"উহুঁহুঁ ওভাবে নয়। একটু দাঁড়াও, কি ভাবে ঢুকতে হবে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।"

এই ব'লে সে আচম্‌কা ছাত্রটিকে একটা ধাক্কা দিয়ে প্রথমে তার মাথাটা ঢুকিয়ে ছালার মুখটা বন্ধ ক'রে দিল। তারপর দড়ি দিয়ে ছালাটাকে গাছের ডালে ঝুলিয়ে দিয়ে বল্‌ল—"কেমন লাগছে হে বন্ধু? তুমি কি টের পাচ্ছ না যে, ধীরে ধীরে তোমার জ্ঞান লাভ হচ্ছে? এখন কিছুক্ষণ ঐভাবে শান্ত হ'য়ে থাক, তাহ'লে এমনই তুমি জ্ঞান সঞ্চয় করবে, যা জীবনে আগে কখনো করনি।"

যতক্ষণ না আর কেউ এসে বেচারীকে নামিয়ে নেয়, ততক্ষণ তাকে জ্ঞান লাভের সুযোগ দিয়ে এই বলে সে তার ঘোড়ায় চড়ে অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

থিয়োডার কোরনার—

বীণার ঝঙ্কার

নতুন বিয়ে হয়েছে ওদের।

মধুযামিনীর আনন্দোৎসবে ওরা আজ দিশেহারা। দেখে মনে হয়, ভালোবাসার রাজ্যে শুধু যেন ওদেরই একাধিপত্য। খুশির সায়রে ওরা ডুব দিয়েছে। ভবিষ্যতের ভাবনা ওদের নেই।

ছেলেবেলা থেকেই ওদের বন্ধুত্ব। দু'জনে ছিল খেলার সাথী। আজ ওরা যে সুখস্বর্গ গড়ে তুলেছে, তার জন্যে সেল্‌নারকে বহুদিন ধরেই অপেক্ষা করতে হয়েছে। অবস্থার বিপর্যয়ই তার জন্যে দায়ী। কিন্তু প্রকৃত প্রেমিক যে, সে যে তার প্রিয়তমাকে লাভের জন্য যুগ-যুগান্ত অপেক্ষা করতে পারে।

অবশেষে সেল্‌নার লাভ করলো প্রচুর ঐশ্বর্য। এক রবিবারে সে তার প্রিয়তমার হাত ধরে নতুন বাড়িতে এসে উঠলো।

চতুর্দিকে আত্মীয়-স্বজন ও পরিজনের কলগুঞ্জন। উৎসব-মুখর দিনগুলি একে একে বিদায় নিল। তারপর এলো অখণ্ড নীরবতা ও নির্জনতা। তারা যেন স্বর্গসুখ অনুভব করলো।

তাদের দিন কেটে যায় প্রেম-গুঞ্জনে আর কলরবে। কি মধুর সেই দিন, কি সুন্দর সেই রাত। সেল্‌নার বসে বাঁশি বাজাত। বাঁশির রন্ধ্রে রন্ধ্রে বেরিয়ে আসে সুমধুর কত রাগিণী। আর কখনো তরুণীর হাতের ছোঁয়া লেগে বীণার তারে তারে ওঠে ঝঙ্কার। তাদের এই মিলনের ছবিটি দেখে মনে হয়, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ যেন তাদের স্বাগত সম্ভাষণ জানাচ্ছে।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় দু'জনেই বস্‌লো সঙ্গীত-কলার চর্চা করতে। অনুষ্ঠান শেষে জোসেফাইন বল্‌লে তার প্রিয়তমকে—"মাথায় যেন একটা বেদনা বোধ করছি প্রিয়!" সকাল থেকে এতক্ষণ সে বেদনার কোন কথাই বলেনি। পাছে তার স্বামী ভেবে আকুল হ'য়ে ওঠে এই ছিল তার আশঙ্কা। কিন্তু সন্ধ্যাবেলাকার সঙ্গীত-অনুষ্ঠানে উত্তেজনায় সে অসুস্থ হ'য়ে পড়ে। স্নায়বিক দুর্বলতা আর কি। স্বামীর কাছে কিছুই আর গোপন রইলো না। চিন্তিত হ'য়ে সে ডাক্তারকে ডেকে পাঠাল। ডাক্তার এসে অভয় দিয়ে ব'লে গেলেন—"ভাবনার কিছু নেই। সকালের দিকেই সব সেরে যাবে।"

সারা রাত ধরে জোসেফাইন অজ্ঞান অবস্থায় প্রলাপ বকে চলল। আবার ডাক্তার এলেন। পরীক্ষা ক'রে বললেন—"এটা একটা বিশেষ রকমের স্নায়বিক দুর্বলতা।" চিকিৎসা চললো সর্বপ্রকারে। সেবা-শুশ্রূষারও কোনো ত্রুটি হ'লো না। কিন্তু রোগিনীর অবস্থা ক্রমশই খারাপের দিকে গেল।

সেলনার তো ভেবে কোনো কূলকিনারা পায় না। অসুখের আটদিন পর জোসেফাইন বেশ বুঝতে পারলো এ পৃথিবীতে তার আর বেশিদিন মেয়াদ নেই, ডাক্তার মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে এসেছেন এতদিন। জোসেফাইন বুঝলো, আয়ু তার শেষ হ'য়ে এসেছে। শক্ত ক'রে সে বুক বাঁধলো।

শেষবারের মতো প্রিয়তমের হাতখানি তুলে নিয়ে অশ্রুসজল চোখে জোসেফাইন বলে ওঠে—"সুন্দর এই পৃথিবী। এখানে আমরা সুখের নীড় রচনা করেছিলাম। আজ সেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে ব্যথা ও বেদনায় আমি ভেঙে পড়ছি। তোমার বাহুবন্ধনের নিবিড় স্পর্শ আমি আর পাব না, কিন্তু আমার অশরীরী আত্মা তোমারই চারপাশে ঘুরে বেড়াবে। আবার নতুন ক'রে আমাদের মিলন হবে—নতুন জন্মে।"

কথাগুলি বলতে বলতে তার সর্বাঙ্গ অসাড় হ'য়ে আসে। দু'চোখ বুজে সে চিরনিদ্রায় অভিভূত হ'’য় পড়ে। রাত তখন ন'টা।

শোকে আর দুঃখে সেল্‌নারের বুক যেন ভেঙে চুরমার হ'য়ে যায়। শরীর ভেঙ্গে পড়ে দিন দিন। কয়েক সপ্তাহ নীরবে কেটে যায়। বেদনার ভার কমে আসে। ধীরে ধীরে সে মনকে সুস্থ ক'রে তোলে।

সুকুমার যৌবনের সেই শ্রী আর নেই। হৃদয়ের অনুপ্রেরণা সে হারিয়ে ফেলেছে। দুঃখভারাক্রান্ত মন নিয়ে সে যেন চিন্তাসাগরে ডুবে যায়। মাঝে মাঝে অতীতদিনের ব্যথাতুর স্মৃতির ঢেউ এসে তার চিত্ত-সরোবর তোলপাড় ক'বে তোলে।

জোসেফাইনের মৃত্যুর পর, তার জিনিসপত্রগুলি আগের মতই পড়ে থাকে। কেউ তা স্পর্শ করে না। বোনার জিনিসগুলি একইভাবে পড়ে ছিল টেবিলের উপর। বীণাটিকেও দেখা গেল ঘরের সেই নির্দিষ্ট কোণটিতে, যেখানে আগেও তা থাকতো। সন্ধ্যাবেলায় প্রিয়তমার স্মৃতি-বিজড়িত কক্ষে গিয়ে হাজির হ'তো সেল্‌নার। জানালার পাশে দাঁড়িয়ে বাঁশি বাজাতে বাজাতে সে যেন কোন্ স্বপ্নলোকে চলে যেতো।

এক জ্যোৎস্না রাত।

সামনের দুর্গশৃঙ্গ থেকে ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে ন'টা বেজে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে জোসেফাইনের বীণা থেকেও যেন বেরিয়ে আসে সঙ্গীত-মূর্ছনা। সেল্‌নার চমকে ওঠে এই অলৌকিক কাণ্ড দেখে। বাঁশি বাজানো তার থেমে যায়। বীণার ঝঙ্কারও বন্ধ হ'য়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে। কিছুক্ষণ পরে সেল্‌নার আবার যেই জোসেফাইনের প্রিয় রাগিণীটি তার বাঁশিতে আলাপ ক'রে ওঠে, সেই মুহূর্তে তার সুরে সুরে সুর মিলিয়ে ঠিক একই ভাবে বীণাটিও বাজতে থাকে। আনন্দে পুলকিত হ'য়ে ওঠে সেল্‌নার।

সর্বদেহে তার রোমাঞ্চ দেখা যায়। সঙ্গে সঙ্গে মেঝেতে পড়ে যায় সে। তার যেন মনে হয়, প্রিয়তমার অশরীরী আত্মাকে সে জড়িয়ে ধরেছে।

কিছুক্ষণ পরে এক ঝলক গরম বাতাসের সঙ্গে একটা আবছা আলোয় ঘর ভরে ওঠে। সেল্‌নার উচ্ছ্বসিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করে—"ওগো! তুমিই তো আমার প্রিয়তমার, আমার জোসেফাইনের অশরীরী ছায়া? আমার কাছে তুমি মাঝে মাঝে এমনি করেই আসবে তো? আমায় তুমি এখনো ভালোবাস, না? তোমার নিশ্বাস আমার গায়ে এসে লাগছে। অধরে তোমার চুম্বনস্পর্শ অনুভব করছি। তুমি এলে, আনন্দে তাই সারা দেহ আমার রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠেছে।"

আরেকবার সেল্‌নার যেই বাঁশি তুলে ধরেছে, অমনি বীণাটি বেজে ওঠে। ধীরে ধীরে সুর মিলিয়ে যায় বাতাসে। সন্ধ্যার উত্তেজনায় সেল্‌নারের দেহতন্ত্রীও যেন ভীষণভাবে আলোড়িত হ'য়ে ওঠে।

রাত্রে ভালো ক'রে ঘুম হয় না তার। ঘুমের মধ্যে সে যেন বীণার সেই সুরের ডাক শুনতে পায়। সে-সুর যেন তাকে বলে—"চলে এসো, চলে এসো, আমি যে তোমায় ডাকছি।

সকালে তার ঘুম ভাঙে দেরিতেই। রাত্রের সেই স্বপ্নের ঘোর যেন এখনো কাটেনি তার। তার প্রিয়তমা স্ত্রীর আত্মা তাদের প্রেমকে যেন দেহাতীত ক'রে তুলেছে। সেই অতীন্দ্রিয় অনুভূতিতে সেল্‌নারের অন্তর-লোকে আনন্দের বন্যা ওঠে।

জোসেফাইনের কক্ষে গিয়ে বাঁশির সুরে সুরে সে স্ত্রীর সঙ্গে নৈকট্য স্থাপন করবে, এই আশায় সন্ধ্যার অপেক্ষায় অধীর আগ্রহে সে বসে থাকে। ন'টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে তার বাঁশি বাজে। অমনি বীণার সুমধুর ঝঙ্কারে সারা ঘর মুখরিত হ'য়ে ওঠে। বাঁশি থামার সঙ্গে সঙ্গে বীণাও থেমে যায়। সেই আবছা আলো যেই তার মাথার উপরে এসে দাঁড়ায়—

সেল্‌নার সেই মুহূর্ত্তেই উচ্ছ্বসিত আবেগে ব'লে ওঠে—"জোসেফাইন! প্রিয়তমা! আমায় তুমি বুকে তুলে নাও।" বীণার সুর মিলিয়ে যায় ধীরে ধীরে। এবারকার অনুভূতি যেন গভীর ছাপ রেখে যায় সেল্‌নারের মনে। নিজের সেই নির্জন ঘরে গিয়ে প্রবেশ করে সেল্‌নার।

এদিকে তার বিশ্বস্ত ভৃত্যটি প্রভুর এই অবস্থা দেখে মুষড়ে পড়ে। গোপনে সে একজন ডাক্তারকে খবর দেয়। ডাক্তার ছিলেন সেল্‌নারেরই বন্ধু। পরীক্ষা ক'রে তিনি দেখলেন যে, জোসেফাইনের অসুখের সমস্ত লক্ষণই তার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। কোনো পার্থক্যই নেই দু'জনের মধ্যে। বরং সেল্‌নারের অবস্থা যেন আরও খারাপ। সেই রাত্রে তার প্রবল জ্বর এলো। জ্বরের ঘোরে সে কেবল জোসেফাইন আর তার বীণার কথাই বলে যাচ্ছিল।

সকালের দিকটায় তার অবস্থার একটু পরিবর্তন দেখা গেল। মানসিক বিকাব অনেকটাই কমে গেছে। বেদনার উপশম হ'লো বটে, কিন্তু তার আর বুঝতে বাকী রইলো না যে, জীবনের শেষ প্রান্তে সে এসে দাঁড়িয়েছে। ডাক্তার অভয় দিলেন। কিন্তু সেল্‌নার তাতে আশ্বস্ত হ'লো না মোটেই। সে নিজের মতকেই বিশ্বাস ক'রে নিল।

সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে এলো পশ্চিম দিগন্তে। তার দেহ দুর্বল হ'য়ে পড়ল। কাঁপা গলায় সে একবার সবাইকে অনুরোধ কবল—"আপনারা আমায় জোসেফাইনের কক্ষে নিয়ে চলুন।" কথামত তাকে সেই ঘরেই নিয়ে যাওয়া হ'লো।

চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল সেল্‌নার। চোখের কোণ থেকে অবিরল ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। সেল্‌নার যেন স্পষ্ট বুঝতে পারলো, ন'টা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই তার জীবনদীপ নির্বাপিত হ'য়ে যাবে। সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্তটি এগিয়ে আসতে লাগলো ক্রমশ। সকলের কাছ থেকে

বিদায় দিয়ে, এক ডাক্তার ছাড়া আর সবাইকে ঘরের বাইরে যেতে অনুরোধ করলো সে।

দুর্গ-শৃঙ্গ থেকে আবার বেজে উঠলো ন'টা।

সেল্‌নারের চোখদু'টি স্থির হ'য়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে, তার সারা মুখ একটা স্বর্গীয় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো। মৃদুকণ্ঠে সে একবার ব'লে উঠলো—"এখান থেকে বিদায় নেবার আগে, জোসেফাইন একবারটি তুমি আমার পাশে এসে দাঁড়াও। তোমার প্রেমের স্পর্শে যেন আমার মৃত্যুভয় দূরে চলে যায়, সেই অভয়বাণী শোনাও একটিবার।" সঙ্গে সঙ্গে বীণার তারে তারে বেজে ওঠে ঝঙ্কার। সেই চিরপরিচিত সুমধুর রাগিণী। একটা উজ্জ্বল আলোও যেন এসে পড়ে মৃত্যু পথযাত্রী সেল্‌নারের চোখে মুখে। সে ব'লে ওঠে—"আসছি, আসছি, ওগো আমি আসছি।" এই কথা বলেই যেন সে মৃত্যুর কাছে তার পরাজয় স্বীকার করে। বীণার ঝঙ্কারও মিলিয়ে যায় ধীরে ধীরে। সেল্‌নারের দেহ অসাড় হ'য়ে পড়তেই, বীণার তারগুলিও ছিঁড়ে যায় কোন অশরীরী লোকের হাতের স্পর্শে।

ডাক্তার শোকাভিভূত হ'য়ে সেল্‌নারের মুখ ঢেকে দেন তার গায়ের কাপড়খানা দিয়ে। মনে হচ্ছিল, সেল্‌নার যেন পরমশান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছে। এ ঘুম তার আর ভাঙবে না। শোকে ব্যাকুল হ'য়ে উঠলেন ডাক্তার। ছুটে বেরিয়ে গেলেন বাড়ি থেকে। বন্ধুর মৃত্যু তিনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন। তাই দুঃখে তিনি এত অধীর হ'য়ে পড়েছিলেন, যে এই দুঃসংবাদ তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুদের কাছে সঙ্গে সঙ্গে বহন ক'রে নিয়ে যেতে পারেন নি। ছিন্নতন্ত্রী সেই বীণাটিকে তিনি বন্ধুর স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে সযত্নে রেখে দিয়েছেন তাঁর ঘরে।

পল্ ভন হেসী—

উন্মত্ততা

তখনো ভালো ক'রে সকাল হয়নি। বিসুবিয়াস থেকে শুরু ক'রে নেপল্‌স্ পর্যন্ত গাঢ় ধূসর কুয়াসা ছড়িয়ে গিয়ে, সমুদ্রতীরের ছোট ছোট শহরগুলিকে অন্ধকারে ঢেকে ফেলেছিল। সমুদ্র তখন শান্ত। এরই মধ্যে সোরেণ্টো পাহাড়ের নিচে সমুদ্রের কোল ঘেঁষে যে-সব জেলেরা বাস করে, তারা তাদের বৌ-ঝিদের নিয়ে কাজে লেগে গিয়েছে। আগের রাত্রে যে জাল ফেলা হয়েছিল, কেউ বা তা গুটিয়ে নিয়ে নৌকো ক'রে তীরের দিকে আসছে,—বড় বড় কাছি ধরে নৌকো টেনে আনছে তারা। কেউ বা সমুদ্রে যাবার আয়োজন করছে, পাল খাটাচ্ছে; কেউ বা আবার তাদের পাহাড়তলীর আশ্রয় থেকে দাঁড়, মাস্তুল সব বয়ে আনছে। কোথাও কেউ চুপচাপ বসে নেই। এমন কি বুড়োরা পর্যন্ত, যারা অনেকদিন হলো সমুদ্রে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে, তারাও অন্য সকলের সঙ্গে জাল গোছানোর কাজে লেগে পড়েছে। এদিকে ওদিকে একটু নজর দিলেই চোখে পড়বে, এক বুড়ী হয় তার তকলীতে সুতো কাটছে, নয় তো তার নাতি-নাত্‌নীদের জন্য ব্যস্ত হ'য়ে ঘুরছে। বেচারীদের মা হয়তো তাদেরকে পাঠিয়ে দিয়েছে তাদের বাপকে একটু সাহায্য করবার জন্যে।

একজন তার ছোট্ট টেকোয় সুতো কাটছিল। হঠাৎ সে তার পাশের দশ বছরের মেয়েটিকে উদ্দেশ ক'রে বল্লে—"রচেলা! ঐ দেখ আমাদের পাদ্রী সাহেব। এ্যাণ্টোনিয়ো তার ডিঙিতে ক'রে ওঁকে কাঁপ্রীতে পৌঁছে দিতে চলেছে। কিন্তু ও হরি! পাদ্রী সাহেবের চোখদুটো যেন

ঘুমে ঢুলে পড়ছে!" হাত তুলে সে পাদ্রী সাহেবকে বিদায় সম্ভাষণ জানাল। তিনি তখন ডিঙি-নৌকোতে তাঁর পোষাক-পরিচ্ছদ সযত্নে বেশ গুটিয়ে বসেছেন।

ঘাটের লোকেরা তখন হাতের কাজ ক্ষণকালের জন্য বন্ধ ক'রে তাদের গুরুমশাইকে একবার দেখে নিচ্ছে। তিনিও ডাইনে বাঁয়ে তাকিয়ে মৃদু হাস্যে তাদের প্রত্যভিবাদন জানাচ্ছেন।

ছোট্ট মেয়েটি তার পিতামহীকে প্রশ্ন করে—"ঠাকুমা, উনি কাপ্রী যাচ্ছেন কিসের জন্য বল তো? সেখানে কি আর কোনো পুরোহিত নেই যে আমাদেরটা নিয়ে টানাটানি?"

ঠাকুমা জবাব দেন—"দূর বোকা মেয়ে! সেখানে পুরোহিতের অভাব নেই, কত সুন্দর সুন্দর গির্জাও আছে। এমন কি একজন সাধুপুরুষও রয়েছেন ওখানে। আমাদের তাও নেই। আসলে ব্যাপারটা কি জানিস? সেখানে একজন বড়লোকের মেয়ে বাস করছেন,—এখানেও তিনি এক সময় বাস ক'রে গেছেন। তিনি খুব পীড়িত হ'য়ে পড়েন এক সময়। তখন আমাদের এই পুরোহিতই ভগবানের কাছে প্রার্থনা ক'রে তাঁকে সারিয়ে তোলেন। তার আগে সবারই কিন্তু ধারণা হয়েছিল সেই মহিলা আর এক রাত্রিও টিঁকে থাকতে পারবেন না। কিন্তু মেরী মায়ের দয়ায় তিনি সে যাত্রায় বেঁচে উঠলেন বেশ শক্ত সবল হয়েই। তারপর থেকে তিনি প্রত্যেক দিন সমুদ্রস্নান পর্যন্ত করতেন। তিনি যখন এ জায়গা ছেড়ে চলে যান তখন আমাদের গির্জার জন্যে অনেক টাকাকড়ি দিয়ে যান। গরীবদের জন্যেও বিলিয়ে যান প্রচুর অর্থ। সবাই একথা বলে যে, তিনি কিছুতেই যেতে রাজী হতেন না, যদি না আমাদের এই পাদ্রী সাহেব সেখানে গিয়ে তাঁকে দেখে আসবার প্রতিশ্রুতি দিতেন। সব চেয়ে আশ্চর্য, তিনি আমাদের পুরোহিতের কাছেই তাঁর ধনসম্পত্তি রেখেছেন। তাঁর

প্রতি মহিলাটির অগাধ বিশ্বাস। তিনিই আবার ওঁকে ডেকে পাঠিয়েছেন। আমরা এমন একজন পুরোহিত পেয়েছি, এ আমাদের সৌভাগ্য বল্‌তে হবে। মেরী মা তাঁর কল্যাণ করুন।" এই বলে তিনি যতক্ষণ না নৌকোটি তীর থেকে রওনা হ'য়ে যায় ততক্ষণ সেই দিকে তাকিয়ে হাত নাড়তে থাকেন।

নেপল্‌সের দিকে উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে সেই পাদ্‌রী সাহেব তখন জিজ্ঞাসা করলেন—"ওগো বাছা! আমরা কি ভালো আবহাওয়ার মধ্য দিয়ে যেতে পারব ?"

ছোক্‌রা মাঝিটি তখন জবাব দেয়—"সূর্য এখনো ওঠেনি। উঠলেই এই কুয়াসা কেটে যাবে।"

"বেশ! বেশ! আমরা তাহ'লে সূর্যের তাপ বাড়বার আগেই যাতে পৌঁছে যেতে পারি তার চেষ্টা কর।"

বৈঠা হাতে এ্যাণ্টোনিও উঠে দাঁড়ায়। নৌকো ছাড়বার আগে সোরেণ্টো পাহাড়ের দিকে সমুদ্রতীর থেকে যে আঁকা বাঁকা পথটি চলে গিয়েছে সেই দিকে তার নজর পড়ে। সে দেখতে পায় খাড়া উঁচু তীরে লম্বা, সরু একটা মেয়েলী মূর্তি। পরক্ষণেই তাকে দ্রুত পাথরের ওপর দিয়ে ছুটে আসতে দেখা যায়। ঘন ঘন সে তার রুমাল নাড়তে থাকে। তার বগলে একটা পুঁটুলী, তার বেশবাসও নেহাৎ সাধারণ ধরনের, তাতে দারিদ্র্যের স্পর্শই লেগে রয়েছে। তবু সে যখন তার মুখের ওপরে ছড়িয়ে পড়া চুলগুলি সরিয়ে দেবার জন্যে মাথা ঝাঁকাচ্ছিল, তখন তার যেন একটা অসাধারণ বিশেষত্ব ফুটে উঠ্‌ছিল।

পাদরী সাহেব মাঝিকে জিজ্ঞাসা করলেন—"আমাদের আর দেরী কিসের ?"

"কাপ্‌রী যাবার জন্যে একজন ছুটে আসছে। আপনি যদি একটু

অনুমতি করেন তাহ'লে তার যাওয়া হয়। অবিশ্যি আপনারা দু'জনে বস্‌লেও আমার নৌকোর গতি কম্‌বে না। ওর বয়স বেশি নয়। বছর আঠারো হবে।"

এমন সময় মেয়েটি দেখা দিলো সেই ঘোরানো পথের বেড়ার ওপাশে।

"লরেলা!" পুরোহিত চীৎকার ক'রে উঠ্‌লেন। বল্‌লেন—"কাপ্‌রীতে ওর কি দরকার?"

এ্যান্টোনিও তার ঘাড় ঝাঁকুনি দিয়ে বল্‌লে—"তা কি ক'রে বল্‌ব!" মেয়েটি ইতিমধ্যে দ্রুতপদে এগিয়ে আসছে, তার দৃষ্টি রয়েছে ঠিক সম্মুখ দিকে।

তাকে দেখেই দু'একজন তরুণ মাঝি বলে উঠ্‌লো—"আরে এই যে, আরবাটিয়া এসো এসো, সুপ্রভাত!" পুরোহিত মশাই নৌকোয় বসে, তাই আর কিছু বলা হ'লো না তাদের। মেয়েটি কিন্তু নীরবে যেভাবে তাদের আহ্বান সাদরে গ্রহণ করলো, সেই সুন্দর ভঙ্গীটুকু যেন তাদের আরও চঞ্চল ক'রে তুল্‌লো।

"সুপ্রভাত' লরেলা!"—পুরোহিত মশাই ব'লে উঠ্‌লেন—"কেমন আছ? তুমি কি আমাদের সঙ্গে কাপ্‌রীতে যাচ্ছ?"

—"আপনি যদি দয়া ক'রে অনুমতি দেন।"

—"তাহ'লে এ্যান্টোনিওকে জিজ্ঞাসা কর একবার। নৌকো তো তারই। প্রত্যেক মানুষেরই নিজের জিনিসের ওপর কর্তৃত্ব আছে,— ভগবানের প্রভুত্ব যেমন আমাদের সকলের ওপর, ঠিক তেমনি।"

তরুণ মাঝিটির দিকে না তাকিয়ে লরেলা যেন তাকে উদ্দেশ করেই বলে—"আমার কাছে মোটে আট আনা রয়েছে, তা দিয়ে কি আমার যাওয়া চল্‌বে?"

লোকটি তখন বলে ওঠে—"ওটা তোমার কাছেই রেখে দাও। আমার চেয়েও ওটা তোমার দরকার।" এই বলে সে কয়েকটা কমলালেবুর ঝুড়ি সরিয়ে তাকে বসবার জায়গা ক'রে দিল। এই কমলালেবুগুলি সে কাপ্রীতে বিক্রী করবার জন্যে নিয়ে চলেছে। ওখানকার পাহাড়ে জায়গায় এসব জিনিস ফলে না।

কালো রঙের ভুরু দুটি একটু কুঁচকে মেয়েটি জবাব দিল—"বিনা পয়সায় আমি যেতে চাই না।"

পুরোহিত এবার কথা বল্লেন—"এসো বাছা এসো। এ্যাণ্টোনিও খুব ভালো ছেলে। তোমার ঐ সামান্য অর্থ নিয়ে বড়লোক হবার ইচ্ছে ওর নেই। এসো এসো উঠে এসো।" এই ব'লে তিনি তাঁকে নৌকোয় উঠ্‌তে সাহায্য করবার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিলেন।

—"এসো আমার পাশে এসে বসো। ঐ দেখো, তুমি যাতে ভালোভাবে বসতে পার, সেজন্যে এ্যাণ্টোনিও তার গায়ের ছোট কোটটি খুলে কেমন বিছিয়ে দিয়েছে। সব তরুণই এক ধাঁচের; আমাদের মতন দশজন ধর্মযাজকদের জন্যে ওরা যা না করবে, তার চেয়ে ঢের বেশি করবে একজন আঠারো বছরের তরুণীর জন্যে।"

ইতিমধ্যে লরেলা নৌকোয় উঠে নিঃশব্দে এ্যাণ্টোনিয়োর জামাটি সরিয়ে দিয়ে পাদরী সাহেবের পাশে বসেছে। এ্যাণ্টোনিয়ো বিড়্‌বিড়্ ক'রে আপন মনে কি যেন বল্লো। তারপর লগিতে জোরে এক ঠেলা দিতেই, ছোট্ট নৌকোটি সাগরের জলে তর্‌তর্ ক'রে ছুটে চল্লো।

প্রভাতসূর্যের রশ্মি ছড়িয়ে পড়েছে সাগরের জলে। সাগর তখন শান্ত। নৌকো চলেছে তার ওপর দিয়ে পথ ক'রে। পাদ্‌রী সাহেব মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলেন—"তোমার ঐ পুঁটুলীতে কি রয়েছে মা?"

—"কিছু রেশম আর সুতো আর একখানা পাউরুটি আছে ঠাকুর

মশাই! রেশমগুলো এ্যানাকাপ্রীতে একটি মেয়ের কাছে বিক্রী করব। সে ঐ দিয়ে ফিতে তৈরী করে। আর সুতোগুলো বিক্রী করব আর একজনকে।"

—"তোমার হাতে কাটা সুতো?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

—"আমার যেন মনে হচ্ছে, তুমি ফিতেও তৈরী করতে পারতে! তাই না?"

—"হাঁ পারতাম। কিন্তু মার অসুখ দিন দিন বেড়েই চলেছে। বাড়ি ছেড়ে আমার বেশিক্ষণ বাইরে থাকবার উপায় নেই। আর এমন অবস্থাও আমাদের নয় যে বাড়িতে একটা তাঁত বসাব।"

—"আবার অসুখ বেড়েছে? সত্যি বড় দুঃখের কথা। গত ইস্টারের সময় আমি কিন্তু তাকে বেশ ভালোই দেখেছিলাম।"

—"বরাবরই বসন্তকালে মার অসুখটা বাড়ে। গতবারের সেই প্রচণ্ড ঝড় ও ভূমিকম্পের পর থেকেই মা একেবারে শয্যা নিয়েছেন।"

—"ভেবো না বাছা, ভেবো না। দিন রাত কেবল ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাও। তিনিই তোমাকে শান্তি দেবেন। সব সময় সৎপথে থাকবে, আর পরিশ্রমী হবে, তাহ'লে তোমার প্রার্থনা তাঁর কানে গিয়ে পৌছুবেই পৌছুবে।"

কিছুক্ষণ থেমে পাদরী সাহেব আবার বলে উঠ্লেন—"আচ্ছা, তুমি যখন সমুদ্রের দিকে ছুটে আসছিলে, আমি তখন শুনতে পেলাম, ওরা তোমায় 'এই যে আরবাটিয়া এসো এসো, সুপ্রভাত'—বলে আহ্বান করলো। কি জন্যে ওরা তোমাকে এই নামে ডাকলে বলতো? নামটাও এমন কিছু ভালো নয়। বিশেষ ক'রে তোমার মতো শান্তশিষ্ট একজন খৃষ্টান তরুণীকে তো ও নামে মানায়ই না।"

তরুণীটির সারা মুখ রাঙা হ'য়ে উঠ্লো। আর চোখ দুটো যেন জ্বলে উঠ্লো আগুনের মতো। সে জবাব দিল——"ওরা সব সময় এইভাবে আমাকে ঠাট্টা করে। কারণ আমি নাচি না, গান গাই না আর অন্য মেয়েদের মতো বক্‌বক্‌ও করতে পারি না। আমি তো ওদের কোনো অনিষ্ট করি না, তবু কেন ওরা আমাকে শান্তিতে থাকতে দেয় না? ওদের আমি কি ক্ষতি করেছি?"

—"কিছুই করনি, তবু তোমাকে ভদ্র হ'তে হবে। যাদের খুশি তারা নাচুক, গান করুক। যারা ওসব করে না, তারা কি একটা কথাও বলে না কারো সঙ্গে?"

মেয়েটি এতক্ষণ পরে তার কালো চোখদুটি তুলে ওদের পানে চাইলো। এতক্ষণ সে যেন সবাইকে তার দৃষ্টির অন্তরালে গোপন ক'রে রেখেছিল।

কিছুক্ষণ কেউ কোনো কথা বল্‌ল না।

পর্বতশ্রেণীর ওপর দিয়ে সূর্যের আলো বিচ্ছুরিত হ'তে লাগলো। সবার মধ্যে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে বিসুবিয়াস। তার শৃঙ্গে শৃঙ্গে মেঘের স্তূপ। আর সোরেণ্টোর সমতলভূমির বাড়িগুলি বাদামী রঙের বাগানের দ্বারা পরিবেষ্টিত হ'য়ে ঘন সবুজ গাছপালার মধ্যে ধবধব করছে।

পাদ্রী সাহেব বল্‌লেন—"লরেলা! সেই চিত্রকরটির আর কোনো খবর পাও নি? আমি নীপোলিটানের কথাই বলছি। সেইতো তোমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল! তাই না?"

লরেলা মাথা নাড়লো।

—"শুনেছিলাম সে তোমার একখানা ছবি আঁকতে চেয়েছিল। তুমি আঁকতে দাওনি কেন মা?"

—"কেন সে আঁকতে চেয়েছিল? কিসের জন্যে? আমার চেয়ে

তো ঢের ঢের সুন্দরী মেয়ে রয়েছে! কে জানে সে হয়তো ছবি এঁকেই চলে যেত! মা বলেন আমাকে সে হয়তো ঐ দিয়েই ভোলাতো! তারপর আমাকে নিষ্ঠুর আঘাত দিত। হয় তো বা মেরেও ফেলতো।"

পাদ্রী সাহেব বেশ জোর দিয়েই বললেন—"না না ওসব খারাপ চিন্তা তুমি কখনো করো না। তুমি কি ঈশ্বরের আশ্রয়ে বাস করছ না মা? তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে মাথার একগাছি চুলও যে কেউ নষ্ট করতে পারে না! আর সে কিনা একখানা ছবি নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করবে? তা ছাড়া তুমিও তো একথা ভালো ক'রে জান যে, তাকে তোমার ভালো লাগে, তুমি তাকে পছন্দ কর। তা নইলে কি সে তোমায় বিয়ে করতে চায়?"

মেয়েটি কোন কথা বলে না।

—"আচ্ছা, কিজন্যে তুমি তাকে প্রত্যাখ্যান করলে? সবাই তো বলে সে অত্যন্ত ভদ্র এবং সৎপ্রকৃতির লোক। সে তো তোমাকে আর তোমার মাকে ভালোভাবেই রাখতে পারে। সুতো কেটে আর রেশম বুনে তোমরা যে ভাবে না থাকবে, তার চেয়ে অনেক ভালো অবস্থায় সে তোমাদের রাখবে।"

বেদনায় উচ্ছ্বসিত হ'য়ে মেয়েটি বলে ওঠে—"আমরা সত্যি বড় গরীব! ...মা তো দীর্ঘদিন কেবল ভুগছেনই। এ অবস্থায় আমরা তো তার কাছে একটা বোঝার মতো হয়ে দাঁড়াতাম। সংসারে কিছুতেই শান্তি থাকতো না। তার বন্ধুবান্ধবেরা যখন তার সঙ্গে দেখা করতে আসতো, তখন সে আমাদেরই জন্য তাদের কাছে লজ্জিত হ'তো!"

—"একথা তুমি কি ক'রে বলছ? আমি বলছি সে সৎ, সে দয়ালু। এমন কি সে তোমাদের জন্য সোরেন্টোতে পর্যন্ত বাস করতে চেয়েছিল। তার মত এমন পাত্র পাওয়া খুব সহজ নয় বাছা! সে যেন তোমাদের রক্ষার জন্যই স্বর্গ থেকে প্রেরিত হয়েছে।"

লরেলা বেশ দৃঢ়স্বরে এবং কতকটা যেন স্বগতোক্তি করেই বলে উঠলো—"আমি বিয়ে করতে চাই না। কখনো বিয়ে করব না আমি।"

পাদ্রী সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন—"এটা কি তোমার পণ? না, যোগিনী সাজতে ইচ্ছে হয়েছে মা?"

লরেলা ঘাড় নেড়ে জবাব দিল—"না।"

—"গাঁয়ের লোকেরা তোমাকে বলে একরোখা, জেদী মেয়ে। যদিও কথাটা ভালো নয় তবু অন্যায় বলে না তারা। তুমি কি কখনো একবার ভেবে দেখেছ এ জগতে তুমি একা, তোমার পাশে দাঁড়াবার কেউ নেই। তোমার ঐ জেদের ফলে হয়তো তোমার মার অসুখ আরও খারাপের দিকে যেতে পারে। যে হৃদয়বান লোকটি এলো তোমাকে ও তোমার মায়ের সাহায্য করবার জন্যে, কোন সঙ্গত কারণে যে তোমরা তাকে প্রত্যাখ্যান করলে, তাতো আমার মাথায় আসে না। আমার কথার উত্তর দাও লরেলা।"

নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই যেন সে মৃদুকণ্ঠে জবাব দিল—"বিশেষ কোন কারণ আছে; কিন্তু আমি তা প্রকাশ করতে পারি না।"

—"প্রকাশ করতে পার না? আমার কাছেও না? যাকে তোমরা তোমাদের বন্ধু বলে স্বীকার কর তার কাছেও না? আমি কি তোমাদের শুভার্থী নই?" পাদ্রী সাহেব জিজ্ঞাসা করেন।

লরেলা ঘাড় নেড়ে স্বীকার করে তিনি তাদের বন্ধু।

—"তাহ'লে মা, মনের দুয়ার খুলে দাও। সব কথা বলে মনের বোঝা হাল্‌কা কর। যদি তোমার কারণ সঙ্গত হয়, তাহ'লে আমি তোমার সঙ্কল্পে বাধা দেব না বরং তোমাকে সাহায্য করতেই এগিয়ে যাব। তুমি এখনো ছোট আছ, পৃথিবীর কিই বা তুমি জান? কিন্তু এমন দিন

আসতে পারে যখন তুমি এখনকার এই ছেলেমানষীর জন্যেই হয়তো অনুতাপ করবে।"

নৌকোর আর এক কোণে, যেখানে তরুণ মাঝিটি বসে জোরে জোরে দাঁড় টানছিল লরেলা সেইদিকে একবার সলজ্জ দৃষ্টিতে তাকাল। লোকটার মাথার গরম পশমী টুপিটি চোখ পর্যন্ত এসে পড়েছিল। সে জলের দিকে তাকিয়ে বহু দূরে তার দৃষ্টি মেলে দিয়েছে। দেখে মনে হয় সে যেন মনে মনে কিসের চিন্তায় বিভোর হ'য়ে আছে।

পাদ্রী সাহেব লরেলার চাহ্‌নী লক্ষ্য করলেন। তারপর তার কথা শোন্‌বার জন্যে কান নিচু করলেন।

লরেলা চুপিচুপি বলে—"আপনি কি আমার বাবাকে চিন্‌তেন না?" কথা বলতে বলতে তার মুখ অন্ধকার হ'য়ে আসে।

—"তোমার বাবাকে, মা? কেন জানব না তাঁকে? তিনি তোমার দশ বছর বয়সের সময় মারা যান। ঈশ্বর তাঁর আত্মার কল্যাণ করুন। তোমার এখনকার এই ছেলেমান্‌ষী জিদের সঙ্গে তাঁর কি সম্বন্ধ আছে মা?"

—"আপনি তাঁকে ঠিক চিনতেন না। আপনি জানেন না, আমার মায়ের এই অসুখের জন্যে তিনিই একমাত্র দায়ী।"

—"সে কি! কি ক'রে?" পুরোহিত জিজ্ঞাসা করেন।

লরেলা বলে চলে—"মার প্রতি তাঁর অসদ্ব্যবহার। তিনি মাকে প্রহার করতেন, লাথি মারতেন পর্যন্ত। মত্ত অবস্থায় রাত্রে তিনি বাড়ি ফিরতেন। আমার এখনো মনে আছে সেই সব রাত্রের কথা। মা কিন্তু কোনো প্রতিবাদ করতেন না, নীরবে তাঁর প্রত্যেকটি আদেশ পালন ক'রে যেতেন। তবু বাবা মাকে এমন ক'রে মারধোর করতেন, যে দেখে আমার বুক ভেঙে যেত। বালিশে মুখ গুঁজে আমি ঘুমোবার ভাণ করতাম, কিন্তু

ঘুম হ'তো না, সারারাত কেবল কাঁদতাম। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে, বাবা যখন দেখতে পেতেন, মা মেঝেতে লুটিয়ে আছেন, তখন হঠাৎ তাঁর পরিবর্তন দেখা দিত, তিনি ছুটে এসে মাকে তুলে ধরতেন, চুম্বন করতেন। মা যতক্ষণ না অস্ফুট চীৎকার ক'রে বলতেন যে, তাঁর দম বন্ধ হয়ে আসছে, ততক্ষণ তিনি পাগলের মত চুম্বনের পর চুম্বন ক'রে যেতেন। মুখ ফুটে আমিও কোনো কথা বলতে পারতাম না,—মা'র নিষেধ ছিল। কিন্তু ঐ থেকে মা ভেঙে পড়লেন, যেন ফুরিয়ে গেলেন একেবারে। বাবার মৃত্যুর পর থেকে আজ অবধি তিনি আর সেরে উঠলেন না। ভগবান না করুন, তিনি যদি আজ হঠাৎ মারা যান, তাহ'লে আমি একমাত্র জানব কে তাঁর মৃত্যু ঘটাল।"

পাদ্রী সাহেব তাঁর মাথা নাড়তে লাগলেন এদিকে ওদিকে। দেখে মনে হ'লো তিনি যেন মেয়েটির যুক্তির কোনো প্রতিবাদ করবার পথ খুঁজে পাচ্ছেন না। অবশেষে তিনি বললেন—"তাঁকে তুমি ক্ষমা কর। তোমার মা যেমন তাঁকে ক্ষমা করেছেন, তুমিও তেমনি তাঁকে ক্ষমা কর। আর মন থেকে এই সব বেদনাময় চিন্তা একেবারে দূর কর লরেলা। ভবিষ্যতে হয়তো তুমি শান্তি পাবে, সুখী হবে, তখন তুমি ভুলে যাবে অতীতের কথা।"

—"আমি কখনো ভুলব না।" লরেলা উত্তেজিত কণ্ঠে বলে ওঠে। "আপনি জেনে রাখুন পাদ্রী, এই কারণেই আমি অবিবাহিত থাকবার সঙ্কল্প করেছি। আমি কখনো পুরুষের হাতের ক্রীড়নক হ'য়ে তার হাতে এইরকম নিপীড়ন সহ্য করতে পারব না। এখন যদি কেউ আমাকে মারে বা চুম্বন করতে আসে, আমি তা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারি কিন্তু মা পারতেন না। তিনি বাবার মারও যেমন নীরবে সহ্য করতেন তেমনি তাঁর উন্মত্ত চুম্বনেরও প্রতিবাদ করতে পারতেন না। কারণ তিনি

আমার বাবাকে ভালোবাসতেন। কিন্তু এমন লোককে আমি কখনো ভালোবাসতে পারব না, যে আমাকে সংসার-জীবনে অত্যাচারে অত্যাচারে জর্জরিত ক'রে তুলবে।"

পাদ্রী তখন বল্লেন—"তুমি হাজার হ'লেও নেহাৎ ছেলেমানুষ লরেলা। তুমি নেহাৎ অনভিজ্ঞের মতই কথা বলছ। মনে হচ্ছে জীবন সম্পর্কে তোমার কোন ধারণাই নেই। সব লোকই কি তোমার বাবার মত? সব পুরুষই কি স্ত্রীর প্রতি অসদ্ব্যবহার করে, না তাদের খেয়ালখুশি মত যথেচ্ছ আচরণ ক'রে চলে? তুমি কি কখনো সৎ লোক দেখনি? অথবা, এমন স্ত্রীলোকও কি তোমার নজরে পড়েনি, যারা তাদের স্বামীর সঙ্গে সুখেশান্তিতে ঘরকন্না করছে?"

—"কিন্তু কেউ একথা জানে না মা'র কাছে বাবা কতখানি ছিলেন। তিনি মরে যাবেন সেও ভালো তবু কোনোদিন তাঁর বিরুদ্ধে একটি কথা বলেন নি, প্রতিবাদ করেন নি পর্যন্ত। এ সমস্তই সম্ভব হয়েছিল, মা তাঁকে ভালোবাসতেন বলে। এর নাম যদি ভালোবাসা হয়, যে ভালো-বাসা মানুষকে আত্মরক্ষার সুযোগ দেয় না, অন্যায়ের প্রতিবাদ করে না,— আমি সে ভালোবাসা চাই না, সে ভালোবাসা নারীর শত্রু। এইরকম ক'রে যদি মানুষকে ভালোবাসতে হয়, আমি তাহ'লে নাচার!"

—"আমি ব'লছি, তুমি এখনো ছেলেমানুষ। কি বলছ, তার মানে তুমি বোঝ না। তোমার পালা যখন আসবে, তখন তুমি তোমার প্রিয়জনকে ভালোবাসবে কি বাসবে না, সেজন্য কেউ তোমায় পরামর্শ দেবে না। তুমি নিজেই তা বুঝতে পারবে।" একটু থেমে পাদ্রী আবার বল্লেন—"আর সেই চিত্রকর, তুমি কি মনে কর, সে কখনো তোমার প্রতি নিষ্ঠুর হ'তে পারবে?"

—"আমি যে তার চোখেও সেই একই দৃষ্টি দেখেছি,—যে দৃষ্টি দেখে-

ছিলাম আমার বাবার চোখে, যখন তিনি মার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন, বাহুবন্ধনে তাঁকে আদর ক'রে সব ভোলাতে চাইতেন। এই চাহনীর অর্থ আমি বুঝি, এ দৃষ্টি আমি চিনি। এই শান্ত মধুর দৃষ্টির অধিকারী হ'য়েও, মানুষ তার স্ত্রীকে প্রহার করে, অথচ সে একটা কটূক্তিও করে না! ঐ রকম চাহনী দেখলেই আমার অন্তর আত্মা বিদ্রোহী হ'য়ে ওঠে।"

মেয়েটি আর কোনো কথা বল্‌লো না। পাদ্‌রী সাহেবও নির্বাক হয়ে ব'সে রইলেন। তিনি মেয়েটিকে আরও ভালোভাবে বোঝাতে চাইলেন, কিন্তু দেখলেন সেই তরুণ মাঝিটি এই সব কথাবার্তায় কেমন যেন একটু চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে। তিনি তাই আর কোনো কথা বল্‌লেন না, চুপ ক'রেই রইলেন।

ঘণ্টা দুই পরে তাঁরা কাপরী উপসাগরে গিয়ে পৌছুলেন। এ্যাণ্টোনিও পাদ্‌রীকে পাঁজাকোলা ক'রে, কাদাজল পার ক'রে শুকনো ডাঙায় নামিয়ে দিল। লরেলা কিন্তু তার সাহায্যে পার হবার আশায় ব'সে রইল না। সে এক হাতে তার পেটিকোট একটু তুলে আর কাঠের জুতো জোড়া নিয়ে, অন্য হাতে পুঁটুলীটা ধ'রে লম্বা লম্বা পা ফেলে কাদাজল পার হ'য়ে তীরে এসে পৌছুল।

পাদ্‌রী সাহেব বল্‌লেন—"আমাকে কিছুক্ষণ কাপ্‌রীতে থাকতে হবে। আমার জন্যে তোমার অপেক্ষা করবার দরকার নেই। কালকের আগে বোধহয় আমার আর ফেরা হবে না। বাড়ি গিয়ে তোমার মাকে ব'লো লরেলা, যে, আমি এক হপ্তার মধ্যেই তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রব! তুমি আজ সন্ধ্যার আগেই তো বাড়ি ফিরে যাবে?"

নিজের পোশাকের দিকে তাকিয়ে লরেলা জবাব দিল—"হাঁ, যদি সুযোগ পাই।"

নিতান্ত উদাসীন কণ্ঠে এ্যাণ্টোনিও ব'লে উঠলো—"আমাকে কিন্তু

আজই ফিরতে হবে। সন্ধ্যা পর্যন্ত আমি এখানে অপেক্ষা ক'রব। তুমি যদি না ফের, তবু আমাকে ফিরে যেতে হবে।"

পাদ্‌রী বল্‌লেন—"হাঁ মা, তোমাকে ফিরতেই হবে। সারারাত মাকে একলা ফেলে তোমার এখানে কাটানো চল্‌বে না। তুমি কি বেশি দূরে যাবে?"

—"আমি অ্যানা কাপ্‌রীর কাছেই একটা আঙ্‌রক্ষেতে যাব।"

—"আর আমি যাচ্ছি কাপরীতে। আচ্ছা, ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন, আমি তবে চলি।"

লরেলা তাঁর হাতে চুমো খেল। এক ফোঁটা অশ্রুও গড়িয়ে পড়লো তার চোখ থেকে। এ যেন বিদায়ের স্মৃতি চিহ্ন। এ্যাণ্টোনিও লরেলার দিকে না তাকিয়ে সোজা এগিয়ে গেল পাদ্‌রীসাহেবের কাছে। তারপর তার টুপি খুলে জানাল তাঁকে বিদায়-সম্মান। পাদ্‌রী ও লরেলা পিছন ফিরে এগিয়ে চল্‌ল। এ্যাণ্টোনিও তার প্রসারিত দৃষ্টি মেলে দেখল—পাদ্‌রীসাহেব চলেছেন ছোট ছোট পাথর কাঁকরের ওপর দিয়ে, আর লরেলা চলেছে অন্যদিকে। উঁচুতে উঠ্‌ছে সে। প্রখর সূর্যালোক থেকে চোখ দুটোকে বাঁচাবার জন্যে সে তার একটা হাত দিয়েছে কপালের ওপর। উঁচু পাহাড়ের যেখানটায় গিয়ে পথটা শেষ হয়েছে, লরেলা সেখানটায় পৌঁছে একটু দাঁড়ালো। সে যেন হাঁপিয়ে গেছে, তাই একটু দম নিচ্ছে। পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল একবার। তার পায়ের কাছে কত রঙ-বেরঙের ফুল রয়েছে ফুটে, কত গন্ধরাজ, কত গোলাপ। আর ঐ তো নীল সমুদ্র,—কি সুগম্ভীর, কি সুন্দর। সূর্যের আলোয় ক'রছে ঝল্‌মল্‌। এক মুহূর্ত তাকিয়ে দেখলেই বোঝা যায় সে দৃশ্য কি মনোরম। হঠাৎ লরেলার চোখ গিয়ে পড়লো এ্যাণ্টোনিওর নৌকোর উপর, সে দেখতে পেল এ্যাণ্টোনিও তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে এক দৃষ্টে। দুজনেই

দুজনকে দেখতে পেয়ে কেমন যেন একটু নড়ে উঠল। তারা যেন কি অন্যায় ক'রে ফেলেছে, এমনি ভাব। লরেলা একটু পরেই অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

সবেমাত্র দুপুর গড়িয়ে ঘণ্টাখানেক হয়েছে। এ্যান্টোনিও সেই দু'ঘণ্টা ধরে জেলেদের সরাইখানার সামনের একটা বেঞ্চিতে ব'সে বিশ্রাম করছিল। কিন্তু কিসের চিন্তা যেন তাকে চঞ্চল ক'রে তুলেছে মনে হলো। কারণ সে মাঝে মাঝে হঠাৎ রোদে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে আর ডাইনে-বাঁয়ে যতদূর দৃষ্টি যায়—পাহাড়তলীর পথের দিকে, যেখানটায় সেই দ্বীপের শহর দুটি আরম্ভ হয়েছে, তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কি যেন দেখছে। আকাশের ভাবগতিককে এ্যান্টোনিও কখনো বিশ্বাস করে না। তাই সরাইখানার কর্ত্রীকে ডেকে বললে—"দেখ, যদিও আকাশের অবস্থা এখন বেশ ভালোই, তবু সমুদ্রের জলে আকাশের যে ধূসর ছায়া পড়েছে, সেটা মোটেই ভালো নয়। ওর জন্যেই ভাবনা। তোমার মনে আছে তো সেবারকার ঝড়ের কথা, সেই যেবার এক ইংরেজ পরিবার প্রায় মারা যেতে বসেছিল। সেবারেও ঠিক এমনি দিনে ঝড় উঠেছিল। তাই না?"

—"না, আমার ঠিক মনে পড়ছে না।" দোকানের স্ত্রীলোকটি জবাব দিল।

—"আচ্ছা, যাক্ সে কথা। ধরো, সন্ধ্যার আগেই যদি আবহাওয়ার পরিবর্তন হয়, তাহ'লে লরেলা নিশ্চয়ই আমাকে মনে করবে? না?"

—"তোমার বুঝি অনেক ভালো ভালো যাত্রী রয়েছে শহরে?" স্ত্রীলোকটি কিছুক্ষণ পরে প্রশ্ন করে।

—"হ্যাঁ, এই তো সবে যাত্রী আনা নেওয়া চল্‌লো। সময়টা যা খারাপ পড়েছে এবার!"

—"এবার তো বসন্ত বেশ দেরিতেই এসেছে। তোমার আয় হচ্ছে কেমন? কাপরীতে আমরা যা উপায় করি, তার চেয়ে ভালো নিশ্চয়ই?"

—"না তেমন নয়। আমার যদি এই নৌকো ছাড়া আর কিছু না থাকতো তাহ'লে সপ্তাহে দুবারের বেশি ভালো খাবার জুটতো না। আরও কাজ করতে হয় আমাকে। যেমন ধরো মাঝে মাঝে নেপল্‌স্‌ পর্যন্ত একজনের চিঠি পৌঁছে দিয়ে আসতে হয়। অথবা, সমুদ্রে কোনো ভদ্রলোক নৌকো বাইবেন, কি মাছ ধরবেন—অমনি ডাক পড়লো আমার। তুমি তো জানোই, আমার এক বড়লোক খুড়ো রয়েছেন গ্রামে। তাঁর একাধিক সুন্দর কমলালেবুর বাগান আছে সেখানে। তিনি আমাকে ডেকে বলেন—'টোনিও, আমি যতদিন বেঁচে আছি, ততদিন তোমার কোনো ভাবনা নেই, আমি তোমাকে কষ্ট পেতে দেব না। আমি যখন আর থাকব না, তখন তোমার নামেই সব লিখে দিয়ে যাব।' তাই, ভগবানের আশীর্বাদে আমার কোনো অভাবই নেই।"

—"তোমার ধনী খুড়োটির ছেলেপুলে আছে তো?"

—"না। তিনি বিয়েই করেন নি। বেশির ভাগই তিনি বিদেশে কাটিয়েছেন। অনেক টাকাকড়িও জমিয়েছেন এতকাল ধরে। তিনি খুব বড় একটা মাছের-কারবার খুলবেন ঠিক করেছেন। আমাকেই তার সব কিছু দেখাশোনা করতে হবে এবার থেকে।" এ্যাণ্টোনিও জবাব দিল।

—"তাহ'লে তো তুমি ভাগ্যবান!"

তরুণ মাঝিটি তার ঘাড় ঝাঁকালো।—"প্রত্যেক লোকেরই একটা না একটা বোঝা রয়েছে!" এই বলেই সে আবার আকাশের অবস্থা লক্ষ্য করতে বেরিয়ে গেল। ডাইনে বাঁয়ে আবার সে কিছুক্ষণ পথের দিকে তাকিয়ে নিরাশ হ'য়ে ফিরে এলো।

—"তোমার জন্যে আর একটা বোতল আনি?"—সরাইখানার কর্ত্রী তাকে জিজ্ঞাসা করে। "তোমার খুড়ো থাকতে আর পয়সার জন্যে ভাবনা কি?"

—"এক গ্লাসের বেশি নয়। তোমাদের কাপ্রীর মদ বড় কড়া! আমার মাথা এমনিতেই গরম হ'য়ে আছে।"

—"না না, এ মদ রক্তকে তাতিয়ে তোলে না, যত ইচ্ছে খেয়ে যাও। ঐ যে আমার স্বামী আসছেন, তার সঙ্গে এবার তুমি গল্পগুজব করতে পারবে।"

সরাইখানার মালিক এসে পৌছুল। তার কাঁধে মাছের জাল, আর তার কোঁক্ড়ানো চুলের ওপর লাল টুপি। এক থালা মাছ সে নামিয়ে তার স্ত্রীকে দিলে পাদ্‌রী সাহেবের জন্য। তারপর তরুণ মাঝি, আমাদের সেই এ্যান্টোনিওর দিকে নজর পড়তেই, সে তাকে করমর্দন ক'রে অভি-নন্দিত করলো। তারপর তার পাশে বসে বক্‌বক্ করতে শুরু ক'রে দিল। একটু পরেই তার স্ত্রী এলো এ্যান্টোনিওর জন্যে দ্বিতীয় মদের বোতল নিয়ে। কাপরীর বিশুদ্ধ, খাঁটি মদ। ঠিক সেই সময় তারা বালুর ওপর কার যেন পায়ের শব্দ শুনতে পেল। বাঁ দিকের যে পথটা অ্যানাকাপ্রীর দিকে চলে গিয়েছে, সেই দিক থেকে লরেলাকে আসতে দেখা গেল। সে তাদের দিকে তাকিয়ে নমস্কারের ভঙ্গীতে মাথা নাড়তে লাগলো, তারপর একটু থেমে যেন ইতস্ততঃ বোধ করল।

এ্যান্টোনিও আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়।

সে বলে—"আমাকে যেতেই হবে। এটি সেই তরুণী সোরেন্টো-মেয়ে, সে আজ সকালেই পাদ্‌রী সাহেবের সঙ্গে এসেছে। রাত্রের আগেই তাকে তার রুগ্‌ণো মায়ের কাছে পৌছে দিতে হবে।"

—"আরে আরে, এখনই উঠছ কি, রাত্রির এখনো ঢের বাকী।" সরাইখানার সেই স্ত্রীলোকটির স্বামী ব'লে উঠে।—"আর এক পাত্র খেয়ে নেবার যথেষ্ট সময় আছে। ওগো! দাও আর এক গ্লাস দাও।"

—"ধন্যবাদ। আমার আর প্রয়োজন নেই।" লরেলা তখনও দূরে।

—"ওগো তুমি ঢাল না, গ্লাস দুটো ভর্তি ক'রে দাও। মেয়েটিকে একটু অনুরোধ করলেই চলবে।"

এ্যান্টোনিও জবাব দিল—"না। চল্‌বে না। ও বড় জেদী মেয়ে। সে যা করতে চাইবে না, স্বয়ং সাধুবাবা এলেও তা করাতে পারবে না।" তৎক্ষণাৎ সে ছুটে নৌকোর কাছে গেল। তারপর নোঙর তুলে লরেলার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো। লরেলা আবার সরাইখানার সেই স্ত্রীলোকটির দিকে ঘাড় নেড়ে, ধীবে ধীরে জলের দিকে এগিয়ে গেল। সে চারিদিকে একবার ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখল, আর কোনো যাত্রী আসে কিনা। না কেউ নেই। সমুদ্রতীর খাঁ খাঁ করছে। জেলেরা কেউ কেউ ঘুমোচ্ছে, কেউ কেউ আবার জাল নিয়ে সমুদ্রের তীরে তীরে ডিঙ্গি বেয়ে চলেছে। একদল মেয়েছেলে ছেলেপুলে নিয়ে তাদের ঘরের দরজায় ব'সে ব'সে সুতো কাটছে, কেউ বা আবার ঘুমোচ্ছে। যে সব লোক ওবেলা এসেছে, তারা এখন বিকেলের জন্য অপেক্ষা করছে, তখন ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় যেতে পারবে। বেশিক্ষণ সে আর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে পারলো না। নিজেকে সামলাবার আগেই এ্যান্টোনিও এসে তাকে কোলে ক'রে নৌকোয় নিয়ে ওঠালো। এ্যান্টোনিওর কাছে সে যেন একটা শিশু। এ্যান্টোনিও তারপর লাফ দিয়ে নৌকোয় উঠেই লগি দিয়ে বার দুই ঠেলতেই তারা গভীর জলে গিয়ে পড়লো। নৌকো চল্‌লো ভেসে।

নৌকোর একটা কোণে লরেলা এ্যান্টোনিওর দিকে পিঠ দিয়ে এমন ভাবে আড় হ'য়ে বসেছিল, যাতে ক'রে সে কেবল তার একটা পাশই দেখতে পেল। তার দৃষ্টি আগের চেয়ে আরও উগ্র। তার ছোট্ট ভুরুর ওপর চুলের ছায়া এসে পড়েছে। ঠোঁটদুটি তার দৃঢ়বদ্ধ। কেবল তার পাতলা নাকটি মাঝে মাঝে ফুলে উঠছিল। কিছুদূর তারা নীরবে যাবার

পর,—লরেলা প্রখর সূর্যের তাপ অনুভব করলো। তারপর পুঁটুলি খুলে সে তার রুমালটা বের ক'রে তা দিয়ে মাথা ঢাকলো। রুটিটা বের ক'রে তারপর সে তার দ্বিপ্রাহরিক আহার সুরু ক'রে দিল। কাপ্রীতে তার কিছু খাওয়াই হয়নি।

এ দৃশ্য এ্যাণ্টোনিও বেশিক্ষণ দেখতে পারলো না। কমলালেবুর ঝুড়ি থেকে সে দুটো লেবু বের ক'রে লরেলাকে উদ্দেশ ক'রে বল্‌ল—"রুটির সঙ্গে এই লেবু দুটি তুমি খাও লরেলা। তুমি মনে করো না যেন আমি ও দুটো তোমার জন্মেই বেছে রেখে দিয়েছিলাম। সকাল বেলায় যখন কমলালেবু বিক্রী ক'রে ঝুড়িগুলো নৌকোয় নিয়ে এলাম, তখন এ দুটো তার মধ্য থেকেই বেরিয়ে এলো।"

—"তুমিই খাও ওদুটো। রুটিতেই আমার পেট ভ'রে যাবে।"

—"এই তপ্ত রোদে তুমি এতটা পথ হেঁটে এলে, তোমার ঠাণ্ডা হ্‌ওয়ার দরকার লরেলা!"

—"তারা আমায় সেখানে এক গ্লাস জল দিয়েছিল, তাতেই আমি ঠাণ্ডা হয়েছি।"

—"বেশ, তোমার যা খুশি তাই কর।" এই ব'লে এ্যাণ্টোনিও কমলালেবু দুটিকে ঝুড়ির মধ্যে ফেলে দিল।

আবার সবাই কিছুক্ষণ চুপচাপ।

সমুদ্রের জল কাঁচের মত স্বচ্ছ। গলুইএর কাছেও জলের কোনো শব্দ নেই। এমন কি যেসব সামুদ্রিক শ্বেত-পাখী কাপরীর পর্বত-গুহায় বাস করে, তারাও নিঃশব্দ পক্ষবিস্তারে তাদের শীকার খুঁজে ফিরছে।

টোনিও একটু পরে আবার বল্‌ল—"তুমি না হয় তোমার মার জন্যই কমলা দুটো নিয়ে যাও।"

—"বাড়িতে আমাদের কমলা আছে। ফুরিয়ে গেলে কিনেই আনতে পারব।"

—"না না, লেবু ছুটো তুমি তাঁকে দিয়ে আমার নমস্কার জানিয়ো।"

—"তিনি তো তোমাকে চেনেন না।"

—"তুমি তো তাঁকে বল্‌তে পার আমি কে।"

—"আমিও তো তোমাকে চিনি না।"

এ্যাণ্টোনিওকে এভাবে অনেকবার লরেলা আঘাত দিয়েছে। এইবারই প্রথম নয়। এ্যাণ্টোনিওর মনে পড়ল গত বছরের একটি রবিবার। সেই চিত্রকরটি সেদিন সোরেণ্টোতে প্রথম আসে। বড় রাস্তার ধারে এ্যাণ্টো-নিও তখন তার সমবয়স্ক তরুণদের সঙ্গে বল খেলায় মত্ত। লরেলা তখন মাথায় কলসী নিয়ে যাচ্ছে। সেই প্রথম চিত্রকর তাকে দেখে। লরেলা কিন্তু তাকে লক্ষ্যই করেনি। লরেলাকে দেখে নীপোলিটান একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল তার দিকে। তার মনেই ছিল না সে এ্যাণ্টোনিওদের খেলার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। 'রাস্তাটা ধ্যান করবার জায়গা নয়'—একথা তাকে মনে করিয়ে দেবার জন্যেই যেন একটা বল এসে অতর্কিতে তার গায়ে পড়লো। সে কি বলবার জন্যে যেন ঘুরে দাঁড়ালো। কিন্তু বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে এ্যাণ্টোনিও যেভাবে নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছিল, সেই মূর্তি দেখে সে সেখান থেকে স'রে পড়লো। এ্যাণ্টোনিওই তাকে বল ছুঁড়ে মেরেছিল। পাছে আরও হৈ চৈ তর্কাতর্কি বেধে যায়, সেই ভয়েই চিত্রকর সেখান থেকে সরে পড়ে। এই ঘটনার পর যখন চিত্রকরটি লরেলার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করে, লরেলা তখন তাকে প্রত্যাখ্যান করে। নীপোলিটান তাকে তখন বলেছিল—"তুমি তাহ'লে সেই অসভ্য ছোকরাটিকে ভালো-বাস, তাই আমাকে প্রত্যাখ্যান করলে!" লরেলা তখন জবাব দিয়েছিল —"আমি তাকে মোটেই চিনি না।" কিন্তু সে কথা সত্য নয়। আজকের

দিন ছাড়া বহুবারই এ্যাণ্টোনিওর সঙ্গে তার দেখা হয়েছে। তাকে সে ভালো করেই জানে।

আর এখন তারা এমন ভাবে নৌকোয় ব'সে রয়েছে, যেন তারা তাদের পরস্পরের বড় শত্রু। এ্যাণ্টোনিওর ঐ সুন্দর মুখখানি সূর্যের তাপে লাল হ'য়ে উঠেছিল। সে এমন জোরে দাঁড় বাইতে লাগলো, যাতে ক'রে লরেলা যে জায়গায় বসেছিল, সেখানে সমুদ্রের ফেনা উছলে পড়তে লাগলো। এ্যাণ্টোনিও যেন বিড়্‌বিড়্ ক'রে কি ব'কে গেল আপন মনেই। লরেলা এমন ভাব দেখালো যেন সে তা লক্ষ্যই করেনি। শূন্য দৃষ্টি মেলে সে চেয়ে রইলো নৌকোর অপর প্রান্তে। জলে হাত ডুবিয়ে সে ব'সে রইলো। তার আঙুলের ফাঁক দিয়ে ঠাণ্ডা জল গলে যাচ্ছে। সে তার রুমালটা খুলে নিয়ে মাথার চুলগুলো ঠিক করতে লাগলো। এমন ভাবে যেন সে একলাই রয়েছে নৌকোতে, আর কেউ নেই। তার চোখের পাতা নাচতে থাকে। সে তখন তার ভিজে হাতখানা জল থেকে তুলে নিয়ে গরম গালদুটিতে চেপে ধরে। কিন্তু তাতে আর কতটুকুই বা ঠাণ্ডা হয়!

এখন তারা উন্মুক্ত সমুদ্রে বহুদূরে গিয়ে পড়েছে। দ্বীপটি রয়েছে অনেক পেছনে পড়ে, আর সামনের ডাঙাও রয়েছে অনেক দূরে। ধারে কাছে আর কোনো নৌকোও চোখে পড়ে না। এমন কি সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে কোনো সামুদ্রিক পাখীরও দেখা নেই। এ্যাণ্টোনিও বেশ ক'রে একবার চারদিক দেখে নিল। সে যেন রেগে গিয়ে কি করতে যাচ্ছে। তার মুখের চেহারা বদলে যায়, দাঁড় বাওয়া সে থামিয়ে দেয়। লরেলা অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকিয়ে দেখে, ভয় পায় না কিন্তু সচেতন হয়।

এ্যাণ্টোনিও ঝাঁঝের সঙ্গে ব'লে ওঠে—"আজ আমি এর একটা হেস্ত-নেস্ত করবই। অনেকদিন আগেই করা উচিত ছিল। আমি ভেবে অবাক হই, কেন তা করিনি। আমাকে তুমি চেন না, না? অথচ আমি

এতকাল তোমার কাছে পাগলের মত ঘুরে বেড়িয়েছি। তোমাকে আমি যতবারই আমার সমস্ত কথা বলতে গেছি, ততবারই তুমি আমাকে অবজ্ঞা করেছ, আঘাত করেছ, মুখ ফিরিয়ে নিয়েছ।"

লরেলা স্পষ্ট নির্ভীক কণ্ঠে উত্তর দেয়—"তোমাকে আমার কি বলবার আছে? আমি লক্ষ্য করেছি তুমি আমার সঙ্গে মিশতে চাও; কিন্তু তার ফলে আমি কি লোকের গঞ্জনা সহ্য করব? আমি তোমাকে স্বামী হিসেবে পেতে চাই না—তোমাকে না, কাউকেই না।"

—"উঃ কাউকেই না।" ব্যঙ্গ করে এ্যাণ্টোনিও।—"এমন কথা মুখে সবাই বলে! চিত্রকরটিকে আর পাবে না বলেই না তুমি একথা এখন বল্‌ছ? কিন্তু তুমি যে এখনো ছেলেমানুষ। কিছুদিন পরেই নিজের নিঃসঙ্গতা বুঝতে পারবে। তুমি যে ধরনের মেয়ে, তখন হাতের কাছে ভালো যাকেই পাবে তাকেই গ্রহণ করবে।"

—"কে জানে? কে বলতে পারে ভবিষ্যতে কি হবে, কি হবে না? হয় তো আমার মনেরও পরিবর্তন ঘটতে পারে। কিন্তু তাতে তোমার কি?"

—"তাতে আমার কি?" এ্যাণ্টোনিও গর্জন ক'রে একেবারে লাফিয়ে উঠ্‌লো। তার ফলে ছোট্ট নৌকোটি দুলতে লাগলো এদিক্ ওদিক্। সে ব'লে চল্‌ল—"তুমি বল্‌ছ তাতে আমার কি? তুমি তো জান সবই। অথচ এই কথা তুমি বল্‌ছ। তোমার মত একগুঁয়ে নিষ্ঠুর মেয়ের মুখে এর চেয়ে আর কি বের হবে?"

লরেলা বলে—"তোমাকে আমি কি কোনো প্রতিশ্রুতি দিয়েছি? তুমি যদি নিজের খেয়ালে মত্ত হ'য়ে ওঠো, সে কি আমার অপরাধ? আমার ওপরে তোমার কোনো অধিকারই নেই।"

—"জানি! সে কথা ভালো করেই জানি।" অসহিষ্ণু কণ্ঠে জবাব

দেয় এ্যাণ্টোনিও।—"আমার কোনো অধিকারই নেই। হাঁ, শীলমোহর করা, হাকিমের সই করা দলিলে এ অধিকার লেখা নেই। কিন্তু আমি অনুভব করি, আমি বুঝতে পারি এ আমারই অধিকার; ঈশ্বরের নামে শপথ ক'রে আমি বলতে পারি, সৎ খ্রীষ্টান হিসেবে মৃত্যুর পর যেমন আমার স্বর্গে যাবার অধিকার আছে, তেমনি অধিকার আছে তোমার উপর। তুমি কি ভাব, তুমি গীর্জায় অন্য পুরুষের সঙ্গে যাবে, আর আমি তাই দাঁড়িয়ে দেখব? অন্য মেয়েরা আমায় দেখে উপহাস করবে আমি তাই সহ্য করব?"

—"তোমার যা খুশি, তুমি তাই করতে পার। তবে জেনে রাখ, তোমার ঐ ভয় দেখানোতে কোন ফল হবে না, আমি মোটেই ভয় পাইনা। আমিও আমার খুশি মত, আমার ইচ্ছানুসারেই কাজ করি।"

—"ভয় কর কি কর না, তা এখনি বোঝা যাবে।" কথা বল্‌তে বল্‌তে উত্তেজনায় তার সমস্ত শরীর কেঁপে ওঠে।—"তোমার মত জেদী মেয়ে আমার সমস্ত জীবন নষ্ট ক'রে দেবে, এ আমি হ'তে দেব না। মনে রেখো, এখানে তুমি আমার অধিকারেই; যা বলব তাই তোমাকে এখন করতে হবে।"

লরেলা ধীর কণ্ঠে জবাব দিল—"সাহস থাকে তো, আমায় তুমি মেরে ফেলতে পার।"

এ্যাণ্টোনিওর কণ্ঠস্বর বাষ্পাকুল হয়ে ওঠে। সে কর্কশ কণ্ঠে ব'লে ওঠে—"শুধু তুমিই মরবে না, আমাকেও মরতে হবে। সমুদ্রে আমাদের দু'জনেরই জায়গা হবে। আমি আর সহ্য করতে পারছি না লরেলা—।" শেষের কথাগুলি সে যেন স্বপ্নালু কণ্ঠে ব'লে গেল।—"দুজনকেই আমাদের যেতে হবে—দু'জনকেই; হাঁ এক্ষুনি, এই মুহূর্তে!" সে চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো। পরক্ষণেই লরেলাকে জোর ক'রে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধর্‌ল।

কিন্তু সেই মুহূর্তেই সে তার ডান হাত ছাড়িয়ে নিল পেছন থেকে। রক্ত পড়ছিল সেই হাত থেকে। লরেলা তাকে সজোরে কাম্‌ড়ে দিয়েছে।

—"কি, আমাকে না তোমার সকল আদেশ পালন করতে হবে?" লরেলা চীৎকার ক'রে বলে। এক ধাক্কা দিয়ে সে তখন এ্যাণ্টোনিওকে সরিয়ে দেয়।—"আমি না তোমার অধিকারে? এই দেখ।" এই বলেই সে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে ডুবে যায়।

একটু পরেই আবার সে ভেসে ওঠে। তার ছোট ফ্রকটি তার সর্বাঙ্গ যেন জড়িয়ে ধরেছে। তার লম্বা চুল খুলে গেছে তরঙ্গের আঘাতে, জড়িয়ে গেছে তার গলায়। কোনো কথা না ব'লে সে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ে, তারপর নৌকো থেকে সোজা ডাঙার দিকে সাঁতার কাটতে আরম্ভ করে।

এ্যাণ্টোনিও আকস্মিক ভীতিতে বিহ্বল হ'য়ে পড়লো। একদৃষ্টে, নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে সে দেখতে লাগলো লরেলাকে। সে যেন এক পরম অভাবনীয় ঘটনা প্রত্যক্ষ করছে। পরমুহূর্তেই সে নিজেকে ঠিক ক'রে নিয়ে, লরেলার পিছু পিছু নৌকোর দাঁড় টেনে চল্‌লো প্রাণপণ শক্তিতে। তার হাত থেকে তখনও অবিরল রক্তধারা প্রবাহিত হ'য়ে নৌকোর নিচেকার জল রাঙিয়ে তুলছিল।

দ্রুতগতিতে লরেলা সাঁতার কাটলেও, এ্যাণ্টোনিও কিছুক্ষণ পরেই তার পাশে গিয়ে নৌকো নিয়ে হাজির হ'লো। সে চীৎকার ক'রে বল্‌লো —"ঈশ্বরের দোহাই লরেলা, নৌকোয় উঠে এসো। আমি পাগল হ'য়ে গিয়েছিলাম। ভগবানই জানেন, কেন হঠাৎ আমার মস্তিষ্ক অমন উন্মত্ত হ'য়ে উঠ্‌লো; কিসে আমার বুদ্ধি বিবেচনা সব লোপ পেয়ে গেল, তা একমাত্র তিনিই বলতে পারেন। এই উন্মত্ততা যেন এলো বিদ্যুৎ ঝলকের মতো, মুহূর্তের জন্য আমার মনে আগুন জলে উঠ্‌লো। হিতাহিত

জ্ঞানশূন্য হ'য়ে আমি না জানি কত কি বলেছি। আমি তোমাকে ক্ষমা করবার জন্যও অনুরোধ করব না, শুধু তুমি নৌকোয় উঠে এসো, নিজের জীবনকে অমন ক'রে বিপন্ন করো না।"

লরেলা যেন কিছু শুনতে পায়নি, এমনিভাবে সাঁতার কেটে চল্‌লো।

এ্যাণ্টোনিও আবার বল্‌ল—"আমি আবার বলছি, ওভাবে তুমি সাঁতার কেটে ডাঙ্গায় পৌছুতে পারবে না। এখনো দু'মাইল বাকী। মায়ের কথা ভেবে দেখ একবার। লরেলা, যদি তুমি নিজের জীবন বিপন্ন কর, আমিও তাহ'লে আত্মহত্যা করব।"

লরেলা চোখ মেলে একবার দূরত্বটা দেখে নিল। তারপর এ্যাণ্টো-নিওর কথার কোনো জবাব না দিয়ে, নৌকোর কাছে সাঁতার দিয়ে এলো। নৌকোর উপরে হাত রাখতেই এ্যাণ্টোনিও তাকে সাহায্য করতে গেল, তুলে আনবার জন্যে। মেয়েটির ভারে নৌকোটি একদিকে কাৎ হতেই, এ্যাণ্টোনিওর কোটটি গেল জলে পড়ে। লরেলা যে ধাঁচের একরোখা মেয়ে, তাতে ক'রে সে বিনা সাহায্যেই নৌকোয় উঠে পড়ে নিজের পুরোনো জায়গায় গিয়ে বস্‌লো। এ্যাণ্টোনিও যখন দেখল লরেলা বেশ ঠিক হ'য়ে বসেছে, তখন সে আবার তার দাঁড় তুলে নিল। লরেলা তখন তার ভিজে পোশাকের জল নিঙ্‌ড়োচ্ছে আর চুল থেকে জল ফেলছে মাথায় ঝাঁকুনি দিয়ে। নৌকোর তলদেশে চোখ পড়তেই লরেলা দেখল রক্ত। সে তৎক্ষণাৎ এ্যাণ্টোনিওর হাতের দিকে দৃষ্টি মেলে দিল। সে হাত তখন দাঁড় টানছে, যেন কিছুই হয়নি সে হাতে!

লরেলা তার রুমালখানা বাড়িয়ে দিয়ে বলল—"এটা নাও।"

এ্যাণ্টোনিও মাথা নেড়ে অসম্মতি জানালো। দাঁড় বাইতে লাগলো আগের মত। একটু পরে লরেলা উঠে গিয়ে তার ক্ষত স্থানটা রুমাল দিয়ে বেশ শক্ত ক'রে বেঁধে দিল। ক্ষতটা হয়েও ছিল বেশ গভীর।

তারপর তাকে বাধা দেবার আগেই লরেলা একখানা দাঁড় নিল তুলে, বাইতে লাগলো এ্যান্টোনিওর উল্টো দিকে বসে। তালে তালে ঠিক বেয়ে চল্‌ল সে। এ্যান্টোনিওর দিকে না তাকিয়ে সে চেয়ে রইলো দাঁড়ের দিকে, সেখানা তারই রক্তে তখন রঙীন। দুজনেই বিবর্ণ মলিন, দুজনেই নির্বাক। ডাঙ্গার কাছে পৌঁছুতেই জেলেরা এ্যান্টোনিওর নাম ধরে ডাকতে লাগলো, আর নানারকম ইঙ্গিতপূর্ণ কথা বল্‌তে লাগলো লরেলার দিকে চেয়ে। কিন্তু চোখের পলক কেউ ফেল্‌ল না, একটা কথাও বল্‌ল না তারা।

তারা যখন ডাঙ্গায় পৌঁছুল, পাহাড়ের উপরে তখনও সূর্যের আলো দেখা যাচ্ছে। লরেলার পেটিকোট ততক্ষণে প্রায় শুকিয়ে গেছে, সে সেটাকে একটু ঝেড়েঝুড়ে তীরে লাফিয়ে পড়লো। সেই সুতো কাটা বুড়ী, সকালে যে তাদের যাত্রা করতে দেখেছিল, সে তখনও সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে। সে চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো—"টোনিও তোর হাতে কি হয়েছে? হা ভগবান! নৌকো যে রক্তে একেবারে ভেসে গিয়েছে!"

—"তেমন কিছু নয়!" জবাব দেয় এ্যান্টোনিও।—"নৌকোর পেরেক লেগে হাতটা একটু ছ'ড়ে গেছে। কালই সেরে যাবে। আমার রক্তই অমনি, একটু কিছু হয়েছে কি না হয়েছে, একেবারে ভেসে একাকার!"

—"দাঁড়া, আমি আসছি! একটু অপেক্ষা কর্। আমি ওষুধ গাছের পাতা নিয়ে এসে হাতটা বেঁধে দিচ্ছি।' বুড়ী ব'লে ওঠে।

—"না না, দিদিমা, তোমাকে আর কষ্ট ক'রতে হবে না। হাত তো বাঁধাই আছে। কাল সকালে দেখো, কোনো চিহ্নই নেই আর। আমার শরীর অত ঠুন্‌কো নয় যে, তাড়াতাড়ি সারবে না!"

পাহাড়ের উপরে যে পথটা চ'লে গিয়েছে, সেই পথে পা বাড়িয়ে লরেলা ব'লে উঠ্‌লো—"আমি এবার চল্লাম।" তার দিকে না তাকিয়েই

এ্যান্টোনিও জবাব দিলো—"আচ্ছা এসো।" তারপর নৌকো থেকে দাঁড় আর ফলের ঝুড়িগুলি নিয়ে সে কয়েক ধাপ উপরে উঠে গেল। সামনেই তার নিজের ছোট্ট কুঁড়েঘর।

ছোট ছোট তুটি কুঠুরী। সেখানে সে একা। জানালার গরাদ নেই। সেই ফাঁক দিয়ে সমুদ্রের ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে থাকে। কাঠের তুটো পাল্লা আছে, তাই দিয়েই জানালা বন্ধ করা যায়। একলা একলা তার এখন ভালোই লাগছিল, কতকটা স্বস্তিও অনুভব করছিল সে। মেরীর ছোট্ট মূর্তিটির কাছে গিয়ে সে হাঁটু গেড়ে বস্‌লো। মূর্তিটির মাথার চারপাশে রূপোলী-কাগজের কাটা তারার সারিতে যেন তাকে আরও সুন্দর দেখাচ্ছিল। এ্যান্টোনিও একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে সেই দিকে। কিন্তু কোনো প্রার্থনা জানায় না। প্রার্থনা করবার কি কারণ থাকতে পারে। এখন তো সে তার সমস্ত আশাই জলাঞ্জলি দিয়ে ব'সেছে।

চিরদিনের জন্যে এই কি তার শেষ দিন? রাত্রে সে খুব তুর্বল হ'য়ে পড়লো। অসম্ভব রক্ত পড়ায় সে যেন হারিয়ে যেতে বসেছে! হাতে খুব যন্ত্রণা হ'লো তার। ছোট একটা টুলের ওপরে ব'সে, ক্ষতস্থান থেকে সে রুমালটা খুলে নিল। এতক্ষণ যে-রক্ত বন্ধ অবস্থায় ছিল, আবার তা বেরিয়ে এল, অসম্ভব রকম ফুলে উঠ্‌লো তার হাতখানি।

ঠাণ্ডা জলে সে বেশ ক'রে ধুয়ে ফেল্‌ল রক্তধারা। তারপর সে স্পষ্টই দেখতে পেল লরেলার দাঁতের চিহ্নগুলি।

আপন মনেই সে ব'লে উঠ্‌লো—"সে ঠিকই করেছে। আমার মত পশুর এই হ'লো উপযুক্ত শাস্তি। জিসেপ্পীকে দিয়ে কালকেই তার রুমাল-খানা ফেরৎ পাঠাতে হবে। সে আর আমার মুখও দেখবে না কখনো।" তারপর সে সযত্নে রুমালখানা কেচে দিয়ে মেলে দিল শুকোবার জন্যে।

তারপর কোন রকমে দাঁত আর বাঁ হাত দিয়ে অন্য কাপড়ের সাহায্যে

সে ক্ষতস্থানটা বেঁধে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লো। দু'চোখ বুজে এলো তার।

কিছুক্ষণ পরেই তার ঘুম গেল ভেঙে। উজ্জ্বল চন্দ্রকিরণ তার গায়ে এসে লাগতেই কেমন যেন একটা মৃদুস্পর্শে তার চোখ খুলে গেল। তাছাড়া তার হাতের যন্ত্রণাও হচ্ছিল বেশ। বেদনা কমাবার জন্যে সে যেই ঠাণ্ডা জলে আবার তার ক্ষতস্থানটা ধুতে যাবে, ঠিক সেই মুহূর্তে দোর গোড়ায় কার যেন পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। সে তাকিয়ে দেখ্‌ল লরেলা তার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে।

নিঃশব্দে সে ঘরে এসে ঢুক্‌লো। মাথায় বাঁধা রুমালখানা খুলে ফেল্‌ল এক টানে। তারপর তার ছোট্ট ঝুড়িটা টেবিলের উপর রেখে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ ক'রলো।

এ্যান্টোনিও বল্‌ল—"রুমালখানা নিতে এসেছ বোধ হয়? তার জন্যে আর কষ্ট ক'রে আস্‌তে গেলে কেন? সকালেই জীসেপ্পীকে দিয়ে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিতাম।"

লরেলা তাড়াতাড়ি ব'লে উঠ্‌ল—"না রুমালের জন্য নয়। আমি তোমার রক্ত বন্ধ করবার জন্যে ওষুধ আনতে গিয়েছিলাম পাহাড়ে। এই দেখ।" এই ব'লে সে তার ঝুড়ির ঢাক্‌নাটা খুলে ফেল্‌ল।

এ্যান্টোনিও বেশ সহজ সুরেই জবাব দিল—"কেন মিছে অত কষ্ট ক'রতে গেলে। আমি অনেক সুস্থ বোধ ক'রছি। যদি ধরো কিছু বিপদই হয়, তার জন্যে খেদ নেই, সেই তো আমার প্রাপ্য। এমন সময় তুমি এলে কেন? এত রাত্রে একলা? যদি কেউ তোমাকে দেখে ফেলে? তা হ'লে তারা কত কি-ই না বলবে, সে কথা তো তুমি জানই, তবু কেন এলে?"

আকুল কণ্ঠে লরেলা ব'লে ওঠে—"আমি লোকের কথা গ্রাহ্যই করি

না। আমি তোমার হাতে ওষুধ দিতে এসেছি। এক হাতে তুমি কি ক'রে দেবে ?"

—"আমি ব'লছি, এসবের আর কোনো প্রয়োজন নেই।"

—"আমাকে যতক্ষণ না দেখাচ্ছ, ততক্ষণ তোমাকে বিশ্বাস নেই।"

সে তার হাতখানা টেনে নেয়। এ্যাণ্টোনিও তাকে কোনো বাধা দিতে পারে না। লরেলা নেকড়াটা খুলে ফেলে। হাতের অবস্থা দেখে সে ভয় পায়, আর্তনাদ ক'রে ওঠে—"হায় ভগবান!"

—"একটু ফুলেছে মাত্র।" এ্যাণ্টোনিও বলে।—"চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই দেখো একেবারে সেরে যাবে।"

লরেলা মাথা নেড়ে জবাব দিল—"না। এক হপ্তার আগে কিছুতেই তোমার এ হাত ভালো হবে না।"

—"না, না, একদিন দু'দিন হ'তে পারে, তার বেশি নয়। আর হ'লোই বা, তাতেই বা কি এসে গেল ?"

লরেলা তখন এক গামলা জল এনে, সযত্নে তার ক্ষতস্থান ধুয়ে দেয়। যন্ত্রণায় বেচারা একেবারে শিশুর মত ছট্‌ফট্ ক'রতে থাকে। তারপর সে ওষুধ বেটে লাগিয়ে দেয় যথাস্থানে। একটু পরেই জ্বালা কম্‌তে থাকে। তখন সে তার সঙ্গে-আনা নেক্‌ড়া দিয়ে বেশ ক'রে বেঁধে দেয় ক্ষতস্থানটি।

এ সব শেষ হ'লে এ্যাণ্টোনিও বলে—"তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। একটা কথা। তুমি যদি আমাকে অনুগ্রহই করতে চাও, তাহ'লে আমার সেই উন্মত্ততা ক্ষমা ক'রো; আমি যা করেছি আর বলেছি সব তুমি ভুলে যেও। জানি না, কোথা দিয়ে কি হ'য়ে গেল! যাই হোক, তোমার কোনো দোষ নেই, তুমি নির্দোষ। আর কখনো আমি তোমায় বিরক্ত ক'রব না।…"

লরেলা তাকে বাধা দিয়ে ব'লে ওঠে—"না না, তুমিই আমাকে ক্ষমা কর টোনিও! আমার অন্যভাবে তোমাকে বোঝানো উচিত ছিল। আমি যদি না তোমায় রূঢ় কথা ব'লে রাগাতাম, তাহ'লে তুমিও ক্ষিপ্ত হ'তে না। অনুশোচনায় আমি এখন জ্ব'লে পুড়ে মরছি—"

—"কিন্তু তুমি তো কোনো অন্যায়ই করনি, আত্মরক্ষা করেছিলে মাত্র। আমিই জ্ঞান হারিয়েছিলাম। আমার জ্ঞান ফিরে আসতে অনেক সময় লেগেছিল। ক্ষমার কথা ব'লো না লরেলা। তুমি আমার উপকারই করেছ। আর সে-উপকারের জন্য আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। তোমায় ধন্যবাদ জানাচ্ছি লরেলা। তোমার রুমালখানা এবার তুমি ফিরিয়ে নাও।

এ্যান্টোনিও রুমালখানা হাত বাড়িয়ে দিতে যায়। লরেলা কিন্তু ইতস্ততঃ করে। কি যেন তার অন্তরের মধ্যে তোলপাড় করছে। কি যেন সে বলতে পারছে না। অন্তর্দ্বন্দ্বে লরেলা কাতর। অবশেষে সে বলে—"আমার দোষেই তুমি তোমার কোটটা হারালে। আমি জানি কমলা লেবু বিক্রী ক'রে আজ যা পেয়েছিলে সবই তার মধ্যে ছিল। আমি আগে সেটা ভাবিই নি। কি ক'রে তোমার ক্ষতিপূরণ করব ভেবে পাচ্ছি না। আমার কাছে তো অত টাকা নেই, যাও বা আছে তা আমার মায়ের। কিন্তু একটি জিনিস আমার কাছে আছে—সেটি আমার এই রুপোর ক্রশ। শেষবারের মতো যখন চিত্রকরটি এসেছিল, তখন সে এটি আমার টেবিলের উপরে রেখে যায়। কোনোদিনই ওটার প্রতি আমার নজর ছিল না, আর বাক্সেও তুলে রাখিনি কখনো। তুমি এটা বিক্রী ক'রে দেবে? মা বলেন, এটা বিক্রী করলে নাকি গোটা কুড়ি টাকা পাওয়া যেতে পারে। তুমি যে টাকা হারিয়েছ, আশা করি ওতেই তা পূরণ হ'তে পারে। আর যদি না হয়, তাহ'লে বাকী টাকাটা আমি সুতো

ধুনে উপায় ক'রে তোমায় দেব। মা যখন রাত্রে ঘুমোবেন, সেই সময় রাত জেগে আমি স্থতো কাটব, তোমার টাকা শোধ করবার জন্যে।"

লরেলা পকেট থেকে নতুন চক্‌চকে ক্রশ্‌টা বের ক'রে দিতে চায়। কিন্তু এ্যাণ্টোনিও সরিয়ে দেয় তা। সংক্ষেপে বলে—"ও আমি কিছুতেই নিতে পারব না।"

—"তোমাকে নিতেই হবে। তুমি তো বলতে পার না, কতদিনে তোমার হাত সেরে উঠ্‌বে। এই রইলো। ফিরিয়ে দিলে আমার কষ্টের সীমা থাকবে না।" লরেলা জবাব দেয়।

—"সমুদ্রের জলে তুমি ওটাকে ফেলে দাও!"

—"এটা তোমাকে পুরস্কার দিচ্ছি না টোনিও—যা তোমার প্রাপ্য তার চেয়ে এর মূল্য যে অনেক কম, অনেক কম।"

—"তোমার কাছে কিছুই তো আমার প্রাপ্য নেই। এর পরেও যদি আমাদের কখনো দেখা হয়, তাহ'লে দয়া ক'রে তুমি আমার পথে এসো না। আমি তাহ'লে ভাবতে পারব, আমার কৃতকর্মের কথা তুমি চিন্তা করছ। এখন এসো তুমি। এই হোক আমাদের শেষ কথা। শুভেচ্ছা জেনো।" -

লরেলা রুমালখানা তুলে নেয়। ক্রশটাও। তারপর দুটোকেই রেখে দেয় ঝুড়ির মধ্যে ঢাকনা বন্ধ ক'রে। কিন্তু মুখ তুলে তার দিকে তাকাতেই এ্যাণ্টোনিও চম্‌কে ওঠে, লরেলার চোখ দিয়ে দরদর ক'রে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ছে। নিজের কান্না গোপন ক'রতে সে মুখ ফেরায় অন্য দিকে।

এ্যাণ্টোনিও চীৎকার ক'রে বলে—"ভগবানের দোহাই। কি হয়েছে বল। তোমার কি অসুখ করেছে? সর্বাঙ্গ যে কাঁপ্‌ছে তোমার!"

লরেলা বলে—"ও কিছু না।······এবার আমি চলি। আমাকে

এবার বাড়ি যেতেই হবে।" ক্লান্ত পদভারে সে এগিয়ে যায় দরজার দিকে। দেওয়ালে মাথা রেখে সে দাঁড়িয়ে পড়ে সহসা। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে সেখানে। এ্যান্টোনিও ছুটে যায় তার কাছে। হঠাৎ লরেলা ঘুরে দাঁড়ায়। এ্যান্টোনিওর বুকে সে লুটিয়ে পড়ে।

নিমজ্জমান মানুষ যেমন বাঁচার আশায় কোনো অবলম্বনকে আঁকড়ে ধরে, লরেলাও তেমনি এ্যান্টোনিওর বুকে মুখ লুকিয়ে ধরা গলায় বলে —"আমি আর সইতে পারছি না, সইতে পারছি না। অমন ক'রে তুমি কথা ব'লো না, আমাকে অমন ক'রে তুমি তাড়িয়ে দিয়ো না টোনিও। আমাকে তুমি শাস্তি দাও, অভিশাপ দাও, পায়ে মাড়িয়ে চ'লে যাও। এত কাণ্ড করবার পরও যদি তুমি আমায় এখনো ভালোবাস—তাহ'লে আমাকে তুমি নাও, আমাকে গ্রহণ কর টোনিও। যা খুশি কর আমাকে নিয়ে, কিন্তু এমন ক'রে তাড়িয়ে দিয়ো না।" আর কথা ব'লতে পারে না সে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

এ্যান্টোনিও তাকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে। কয়েক মুহূর্ত কেটে যায় নিঃশব্দে। হঠাৎ সে আকুল কণ্ঠে ব'লে ওঠে—"আমি এখনো তোমায় ভালোবাসি কিনা তাই জিজ্ঞাসা ক'রছ লরেলা? হা ভগবান! তুমি কি ভেবেছ, ঐ সামান্য ক্ষতটুকুর জন্যে আমি আমার অন্তরের ভালোবাসাও বিসর্জন দিয়েছি? তুমি কি আমার বক্ষের স্পন্দন শুনতে পাচ্ছ না? কি প্রলয় ঝড় বইছে সেখানে কি ক'রে বোঝাব তা? তুমি কি আমার প্রতি দয়া দেখাচ্ছ? তুমি জান আমি তোমার জন্য কত কষ্টই না সয়েছি, সেইজন্যেই কি আজ দয়া ক'রে ঐ কথা ব'লছ লরেলা—যে, তুমি আমার হবে?"

—"না গো না।" লরেলা দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দেয়। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে সে তার মুখের পানে চেয়ে বলে—"আমি তোমায় ভালোবাসি, সত্যি

ভালোবাসি। আজ তোমায় বলছি, তোমাকে ভালোবাসতে আমি ভয় পেতাম, কারণ আমার নিজেরই মেজাজের কিছু ঠিক ছিলো না। সব-তাতেই আমি বেঁকে বসতাম চিরদিন। কিন্তু এবার আমি বদ্‌লাব। আর আমি তোমায় আমাকে একবারটি ফিরে দেখেই পথ চল্‌তে দেব না। পাছে তোমার মনে কোনো সন্দেহ থাকে, তাই তোমাকে আমি চুম্বন দেব। তুমি তখন লোকের কাছে বল্‌তে পারবে—'সে আমায় চুম্বন দিয়েছে।'—আর জেনো, লরেলা তার স্বামীকে ছাড়া আর কাউকেই চুম্বন করে না।"

এই ব'লেই সে এ্যান্টোনিওকে পর পর তিন বার চুম্বন করে। তারপর তার বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলে—"এবার আমায় বিদায় দাও টোনিও, এবার আমি চলি। চুপ ক'রে লক্ষ্মী ছেলেটির মতো শুয়ে থাক এখন। হাতটাকে ভালো হ'তে দাও। আমার সঙ্গে আর এসো না। আমার কোনো ভয় নেই, একাই যেতে পারব আমি। লোকের ভয় আমি করি না, ভয় শুধু তোমাকেই!"

পরমুহূর্তেই সে দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যায়।

এ্যান্টোনিও জানালার ধারে দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ। একদৃষ্টে চেয়ে থাকে শান্ত সমুদ্রের দিকে। আকাশে তখন সমস্ত তারা উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে।

এর কিছুদিন পরে সেই পাদ্‌রী সাহেবের কাছে ব'সে লরেলা নিজের সমস্ত কাহিনী খুলে বলে। সব স্বীকার করে অকপটে। পাদ্‌রী সাহেব নিজের মনেই হাসেন। তারপর আনন্দের সুরেই ব'লে ওঠেন—"কে জানত বলো, এমনটা হবে? ভগবান যে এত শীগ্‌গির তোমাকে দয়া ক'রবেন, তোমার অন্তরের প্রার্থনা তাঁর কানে গিয়ে পৌঁছুবে, কে তা ভাবতে পেরেছিল বলো? তুমি তোমার মত বদ্‌লেছ, এবার তোমার সেই পূর্বের

ছেলেমানুষী স্বভাবও চ'লে গিয়েছে চিরদিনের জন্যে। ভগবানে বিশ্বাস রেখো মা। তিনি তোমার মঙ্গল ক'রবেন। তোমার ছেলের মুখ দেখবার আশায় আমি বেঁচে রইলাম, আমাকে বেঁচে থাকতেই হবে। তোমার ছেলে হবে, আমি তাকে ছুটে দেখতে যাব, কি বলো আরবাটিয়া, এঁ্যা ?"

হারমান্ সুভারম্যান—

নববর্ষের পূর্বদিনের স্বীকারোক্তি

দেখুন, বেশ ভালোই হ'লো, আমার আপনার পাশে ব'সে, গল্পগুজব ক'রে সময়টা বেশ কাটিয়ে দেওয়া যাবে। ভগবানকে এজন্যে ধন্যবাদ। ছুটির দিনের সেই হৈ হৈ কলরব আর নেই, এবার একটু অবসর পাবেন আমার জন্যে। কি বলুন?

বড়দিনের এই যে অফুরন্ত অবসর, এ আমাদের জন্যে নয়। আমাদের মতো চিরকুমারদের কাছে এই ছুটিটা কত বিরক্তিকর বলুন তো? আমাদের উত্ত্যক্ত করবার জন্যেই যেন এর সৃষ্টি! এই অবসরে খালি মনে পড়িয়ে দেয় আমাদের নিঃসঙ্গ জীবনযাত্রার সেই অসহায় অবস্থা। অনেকের কাছে হয়তো এই অবসর আনন্দের উৎস, কিন্তু আমাদের কাছে নিদারুণ যন্ত্রণা। অবিশ্যি, একথাও ঠিক যে আমরা একেবারে নিঃসঙ্গ নই,—অন্যকে খুশি করবার মতো আনন্দের উৎস আমাদের মধ্যেও দেখা দেয়, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, অন্যের আনন্দে আমরা যোগ দিতে পারি না, উৎসাহ হারিয়ে ফেলি। নিজের মনে জীবনের ভালোমন্দ নিয়ে অনেক প্রশ্ন জাগে, কতকটা সেইজন্যে, আর কতকটা এই নিঃসঙ্গ জীবনের শূন্যতাকে অনুভব করি ব'লেই।

আপনি হয়তো বলবেন, আমি কেন আমার মনের দুয়ার আপনার কাছে খুলে ধরি না, সব কথা কেন খুলে বলি না? তাহ'লে হয়তো সমবেদনাও পেতে পারি অনেক। কিন্তু তারও একটা কারণ আছে।

আপনার মনে আছে, বড়দিনের পরদিন আপনি আমায় সুন্দর একটি

কবিতা পাঠিয়েছিলেন ? সেই যে সেই—'নিঃসঙ্গ চড়ুই-পাখী' ? আমার মনের অবস্থাটা যেন ভালো ক'রে জেনেই আপনি ঐ লেখাটা আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন। লেখক সেখানে কি বলেছেন জানেন ? তিনি বলেছেন—'স্বভাবতই চিরকুমার কোন সান্ত্বনা পেতে চায় না। একবার সে যখন অসুখী হয়েছে, তখন সেই বেদনার মধ্যেই সে চায় তার পরিপূর্ণ আনন্দ লাভ করতে।'

লেখকের সেই 'নিঃসঙ্গ চড়ুই-পাখী' ছাড়াও, আর এক ধরনের চিরকুমার আছেন, যাঁরা হচ্ছেন তথাকথিত 'পরিবারের বন্ধু'। তাই ব'লে আমি সেই সব চিরকুমারের কথা বল্‌ছি না, যাঁরা একবার পারিবারিক সুখস্পর্শ লাভ ক'রে বন্ধুত্বের ছদ্মবেশে সংসারে অশান্তির সৃষ্টি করেন। তাঁদের চোখেই একদিন সাপের মতো ক্ষুধিত-দৃষ্টি জ্বলে ওঠে, সংসারকে তাঁরা ছারখার ক'রে যান। আমি বলছি আমার বাবার সেই সহপাঠী বন্ধুর মতো চিরকুমারের কথা, যিনি হাঁটুর ওপর ছোট্ট শিশুকে নাচাতে নাচাতে আমার মা'কে পত্রিকা থেকে প্রবন্ধ প'ড়ে শোনান, অথচ সেই প্রবন্ধের আপত্তিজনক অংশগুলো সন্তর্পণে এড়িয়ে যেতে জানেন, যাতে ক'রে অশান্তি সৃষ্টি হবার কোন অবকাশই থাকে না।

আমি এমন লোককেও দেখেছি, যিনি কোনো পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশে তাদের বন্ধুত্ব লাভ করেছেন,—সেই পরিবারের কোনো নারীকে নিষ্কাম ভাবে ভালোবেসে, তাকে নিজের অন্তরমন্দিরে দেবীর মতো পূজো ক'রে সারাটা জীবন কাটিয়ে গেছেন।

কি, আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না ? ভালোবাসার মধ্যে কোনো কামনা নেই অর্থাৎ নিষ্কাম ভালোবাসাও যে হ'তে পারে, কথাটা আপনি মেনে নিতে পারছেন না, না ? হ্যাঁ, আপনিও বোধ হয় ঠিকই ভেবেছেন। একথা সত্যি যে, খুব ধীর, স্থির প্রশান্ত মানুষের মধ্যেও পশু-প্রবৃত্তি সুপ্ত

অবস্থায় থাকে, কিন্তু একথা জানবেন সেখানে সেই প্রবৃত্তি শৃঙ্খলাবদ্ধ, তাকে নিজের বশে রাখবার শক্তি মানুষেরও আছে।

এই তো সেদিনকার ব্যাপার। বড়দিনের ঠিক আগের দিন দু'জন বৃদ্ধ, অতি বৃদ্ধ দু'জন ভদ্রলোকের মধ্যে যে কথাবার্তা হয়েছিল, দৃষ্টান্তস্বরূপ সেই কথা ব'লে আপনাকে জিনিসটা বুঝিয়ে দিচ্ছি। কেমন ক'রে আমি সেই কথাবার্তা শুনেছিলাম, সেটা নাই বা শুনলেন,—আর দেখুন, দোহাই আপনার, কথাটা যেন আর কারো কানে না যায়। কথা দিচ্ছেন তো ?—এবার তাহ'লে আরম্ভ ক'রতে পারি ?

বেশ বড় একখানি ঘর। সেকেলে আসবাব আর গালিচা দিয়ে বেশ পরিপাটি ক'রে সাজানো। আমাদের বাপ-ঠাকুরদার আমলের সেই পুরোনো দামী ঝাড় লণ্ঠন ঝুলছে, আর তা থেকে একটা ফিকে সবুজ রঙের আলো বিচ্ছুরিত হ'য়ে ঘরখানিকে আলো ক'রে রেখেছে। আলোটার একটা দিক গিয়ে পড়েছে সাদা চাদরে ঢাকা গোল-টেবিলটার ওপর। সেখানে সাজানো রয়েছে নববর্ষোৎসবের জন্যে আনা নানারকম পানীয় বস্তুর উপকরণ। টেবিলটার ঠিক মাঝখানে কয়েক ফোঁটা তেলের দাগও বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

আমার গল্পের সেই দু'জন বৃদ্ধ, সবুজ আলোর ছায়ায় আধশোয়া ভাবে ব'সে আছেন, মুখোমুখি। তাঁদের দেখে মনে হ'লো তাঁরা সেই বহু পুরাতন দিনের জীর্ণাবশেষ—কম্পিত, স্তিমিত। চোখে তাঁদের অলস দৃষ্টি, জীর্ণকালের শীর্ণ-কোটর থেকে যেন তা বেরিয়ে আসছে।

তাঁদের একজন গৃহস্বামী। তাঁর সরু ক'রে কামানো গোঁফজোড়া, আর সৈনিক সুলভ কুঞ্চিত ভ্রূ দেখেই স্পষ্টই বোঝা যায়, তিনি এক সময় একজন সামরিক কর্মচারী ছিলেন। তিনি তাঁর দোলানো চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে হাতল দুটোকে খুব শক্ত ক'রে ধ'রে ছিলেন, যেমন ক'রে

একজন খোঁড়া তার বগলের কাঠের পায়া দুটোকে শক্ত ক'রে ধ'রে রাখে। তিনি একরকম অনড় হয়েই বসেছিলেন, শুধু তাঁর চোয়াল দুটো অনবরত ওঠা নামা করছিল, দেখে মনে হবে হয়তো কিছু চিবোচ্ছেন।

তাঁর কাছেই অন্য ভদ্রলোকটি বসেছিলেন একটা কৌচে। বেশ লম্বা অথচ বেশ কৃশ, কাঁধদুটি সরু, মাথাটা বেশ বড়,—দেখেই মনে হয় তিনি একজন চিন্তাশীল, ভাবুক প্রকৃতির লোক। তাঁর মুখের লম্বা পাইপটা থেকে, মাঝে মাঝে কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়া বের হ'য়ে আসছে। তাঁর সেই মুখমণ্ডলে বাধক্যের রেখা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে, অথচ তা থেকে এমন একটা প্রশান্ত-হাসির আভাস দেখা যায়, যে হাসি কেবল ফুটে ওঠে শান্ত-বৈরাগ্যের মধ্যে।

দুজনেই চুপচাপ। শুধু সেই নিস্তব্ধ কক্ষে, জ্বলন্ত আলোর তেলে উঠছে মৃদু শব্দ, আর তামাকের পাইপের মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে ধোঁয়ার বুদ্বুদ। এক সময় ঘরের সেই স্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে, অন্ধকারে ঢাকা পেছনদিককার দেওয়াল ঘড়িটায় ঢং ঢং ক'রে বেজে উঠলো এগারোটা।

সেই চিন্তাশীল ভদ্রলোক ব'লে উঠলেন—'এই সময়েই তো তিনি আপনার পানীয় প্রস্তুত ক'রে দিতেন?' তাঁর স্বর মৃদু, একটু যেন কেঁপেও উঠলো সেই শব্দ।

গৃহস্বামী জবাব দিলেন—'হ্যাঁ, ঠিক এই সময়েই।' কেমন একটা রুক্ষ আওয়াজ। মনে হ'লো তাঁর স্বরে যেন এখনও সামরিক আদেশ দেবার ভাবটুকু লেগে রয়েছে।

'তাঁর অভাবে যে এতটা ফাঁকা ফাঁকা ঠেকবে, একথা ভাবিনি কোনোদিন।' প্রথম ভদ্রলোক জবাব দিলেন।

গৃহস্বামী শুধু মাথা নাড়লেন। তাঁর চোয়াল দুটো তখনও ওঠানামা করছে।

তাঁর বন্ধুটি আবার ব'লে চল্লেন, 'একটিবার নয়, চুয়াল্লিশটি নতুন বছরে তিনি আমাদের পানীয় পরিবেষন করেছেন।'

'হ্যাঁ, যতদিন আমরা বার্লিনে এসেছি এবং যতদিন থেকে আপনার সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব হয়েছে, তার মধ্যে এর ব্যতিক্রম ঘটেনি।'—বৃদ্ধ সৈনিক ব'লে উঠ্‌লেন।

'গত বছর ঠিক এই সময় আমরা কত আনন্দে কাটিয়েছিলাম।' জবাব দিলেন অতিথি। ব'লে চল্লেন—'তিনি সেদিন ঐ আরাম কেদারায় ব'সে পলের বড় ছেলেটির জন্যে মোজা বুনছিলেন। খুব তাড়াতাড়িই বুনে চলেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, বারোটা বাজবার আগেই তাঁকে বোনা শেষ করতে হবে। শেষও করেছিলেন তিনি। আমরা তখন আমাদের পানপাত্রে চুমুক দিয়ে, মৃত্যুর রহস্য নিয়ে আলোচনা করছিলাম। এর ঠিক দুমাস পরেই, সেই মৃত্যু এসে তাঁকে নিয়ে কোথায় চলে গেল। ...আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে,আমি 'আত্মার অবিনশ্বরতার' ওপর বিরাট একখানা বই লিখি। অবিশ্যি আপনি সে-কথা মানতেন না—আমি নিজেও আপনার স্ত্রী মারা যাবার পর, সেই কথাকে আমোল দিই না। আমার কাছে এই সমগ্র বিশ্ব মনে হয় কিছু নয়, কিছু না।'

মৃত মহিলার স্বামী জবাব দিলেন—'হ্যাঁ, সত্যি সে ভারি ভালো ছিল, অমন স্ত্রী হয় না। আমাকে কি যত্নই না সে করতো। আমি যখন ভোর পাঁচটায় আমার কাজে বের হতাম, তার আগেই সে উঠে, আমার জন্যে কফি তৈরি ক'রে এনে হাজির হ'ত। এর ব্যতিক্রম হ'ত না কখনো। অবিশ্যি তার দোষও ছিল। সে আপনার সঙ্গে যখন দার্শনিক মতবাদ নিয়ে জড়িয়ে পড়ে, তখন—'

অতিথি এই কথাতে একটু যেন বিচলিত হয়ে ব'লে উঠ্‌লেন—'আপনি কোনদিনই তাঁকে ঠিক বুঝতে পারেন নি।' কথা বল্‌তে গিয়ে

তাঁর ঠোঁট দুটো যেন একটু কেঁপেও উঠ্‌লো। সকরুণ শান্ত দৃষ্টি মেলে তিনি সৈনিক বন্ধুর দিকে চাইলেন। মনে হ'লো কোন গোপন অন্যায় যেন তাঁর অন্তরকে পীড়া দিচ্ছে।

কিছুক্ষণের মৌনতা ভঙ্গ ক'রে ভদ্রলোক আবার ব'লে উঠ্‌লেন—'বন্ধু, আজ আমি আপনাকে সেই কথাই শোনাতে চাই, যে-কথা বহুদিন থেকে আমাকে পীড়া দিয়ে আসছে। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সেই বোঝা আমি আর বইতে পারব না। আজ আমি সব খুলে বলছি আপনার কাছে।'

চেয়ারের পাশে যে লম্বা পাইপটা পড়েছিল, সেটাকে তুলে নিয়ে গৃহস্বামী বল্‌লেন—'বেশ, ব'লে যান।'

'একদিন আপনার স্ত্রী আর আমার মধ্যে একটা ব্যাপার ঘটে বসল।'

সৈনিক-বন্ধু হাতের পাইপটা নামিয়ে রাখলেন। তারপর, তাঁর বন্ধুর দিকে সবিস্ময়ে দৃষ্টি মেলে বল্‌লেন—'দোহাই ডাক্তার, ঠাট্টা ক'রবেন না।'

'না বন্ধু, ঠাট্টা নয়। আজ চল্লিশ বছর ধরে এই ব্যাপারটা আমার মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে আছে। কিন্তু আজ আপনার কাছে সব খুলে বলবার সময় এসেছে।'

গৃহস্বামী খুব উত্তেজিত হয়ে ব'লে উঠ্‌লেন—'তবে কি আপনি বল্‌তে চান, আমার স্ত্রী আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছে?'

বেদনা-মধুর মৃদু হেসে বন্ধুটি জবাব দিলেন—'ছিঃ বন্ধু! আপনি এমন কথা ভাবছেন।'

বৃদ্ধ সৈনিক কি যেন বিড়্‌বিড়্‌ করলেন। তারপর তামাকের পাইপটা ধরালেন।

তাঁর অতিথি-বন্ধু তখন ব'লে যেতে লাগলেন—'না, তিনি ছিলেন স্বর্গের পরীর মতই চিরপবিত্র। শুধু আপনি আর আমিই ক'রলাম অন্যায়।

শুনুন,—তেতাল্লিশ বছর আগেকার কথা। আপনি তখন বার্লিনে সবে মাত্র ক্যাপ্টেন হ'য়ে এসেছেন, আর আমি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করছি। সে সময় আপনি কেমন উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করছিলেন, সে-কথা নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে?'

—'হুঁ!' গৃহস্বামী তাঁর গোঁফ জোড়ায় চাড়া দিলেন।

—'সে সময় একজন পরমাসুন্দরী অভিনেত্রীর কথা মনে পড়ে আপনার? সেই যে ছোট ছোট ঝক্‌ঝকে সুন্দর সাদা দাঁত, ভোমরার মত কালো কালো চোখ?'

—'হ্যাঁ, মনে পড়ছে। তার নাম ছিল বিয়াঙ্কা।' বৃদ্ধের শীর্ণ কঠিন মুখের ওপর দিয়ে চকিতে যেন একটা শুকনো হাসি খেলে গেল। তিনি তাঁর বন্ধুর দিকে চেয়ে বল্‌লেন—'সেই ঝক্‌ঝকে ছোট সাদা দাঁত কিন্তু কামড়াতেও জানত, একথা আপনাকে বল্‌তে পারি।'

—'আপনি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে প্রতারণা করেছিলেন, সে-কথা তিনি বুঝেও ছিলেন। কিন্তু তার বিরুদ্ধে তিনি একটি কথাও বলেন নি। নীরবে স'য়ে গেছেন সেই বেদনা। আমার মায়ের মৃত্যুর পর প্রথমে যে নারীর সংস্পর্শে আমি এসেছিলাম, তিনিই হচ্ছেন সেই নারী। আমার জীবনে তিনি এসেছিলেন ধ্রুবতারার মতই। আকাশের তারার দিকে মানুষ যে-ভাবে তাকিয়ে থাকে, সুন্দর ব'লে তাকে পূজা করে, আমিও সেইরকম পূজারীর দৃষ্টি নিয়ে তাঁর দিকে চেয়ে থাকতাম।

'সাহস ক'রে একদিন আমি তাঁকে তাঁর অন্তর্বেদনার কারণ জানতে চাইলাম। মৃদু হেসে তখন তিনি জবাব দিয়েছিলেন, যে তিনি বড় দুর্বল, তখন পর্যন্ত সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন নি। এটা আপনার পল্ জন্মাবার কিছুদিন পরের কথা।

'তারপর এলো নববর্ষের আগের দিন—আজ থেকে তেতাল্লিশ বছর

আগেকার এই রকম এক রাত্রি। রোজ যেমন এসে থাকি, সেই রকম সেদিনও ঠিক আটটায় আমি আপনার বাড়িতে এসে হাজির। তিনি একটা ছুঁচের কাজ নিয়ে বস্‌লেন, আর আমি তাঁকে বই প'ড়ে শোনাচ্ছিলাম। আপনার প্রতীক্ষায় ঐভাবে আমরা দু'জনে সময় কাটাতে লাগলাম। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল, তবু আপনার দেখা নেই। লক্ষ্য ক'রে দেখলাম, তিনি ক্রমেই যেন অস্থির হয়ে উঠ্‌লেন, কাঁপতে শুরু করলেন, আর তার সঙ্গে আমার শরীরও কণ্টকিত হয়ে উঠ্‌লো।

'আমি জানতাম, আপনি তখন কোথায়। ভয় হ'লো আপনি বুঝি সেই নারীর বাহুবন্ধনে ধরা দিয়ে ভুলে গেছেন রাত্রি তখন ক'টা, ভুলে গেছেন বারোটা বেজে গেছে।

'আপনার স্ত্রী তখন হাতের কাজ বন্ধ করলেন, আমিও আর পড়তে পারলাম না। আমাদের ঘিরে তখন যেন একটা ভয়াবহ নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। এক সময় লক্ষ্য করলাম, তাঁর চোখের পাতায় এক ফোঁটা জল। অশ্রুবিন্দু তাঁর গাল বেয়ে কোলের ওপরকার সেই বোনাটার ওপর গিয়ে পড়ল। আমি আসন ছেড়ে উঠে পড়লাম, মনে হ'লো ছুটে গিয়ে আপনাকে খুঁজে আনি। বেশ অনুভব ক'রলাম সেই অভিনেত্রীর কবল থেকে জোর ক'রে আপনাকে ছিনিয়ে আনবার ক্ষমতা আমার আছে। কিন্তু সেই মুহূর্তে আপনার স্ত্রীও তাঁর চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন,—এখন যেখানে ব'সে আছি, ঠিক এই চেয়ারেই তিনি সেদিন বসেছিলেন।

'তিনি চীৎকার ক'রে ব'লে উঠ্‌লেন—একি আপনি কোথায় যাচ্ছেন? সর্বশরীর তাঁর যেন ভয়ে কাঁপছে।

'আমি জবাব দিলাম—ফাগুকে ডেকে আনতে যাচ্ছি।

'এ কথা শুনে তিনি ডাক ছেড়ে ব'লে উঠ্‌লেন—দোহাই আপনার,

অন্ততঃ আপনি এখানে থাকুন। আমার মাথার দিব্যি, আপনিও আমাকে এভাবে একলা ফেলে যাবেন না।

'তারপর তিনি ছুটে এসে, তাঁর হাত-দুটিকে আমাব কাঁধের ওপর রেখে, তাঁর অশ্রুসিক্ত মুখখানি আমার বুকে লুকিয়ে ফেললেন। সর্বশরীর আমার কেঁপে উঠ্‌ল। এর আগে আর কোনো নারীর এত নৈকট্য আমি অনুভব করিনি। তাই বোধ হয় ঐ কম্পন।'

'যাই হোক, নিজেকে আমি সংযত ক'রে নিলাম, সান্ত্বনা দিতে লাগলাম তাঁকে। তিনি দুঃখে এত ভেঙে পড়েছিলেন যে, সে-দুঃখে আমার সান্ত্বনাই তাঁর একমাত্র সান্ত্বনা।

'একটু বাদেই আপনি ফিরে এলেন। সে সময় আমার মুখের কি অবস্থা হয়েছিল আপনি তা লক্ষ্য করেননি। আপনার মুখ থেকে সে সময় লাল আভা ফুটে বের হচ্ছিল,—দেখে মনে হচ্ছিল, ভালোবাসার মাদকতায় আপনার দু'চোখ ভারী হ'য়ে উঠেছে।

'সে-দিন থেকে আমার কেমন যেন একটা পরিবর্তন এলো, ভয়-ও হ'লো সেই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। তাঁর সেই কোমল বাহুলতার স্পর্শ, কেশপাশের সুন্দর সুরভি অনুভব করবার পর থেকে, মনে হ'লো— আমার কল্পনার সেই ধ্রুবতারা কক্ষচ্যুত হয়েছে, তার জায়গায় দেখা দিয়েছে এক নারী, অপরূপ তার রূপ, প্রেম দিয়ে গড়া তার সর্বশরীর।

'সঙ্গে সঙ্গেই আমার মনে হ'লো আমি প্রতারক, আমি বিশ্বাসঘাতক। নিজেকে বার বার ধিক্কার দিলাম। তারপর মনের গ্লানি মুছে ফেলবার জন্যে তৈরী হ'লাম,—সেই অভিনেত্রীর কাছ থেকে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করবার আয়োজন করলাম। ভাগ্যক্রমে সে সময় আমার হাতে বেশ কিছু টাকাও ছিল। তাকে সেই টাকা দিতেই সে সন্তুষ্ট হয়েছিল, আর—'

বিস্ময়ে চীৎকার ক'রে গৃহস্বামী সেই বৃদ্ধ সৈনিক ব'লে উঠলেন—

'বুঝেছি। বিয়াঙ্কার সেই মর্মস্পর্শী বিদায়-পত্রের কারণ তা'হলে আপনিই! সে চিঠিতে লিখেছিল—যদিও বুক আমার ভেঙে যাবে, তবুও তোমায় ছেড়ে আমাকে চ'লে যেতেই হবে। আপনিই তা'হলে সে চিঠির জন্যে দায়ী?'

বন্ধুটি জবাব দিলেন—'হ্যাঁ, আমিই তার জন্যে দায়ী। শুনুন, আরও বলছি। অর্থের বিনিময়ে আমি চেয়েছিলাম শান্তি, কিন্তু শান্তি এলো না। আমার মাথায় তখন যত সব পাশবিক চিন্তা উন্মত্তভাবে ঘোরাফেরা করতে লাগলো। কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিলাম। সেই সময় 'আত্মার অবিনশ্বরতা'র ওপর একখানা বই লিখব ব'লে তার একটা ছক তৈরী করছিলাম! ভেবেছিলাম কাজ নিয়ে ডুবে থাকলে রেহাই পাব, কিন্তু কিছুতেই মনের শান্তি আর এলো না।

'এই ভাবে বছর কাটলো, আবার এলো সেই নববর্ষের পূর্বদিন। আবার আমরা দু'জনে এখানে বসলাম। এবার আপনি বাড়িতে ছিলেন, কিন্তু আপনি তখন পাশের ঘরে একখানি সোফায় গা ঢেলে দিয়ে ঘুমুচ্ছিলেন। উৎসব-মুখর ক্লাবের নৈশ-ভোজনের পর আপনি তখন ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত।

'আমি তখন তাঁর পাশে ব'সে আছি। আমার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল তাঁর সুন্দর অথচ বিবর্ণ মুখখানির ওপর, সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল তার আগের বছরের সেই ঘটনাগুলি। মনে হ'লো, আমার বুকে তাঁর সেই মুখখানির স্পর্শ আবার যদি পাই, যদি তাঁর অধরে চুম্বনের রেখা এঁকে দিতে পারি, তা'হলে আমার সকল জ্বালা জুড়োয়, আবার শান্তি ফিরে পাই।

'একটু পরেই চকিতে দু'জনের দৃষ্টি বিনিময় হ'য়ে গেল। মনে হ'লো, তিনি আমার গোপন বাসনা বুঝতে পেরেছেন, তাঁর দৃষ্টিতে যেন তারই জবাব। আমি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলাম না, তাঁর পায়ে গিয়ে

লুটিয়ে পড়লাম, আমার রক্তিম মুখখানি তাঁর কোলে লুকিয়ে ফেলে যেন ভেঙে পড়লাম খান্ খান্ হ'য়ে।

'কিছুক্ষণ সেইভাবে সেখানে নিস্তব্ধ হয়ে প'ড়ে রইলাম। তারপর অনুভব করলাম আমার মাথায় তাঁর স্নেহ-শীতল হাতের স্পর্শ। সহজ সুন্দর শান্ত মধুর কণ্ঠে তিনি বল্লেন—বন্ধু! সাহস সঞ্চয় করুন, শক্ত হয়ে উঠুন, পাশের ঘরে যে লোকটি পরম বিশ্বাসে নিদ্রা যাচ্ছেন, তাঁর বিশ্বাসে আঘাত ক'রবেন না।

'আমি যেন লাফিয়ে উঠ্লাম। হতবুদ্ধি হ'য়ে চেয়ে রইলাম তাঁর দিকে। তিনি টেবিল থেকে একখানা বই টেনে এনে আমার দিকে বাড়িয়ে ধরলেন। আমি বুঝতে পারলাম, তার অর্থ কি। পাতার পর পাতা জোরে জোরে প'ড়ে যেতে লাগলাম। কি যে তখন পড়েছিলাম তা জানিনা, অক্ষরগুলো শুধু আমার চোখের সামনে কেঁপে কেঁপে উঠ্ছিল। কিন্তু যে ঝড় আমার মনের মধ্যে এতক্ষণ ধ'রে তোলপাড় ক'রছিল, ধীরে ধীরে তা থেমে এলো। বারোটা বেজে উঠ্লো, আপনি এলেন তন্দ্রাজড়িত চোখে আমাদের নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাতে। তখন আমার মনে হ'লো—আমার মনের সকল পাপ, সমস্ত গ্লানি কোথায় যেন মিলিয়ে গেছে।

'সেদিন থেকে আমি শান্ত হ'য়ে গেলাম। আমি জানি, তিনি আমার ভালোবাসা প্রত্যাখ্যান করেননি। তারপর থেকে তাঁর মমতা, তাঁর সহানুভূতিই শুধু চেয়েছিলাম।

'বছরের পর বছর কাটতে লাগলো। আপনার ছেলেমেয়েরা বড় হ'তে লাগলো, তাদের বিয়েও হ'য়ে গেল। আর, আমরা তিনজন ধীরে ধীরে বার্ধক্যের সীমায় গিয়ে পৌছুলাম। আপনি সেই উচ্ছৃঙ্খল জীবন পরিত্যাগ ক'রলেন, অন্য নারীর কথা ভুলে গেলেন একেবারে,

নিজের পত্নীকে ঘিরেই আপনার জীবন আবার শুরু হ'লো। তাঁর প্রতি আমার ভালোবাসা একটুও কমল না, তাঁকে ভালো না বেসে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়েই দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু আমার সেই প্রেম এক নতুন রূপ নিয়ে জন্মলাভ ক'রল। পার্থিব কামনা কেটে গিয়ে, আমাদের দুজনের মধ্যে একটা আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ স্থাপিত হ'লো।

'আমরা যখন দার্শনিক তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা ক'রতাম, আপনি প্রায়ই তা শুনে আমাদের উপহাস ক'রতেন কিন্তু আপনি যদি জানতেন আমাদের আত্মায় আত্মায় কি মিলন ঘটেছে, তা'হলে হয়তো আপনি ঈর্ষান্বিত হ'য়ে উঠ্‌তেন।

'আজ তিনি বেঁচে নেই। হয়তো বা আসছে নববর্ষের এমনি এক পূর্বরাত্রে আমরা তাঁকে অনুসরণ করতে পারি। তাই, আজ সময় হয়েছে ভেবে, আমি আমার মনের গোপন কথা খুলে বল্‌লাম—বন্ধু! আপনার প্রতি যে অন্যায় একদিন আমি করেছি, তার জন্যে আজ আমায় ক্ষমা করুন।'

এই কথা ব'লে তিনি তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলেন, কিন্তু সৈনিক বন্ধুটি ব'লে উঠ্‌লেন—'কি যে বলেন তার ঠিক নেই, এর মধ্যে ক্ষমা চাইবার কি আছে? যে-ঘটনার কথা আপনি আজ আমায় বল্‌লেন, আমি তা আগেই জানতাম। চল্লিশ বছর আগে সে-ই আমাকে সব খুলে বলেছিল। আর আমি কেন বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত অন্য নারীর প্রতি এত গভীরভাবে আসক্ত হয়েছিলাম জানেন? কারণ সেদিন যখন তার কাছ থেকেই জানলাম যে পৃথিবীতে এক আপনাকে ছাড়া সে আর কাউকে ভালোবাসার কথা কল্পনা করতে পারে না, তখন থেকেই আমি ওই পথ বেছে নিয়েছিলাম।'

বন্ধুটি তাঁর কথা শুনে, নির্বাক বিস্ময়ে তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন। দেওয়াল-ঘড়িতে তখন বারোটা বেজে উঠ্‌লো কর্কশ শব্দে—ঢং ঢং ঢং।

জেকব ওয়াসারম্যান্—

আদম আরবাস্

প্রধান বিচারপতি ভিস্টার ওয়েগ ছিলেন সুবিখ্যাত আনসেলম্ ফুয়ার বাকের মতো একজন সুচতুর, বিচক্ষণ অপরাধ-তত্ত্ববিদ্। সম্প্রতি তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তাঁরই কাগজপত্র থেকে নিচেকার এই গল্পটি আমি আবিষ্কার করি।

অক্টোবরের এক সন্ধ্যার প্রায় শেষ দিকে, আদম আরবাস্ নামে 'ফ্রাঙ্কো'-বাসী এক কৃষক এলো 'গুনজেনহাউসেন' থানায়। সে এসে বল্‌লে যে, সেইদিনই সে তার নিজের গ্রাম 'আহা'-য়, তাঁর আঠারো বছরের ছেলে সাইমনকে গলা কেটে খুন করেছে। বাড়িতে তার ঘরে ছেলেটি মৃত অবস্থায় প'ড়ে আছে। যে ছুরি দিয়ে সে এই অপরাধ করেছে, তা'ও সে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছিল এবং থানায় তা জমা দিল। তখনও তাতে রক্তের দাগ লেগে আছে।

সংক্ষেপে প্রায় সব কিছুই সে বেশ সহজ শান্ত স্বরে ব'লে গেল। আর তার সেই স্বীকারোক্তিও পুলিশ যথাযথভাবেই লিখে নিল। কিন্তু আরবাস্ আর কোনো কথা বল্‌তে চাইলো না এবং পুলিশ কমিশনার যে-সব প্রশ্ন করলেন তার জবাব দিতেও সে অস্বীকার করলো। ঘটনাস্থলে সেই রাত্রেই এক সরকারী তদন্ত হ'য়ে গেল। জানা গেল, যে আরবাসের এজাহার সত্যি। তার স্ত্রী বাড়িতেই ছিল। দারুণ শোকে এবং ভয়ে সে প্রায় আধ-পাগলের মতো হয়ে গিয়েছে। তাকে ঘিরে রয়েছে খামার বাড়ির ঝি-চাকরেরা। তারাও ভীষণ ভয় পেয়েছে।

আদম আরবাস্‌কে 'আন্‌স্‌বাক' জেলে আটক ক'রে রাখা হ'লো।

সে সময় সবেমাত্র আমি জজ্‌গিরি শুরু করেছি। মাত্র কয়েক হপ্তা আগে এই জেলায় আমাকে নিযুক্ত করা হয়েছে। এই মামলায় আমাকেই বিচারের কাজ করতে হবে জেনে বেশ আনন্দ হ'লো, খুশি হ'য়ে উঠ্‌লাম।

প্রথমে মামলাটি বেশ জলের মতো পরিষ্কার ব'লেই মনে হ'লো। একজন কৃষক, তার বুদ্ধির চেয়ে, তার জাতের অশিক্ষা বা অজ্ঞতা এবং বর্ব্বরতাই সে বেশি ক'রে পেয়েছে। তারই ছেলে যখন অধঃপাতে যাচ্ছে, এবং তার লজ্জা ও দুঃখের কারণই যখন সেই ছেলে, তখন তাকে সে সোজাসুজি এই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিল। এভাবে সে তার ছেলেকে উপযুক্ত শাস্তিই দিয়েছে এবং ভবিষ্যতের নিশ্চিত দুঃখের হাত থেকেও বেঁচেছে।

সাক্ষীরা সবাই একবাক্যে মত প্রকাশ করলে যে, সাইমন ছিল একেবারে একটা অপদার্থ, ভবঘুরে ; কাজকর্ম সে ক'রতো না, রাতদিন কেবল গাঁয়ের যত-সব শুঁড়িখানায় আড্ডা দিত, নয়তো মেলায় মেলায় ঘুরে বেড়াত। তার সেই অলস ও উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজন হ'তো রাশি রাশি টাকার। ভয় দেখিয়েও যখন সে ঐ টাকা তার মায়ের কাছ থেকে আদায় করতে পারত না, তখন অন্যপথ ধ'রত। যেমন, সে একবার আগষ্ট মাসে উইসেনবার্গে গিয়ে 'কহ্‌ন' নামে এক শস্য-ব্যবসায়ীর কাছ থেকে তার বাবার প্রাপ্য হিসেবে যবের দাম বাবদ আটশ মার্ক আদায় ক'রে নেয় ; তারপর, সেই সমস্ত টাকাই বদখেয়ালে উড়িয়ে দিয়ে নষ্ট করে। (তাছাড়া আরও আছে।) নর্ডালিং গেনে একজন গণিকা তাকে বেশ হাত করে, এবং পরে প্রচার করে যে তারই গর্ভে সাইমনের এক সন্তানের জন্ম। একদিন তাকেই সাইমন এক নির্জনস্থানে নিয়ে গিয়ে গলা টিপে মারতে চেষ্টা করে। পথ দিয়ে তখন লোক চল্‌ছিল,

তারা স্ত্রীলোকটির আর্তনাদ শুনতে পায় এবং তাকে উদ্ধার করে। সেই ব্যাপারটির তদন্ত তখনও চল্‌ছিল—ইতিমধ্যে আদম আরবাস নিজেই তার বিচার করে ফেলেছে।

সাক্ষীদের সাক্ষ্য থেকে সাইমনের যুবা বয়সের আরও যে সমস্ত অভ্যাস এবং প্রকৃতিগত দোষের কথা জানা গেল, তাতে ক'রে তার চরিত্র আরও বেশি কলঙ্কিত রূপে প্রকাশ পেল। ছেলেবেলা থেকেই সে হিংসুটে স্বভাব, শয়তানি বুদ্ধিতে পাকা। ভালোর চিহ্ন যেন তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া ভার। আরও দৃষ্টান্ত আছে। একদিন বাড়িব ঝি শহর থেকে দু'টি নতুন ছাল্‌টি কাপড এনে বেশ গর্বের সঙ্গেই গিন্নী-মাকে দেখাচ্ছিল। এমন সময় উপাসনার ঘণ্টা বাজতেই, ফুলের মত সাদা ধব্‌ধবে সেই কাপড়গুলো সে রান্নাঘরের টেবিলে ফেলে রেখে গীর্জায় চ'লে যায়। ফিরে এসে দেখে যে, কে যেন তাতে চাকায় দেবার তেল দিয়ে সেগুলোকে এমন ভাবে মাখিয়ে রেখেছে, যাতে সেগুলো আব কোনমতেই পরা চল্‌বে না। কারও, বুঝতে বাকি রইলো না যে, এ সাইমনেরই কাজ। কিন্তু গাড়োয়ান স্কার্ফে'র বেলাতেও যেমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি, এবারেও তেমনি কোনো প্রমাণ পাওয়া গেল না। স্কার্ফ তাব ময়দা-বোঝাই গাড়িটাকে একটা সরাইখানার সামনে রেখে কোথায় চ'লে গিয়েছিল। ফিরে এসে যখন সে গাড়ি চালিয়ে রওনা হ'লো, তখন দেখা গেল যে রাস্তার ওপর দিয়ে সাদা নদীব মতো ময়দার স্রোত বয়ে গেছে। প্রায় দশ বারটা ময়দার বস্তাকে ছুরি দিয়ে ফুটো করা হ'য়েছে, দেখা গেল। সবাই জানত যে, এ সাইমন আরবাসেরই কাণ্ড! কিন্তু জানলে কি হবে, তার কোনো প্রমাণ ছিল না।

ধীরে ধীরে সাইমনের নীচতা এবং চৌর্যবৃত্তির সঙ্গে আরও এসে দেখা দিল ইতরতা ও পাশবিকতা! সজ্জনেরা সবাই বুঝতে পারলেন, যে,

এমন একটি বিষবৃক্ষ ক্রমশ বেড়ে উঠ্ছে, যার মাথা কোনো অস্ত্র দিয়েই কাটা যাবে না, আর তার মূল এমন শক্ত ভাবে গেড়ে বসেছে, যাতে ক'রে কোনো কোদাল দিয়েই তাকে উঠিয়ে ফেলা সম্ভব নয়। সাক্ষ্য-প্রমাণ যা পাওয়া গেল তার এক ভগ্নাংশই আমার বিচারের পক্ষে যথেষ্ট। এখানে কোনো সমস্যা নেই, জটিলতা নেই, রহস্যও নেই। মৃত যুবকটির কথা চিন্তা ক'রলে সবকিছুই সুস্পষ্ট এবং সহজ, একই দিকে তার গতি।

বাৎসরিক মেলার সময় এক রবিবারে গুন্‌জেনহাউসেনে এই গ্রাম্য-বিয়োগান্ত নাটকের শেষ দৃশ্য অনুষ্ঠিত হয়। 'আহার' এক সরাইয়ে ব'সে উইণ্ডবাকের দু'জন কৃষক আলোচনা করছিল যে, সাইমন আরবাস্‌কে গ্রেপ্তার করবার জন্যে শমন বেরিয়েছে। তারা তখন লক্ষ্য করেনি যে, তাদের পাশের টেবিলেই আদম আর্‌বাস ব'সে আছে। কিন্তু সরাইয়ের মালিক, এবং আর কেউ কেউ আদমের দিকে উৎসুক নয়নে চাইলো। আদম যে ভাবে তার চশমা খুলে রেখে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো, তা দেখে তাদের এই কথাই মনে হ'লো যে, আদম তার ছেলে সম্বন্ধে লর্ড লিংসেনের ব্যাপারটা তখনও পর্যন্ত শোনেনি। আসলে, যত দিন পারা যেত এই বুড়োর কাছে তার ছেলের অত্যাচারের কাহিনী লুকিয়েই রাখা হ'তো। তার অসাধারণ গাম্ভীর্য, তার মর্যাদাবোধ, তাছাড়া তার সমাজের আর সবাই তাকে যে প্রীতির চোখে দেখত, সেই সব কারণে কেউ বড় একটা তার কাছে ঘেঁষত না বা এ-সব নিয়ে কথাও তুলত না চট্ ক'রে। তার ওপরে এই ক'বছর ধ'রে তার স্ত্রী, সব সময়েই যে কোন মন্দ খবর তার স্বামীর কানে পৌছবার আগেই, নিজেই সে ব্যাপারটাকে হাল্কা ক'রে ফেল্‌তো। কিন্তু আদমকে ভুল বুঝেছিল গাঁয়ের লোকেরা। তারা ভাবত নিত্যি যা ঘট্‌ছে, আদম তার খবরই রাখে না, বা ইচ্ছে ক'রেই আসল ব্যাপার ধামা চাপা দিতে চায়।

দুধ থেকে মাখন তুলতে তুলতে মুখরা ঝিয়ের মেয়েটি চাষী বৌকে বল্‌ছিল যে, বিপদ বেশ ঘনিয়ে এলো। আরবাস্ তখন বাড়ি ফিরে জানলার ধারে দাঁড়িয়ে। কিন্তু যাতে ক'রে তার স্ত্রীর মুখ নজরে না পড়ে সেইভাবে সে দাঁড়িয়েছিল। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। রাজমিস্ত্রী ফ্র্যাঙ্ক-স্কিফারার এসে দাঁড়ালো এবং আরবাসের স্ত্রীকে শুনিয়ে শুনিয়ে বল্‌তে লাগ্‌লো যে, সাইমন গুনজেনহাউসেনের 'হার্ট' নামে মদের দোকানে পুরুষ ও মেয়েদের নিয়ে খুব মদ খাচ্ছে আর বেপরোয়া খালি টাকা নষ্ট করছে। তারপর সে বেশ খানিকটা হো হো ক'রে হেসে বলে উঠ্‌ল—"কিন্তু তারা শীঘ্র তোমার যাদুধনকে খাঁচায় পুরছে। পুলিশের লোক এখন তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।" যাইহোক, পরে জানা যায় যে, সে খবর সত্যি নয়, এমন কি শমন জারী হবার খবরও একটা গুজব মাত্র।

চাকর-বাকর সব তখন মেলায় গিয়েছে। আরবাসের স্ত্রী দেওয়ালে হেলান দেওয়ানো একখানি বেঞ্চের ওপর মুহ্যমান অবস্থায় ব'সে। ঘরের এদিক ওদিক পায়চারি ক'রে বেড়াচ্ছে আরবাস্। একটু পরেই শোনা গেল রাস্তা দিয়ে কে যেন হেঁটে আসছে অসংলগ্ন পদবিক্ষেপে। তারপরেই দরজার কড়াটা ন'ড়ে উঠ্‌লো। জোরে জোরে ধাক্কা পড়তে লাগলো দরজার উপর, সেই সঙ্গে শুরু হ'লো অসংলগ্ন প্রলাপোক্তি। আরবাসের স্ত্রী উঠে দাঁড়ালো, তারপর এগিয়ে গেল সদরের দিকে। আরবাস্ তখন শুধু তার আঙুল দিয়ে কি যেন নির্দেশ করলো। তার স্ত্রী দাঁড়ালো থম্‌কে। জানালার ওপাশে দেখা গেল সাইমনের মুখ, সে মুখ মদের নেশায় বিবর্ণ, চোখে তার কুটিল চাহনি। তার মা চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো, তাকে বল্‌লো সেখান থেকে চ'লে যেতে। তৎক্ষণাৎ সে অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

তারপর কিছুক্ষণ ধরে সব চুপ্‌চাপ।

একটু পরে গোলমাল শোনা গেল পাশের ঘর থেকে। খিড়কির পথে সাইমন ঢুকেছে বাড়িতে। তখন বেশ অন্ধকার, সাইমন তাই ভাঁড়ারের জিনিস পত্রের ওপর হোঁচট্ খেয়ে পড়েছে। কি যেন ভেঙে পড়ার শব্দ হ'লো। মা খুলে ফেল্‌লো দরজাটা, ল্যাম্পের আলোতে দেখতে পেল, সেই মাতাল ছেলেটি মেঝে থেকে চট্ ক'রে উঠে দাঁড়ালো। তারপর সে তার বাপ-মা'র দিকে হাত উঁচিয়ে অকথ্য ভাষায় অবিশ্রান্ত যা-তা ব'লে যেতে লাগলো। আদম্ আরবাসের জীবনে সে এক সঙ্কটমুহূর্ত। তার স্ত্রী পরে একথা বলেছিল যে, সেদিন সে আরবাসের আপাদ-মস্তক কাঁপতে দেখেছে।

সাইমন, ইতিমধ্যে তার ঘরে ঢুকে চীৎকার করে বেশ জোরেই দরজাটা ভেজিয়ে দিল। আবার কিছুক্ষণ সব চুপ্‌চাপ্।

আরবাস্ বাইরে বেরিয়ে আসে। আঁচলে মুখ ঢেকে তার স্ত্রীও তার পাশে এসে দাঁড়ালো। এই ভাবে মিনিট পাঁচেক কাটলো তাদের। আরবাস্ তারপর সোজা শোবার ঘরে গিয়ে ঢোকে। চাষী-বৌ পরে একথা বলেছিল যে, সে তখনই বুঝতে পেরেছিল কি ঘটতে পারে, কিন্তু ভয়ে তার সর্বশরীর হিম হ'য়ে এসেছিল, এক পা নড়বারও তার সাধ্য ছিল না। কাজেই, সাইমন তখন নেশায় অভিভূত হয়ে বিছানায় শোওয়া মাত্রই ঘুমিয়ে পড়েছিল কিনা, অথবা পিতাপুত্রে কোনো কথাবার্তা হয়েছিল কিনা, সেকথা তার জানবার উপায় ছিল না। আরবাসের স্ত্রী একবার বলে যে, সব চুপ্‌চাপ ছিল, আবার বলে তারা দু'জনে অনেকক্ষণ ধ'রে কথাবার্তা বলেছিল। যাইহোক, ঘরের দু'টো দরজাই বন্ধ ছিল। তাছাড়া, সে বসেছিল চিমনির পাশে। একথা তার নিজের কথা থেকেই জানা যায়। কিন্তু চিমনির ধারে ব'সে থাকলেও যে ঘরের কথাবার্তা তার পক্ষে শোনা সম্ভব নয় এর অনেক প্রমাণ পাওয়া গেছে। এর পর,

এটাও লক্ষ্য করবার মতো যে, ঠিক কতক্ষণ আদম আরবাস্ তার ছেলের ঘরে ছিল সে-কথা আদমের স্ত্রী নিশ্চয় ক'রে বল্‌তে পারেনি একবার বলে পনের মিনিটের বেশি নয়, আবার বলে এক ঘণ্টারও বেশি। যে ছোরা দিয়ে খুন করা হয়েছে, সেটা আরবাসের নয়, তার ছেলেরই। কিন্তু সেটা তার ছেলে নিজের কাছেই রেখেছিল, না, ঘরেই পড়েছিল—সেই সম্পর্কেও বিশদ কোনো তথ্য আবিষ্কৃত হয়নি। এবিষয়ে আরবাস্ একেবারেই নিরুত্তর ছিল। যদিও ব্যাপারটা ছিল খুবই জরুরী, কিন্তু এবিষয়ে নতুন ক'বে আলোকপাত সম্ভব হয় নি।

একথা আমি জোর করেই বলতে পারি যে, প্রথমে যা যা ঘটেছে, তা অদ্ভুত রকমের হ'লেও, আমি খুব বেশি উৎসাহ পাইনি। কারণ, এই জাতীয় গুরুতর অপরাধে এই রকমের কাণ্ডই সব ঘটে থাকে। বাপ ছিল একরোখো মানুষ। চাষাড়ে বুদ্ধিতে সে যা বুঝেছিল তাই করেছিল। তার আত্মসম্মানে ঘা লাগায় সে গিয়েছিল ক্ষেপে। আর ছেলেটা ছিল একটা বিশ্ববখাটে, অপদার্থ! তার এই অপঘাত মৃত্যুতে দুঃখ করবার মতো তেমন কিছু ছিল না। মায়ের মন এই দুয়ের মধ্যে দোল খাচ্ছিল। এই ঘটনার সবটাই ছিল স্বাভাবিক, তাই বিচারের পক্ষে গোলমেলে কিছু ছিল না।

ক্রমশ অবিশ্যি আদম আরবাসের চরিত্র এবং আগেকার সব ঘটনা সুক্ষ্মভাবে আলোচনা ক'রে আমার কৌতূহল বেড়ে গিয়েছিল। যে-রকম দেওয়াল সাধারণতঃ আমাদের চোখে পড়ে, মনে কর তুমি সেইরকম একটা দেওয়ালের পাশ দিয়ে চলেছ, হঠাৎ তোমার নজরে পড়লো সেই দেওয়ালের ওপর অস্পষ্ট কতগুলো দাগ। ক্রমশ যদি সেই দাগগুলি স্পষ্ট হতে থাকে, তাহ'লে তার মধ্যে কি লেখা আছে তা আবিষ্কার করবার জন্য তোমার অদম্য উৎসাহ জেগে উঠ্‌বে। তুমি তখন বার বার চেষ্টা ক'রে

দেখবে, দেওয়ালের ঐ রহস্যময় দাগগুলির অন্তরালে কোন কিছু আবিষ্কার করতে পার কিনা। আমার অবস্থাও অনেকটা এই রকম হয়েছিল।

তের বছর পর্যন্ত আরবাস্‌-দম্পতি ছিল নিঃসন্তান। বৌটি এই ব্যাপারকে তার ভাগ্যের দোষ ব'লেই গ্রহণ করেছিল। কিন্তু, প্রকৃতির এই পরিহাসকে আরবাস্‌ সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি। আরবাস পরিবারের নাম সে দেশের ইতিহাসে চতুর্দশ শতাব্দীর থেকেই চ'লে আসছে। কাজেই, সেইরকম একটা বনেদী চাষী-পরিবারের ধারা তাতে এসে শেষ হ'য়ে যাবে, কোনো বংশধর জন্মাবে না, এ ধারণা তার কাছে নিতান্ত লজ্জাজনক মনে হ'তো। তাই যদি হয়, তা'হলে আর পরিশ্রম করেই বা কি হবে, টাকা জমিয়েই বা কোন্‌ লাভ ? তা'হলে টাকা বোঝাই সিন্দুক, গোলাভরা ধান, বাগান ভরা গোরু-মহিষ, চাষের জমি, গোরু চরাবার মাঠ, কল, নদী, বন এসব কোন্‌ কাজে আস্‌বে ?

কিন্তু এ নিয়ে আরবাস্‌ কোনদিন তার স্ত্রী বা অন্য কারো কাছে কোনো অনুযোগই করেনি বা, এই সম্পর্কে কখনো কোনো কথা উঠ্‌লে তার মুখে ভাবান্তরও দেখা যায়নি। সারা বছরে এ নিয়ে সে কোনো শক্ত কথা কাউকে বলেনি বা কাটা কাটা প্রশ্নও কাউকে করেনি।

কিন্তু মাসে একবার ক'রে সে তার অনুসন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে স্ত্রীর সমস্ত দেহে চোখ বুলিয়ে নিত। মাঠে কাজ করতে করতে হয়তো সে এইভাবে তার স্ত্রীকে দেখতো, কিংবা আঁটি বাঁধতে বাঁধতে কিছুক্ষণ তা বন্ধ রেখে একদৃষ্টে চেয়ে থাকতো তার দিকে। অথবা, কোনদিন রাত্রে হঠাৎ স্ত্রী ঘুম ভেঙে দেখতে পেত যে, তার স্বামী কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে তাকে দেখছে অপলক নয়নে কিংবা কোনদিন গির্জার সামনে পার্কের ধারে দাঁড়িয়ে সে হয়তো আরও দু'একজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা বলছে, হঠাৎ মাঝপথে তার সে কথা থেমে যেত, সে দেখতে পেত তিন পা দূরে দাঁড়িয়ে

তার স্বামী তারই দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। কিন্তু কখনো কোনো রাগ নেই, ভয় দেখানো নেই, তিরস্কারের কোনো চিহ্নই নেই। শুধু একটি পুরুষ তার লোমশ ভুরুর তলা দিয়ে একদৃষ্টে চেয়ে থাকতো তার স্ত্রীর দিকে নীরবে, কি যেন সে খুঁজে বেড়াত তার সর্বদেহে।

প্রত্যেক মাসেই একটা কিছু ঘটার আশায় সাগ্রহে সে প্রতীক্ষা করতো। প্রথম প্রথম স্বামীর ঐ রকম আচরণে স্ত্রী একটুও বিচলিত হ'তো না, ভাবতো ওটা তার একটা খেয়াল মাত্র। তা নিয়ে অত শত মাথা ঘামাবার কোনো প্রয়োজন সে দেখতো না! হাসিখুশি দিয়ে তাকে আনন্দ দেবারই চেষ্টা করতো। ক্রমে এমন সময় এলো, যখন সে স্বামীর দৃষ্টিকে আড়াল ক'রে দাঁড়াতো, এবং সমস্ত ব্যাপারটাকে মন থেকে মুছে ফেলবার চেষ্টা করতো। কিন্তু ধীরে ধীরে এমন হয়ে দাঁড়ালো যে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা এমন কি সারাদিন ধরেই সে এই নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু ক'রলো, আর ভেবে ভেবে অবাক হ'তে লাগলো যে, কেন এমন হচ্ছে! স্বামীকে এ নিয়ে সে সামনাসাম্‌নি কিছু বল্‌তে পারতো না, কিন্তু তার ছায়ামূর্তিকে সে প্রশ্ন করতো—কেন সে অমন ক'রে চেয়ে থাকে!

সারাক্ষণ এই হ'লো তার ধ্যান-জ্ঞান, সব কিছু। মানুষ কি মনের কথা পরস্পরের কাছে খুলে বলে না! মনের কথা সে যদি নাই বলে, তবে কেন ভগবান তাকে কথা বলার শক্তি দিয়েছেন! সে ঠিক করলো, স্বামীকে সব কথা খোলাখুলিই জিজ্ঞাসা করবে। অথচ কথা বলার সুযোগ যখন আসতো, সে হয়তো তার দিকে এগিয়েই যেতো, কিন্তু তার সমস্ত সাহস বাষ্পের মতো কোথায় যেন উবে যেতো এক মুহূর্তে। তার মনে হ'তে লাগলো—সেই যেন অপরাধ করেছে! কি যেন সে বলতে চাইতো, কিন্তু তার মুখ দিয়ে বাক্যস্ফুরণ হ'তো না। এটা সে

বুঝতো যে, সে অপরাধী নয়। কিন্তু তার মধ্যে এমন একটা কিছু নিশ্চয়ই আছে যেটা তার পক্ষে মস্ত দোষের।

ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সব কিছুই স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আস্‌ছে, কিন্তু মনের শান্তি যেন নিঃশেষ হ'য়ে চলেছে ধীরে ধীরে। স্বামীর সেই অপলক-নয়নে চেয়ে থাকা, তার সমস্ত চিন্তাকে দিতো অবশ ক'রে। তার সেই অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে, রক্তে জাগতো চঞ্চলতা। তা যেন তার অপরাধকেই বেশি ক'রে স্মরণ করিয়ে দিতো। নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত দেওয়াল আর ছাদে ঢাকা ছোট্ট ঘরখানিতে সে যেন ক্রমশই হাঁপিয়ে উঠ্‌তো। ঘরের বাতাস হ'য়ে উঠ্‌ত ভারী, আকাশ যেন ভেঙে পড়তে চাইতো জানালার শার্সিতে, তার সর্বাঙ্গ ঘিরে ভিজে কাপড়ের মতো সন্ধ্যা নেমে আসতো ক্রমশ। কাঠের ওপরে ঝুল্‌তো যতো শুকনো আর ময়লা কাপড়। সার বেঁধে চল্‌তো গোরুগুলি। আর দুধারের বরফে ঢাকা পথ দিয়ে হাতে লণ্ঠন ঝুলিয়ে চল্‌তো এক গর্ভবতী পরিচারিকা। চারিদিকে যেন ছড়িয়ে পড়তো আলোর রামধনু।

দুটি জিনিসের অস্তিত্ব সে বুঝতে পারতো। তার একটি হ'লো তার দেহ আর দ্বিতীয়টি তার আতঙ্ক। আঠাশটি দিনরাত্রি একই ভাবে কেটে যেতো। যথাসময়ে তামাকের পাইপ্‌টা মুখে নিয়ে তার স্বামী আরবাস এসে বস্‌তো জ্বলন্ত চুল্লির পাশে। তারপর তার নিয়মিত সময়টিতে চ'লে যেত সরাইখানায়। সেখান থেকে ঠিক সন্ধ্যা লাগতেই বাড়ি ফিরে আসতো। তারপর আবার স্টোভের ধারে ব'সে খবরের কাগজ পড়তো। সান্ধ্য ভোজের খাদ্য হিসাবে যখন বাঁধাকপির ঝোল আর অন্যান্য খাবার তার সামনে দেখা দিতো, তখন সে উঠে পড়তো। খাওয়া শেষ হ'য়ে গেলে ঈশ্বরের নাম নিয়ে সে বিদায় নিত। কেউ যদি কোনো কথা বলতো, সে নীরবে তা শুনতো। তার আচার-ব্যবহারের কোথাও কোনো

গোপন ভাব ছিল না; মনের মধ্যে যে অসন্তোষের মেঘ জমে উঠ্ছে এমনটিও কখনো প্রকাশ হ'তো না। কেবল একটা অবিচ্ছিন্ন, অখণ্ড স্তব্ধতা যেন তার চতুর্দিকে বিরাজ করছিলো।

তারপর সেই নিদারুণ দুঃসময়ের আবির্ভাব। আরবাসের স্ত্রী তার দেহের অস্থি-পঞ্জরের মধ্য দিয়ে, এমন কি তার চুলের গোড়া দিয়ে পর্যন্ত যেন সেই অবস্থা বুঝতে পারতো।

দরজাটা খুলে গেল। ঐ তার স্বামী রয়েছে দাঁড়িয়ে। সকালে, দুপুর রাতে, বৈঠকখানায়, শস্য ঝাড়বার রোয়াকে—সবখানেই ঐ একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি, সেই সুগভীর মর্মভেদী দৃষ্টি নিয়ে সবখানে সে অপেক্ষা করছে। কণ্ঠে তার ভাষা নেই, কোথাও কোনো ইসারা নেই, কোনো কথা নেই—শুধু সেই চাহনি। সেই চাহনি যেন বল্‌তে চায়—ওগো কেন এই নিষ্ফলতা? অন্য সবার বেলায় যার সাফল্য, তোমার বেলায় কেন তার ব্যতিক্রম? তোমার ক্ষেত্র কেন উর্বরা নয়?

এইভাবে কেটে যায় বারটি বছর, নিঃশেষিত হয়ে যায় চাষী-বৌএর মনের সকল জোর। সে ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ে। রাত্রে তার ঘুম আসে না, বিছানায় খালি ছট্‌ফট্ করে। অন্ধকারেও যেন তার স্বামীর চোখদুটি জ্ব'লে ওঠে, ঘুমিয়ে থাকলেও তার যেন মনে হয় তার স্বামী চেয়ে আছে তার দিকে।

দিনের বেলায় যখনি সে তার স্বামীর পদধ্বনি শুন্‌তে পেতো তখনি স'রে দাঁড়াতো এক পাশে। যতক্ষণ না তার স্বামীর হাঁকডাকে চতুর্দিক প্রকম্পিত হ'তো ততক্ষণ সে সেইখানেই আতঙ্কে শুধু কাঁপতো। ঘরকন্নায় তার আর মন রইল না। ধীরে ধীরে চাকরবাকরেরাও কাজকর্মে অমনোযোগী হ'য়ে উঠ্‌লো।

তার কুণ্ঠা হ'তো স্বামীকে দেহ দান করতে; স্বামীর আলিঙ্গনের

মধ্যেও সে ভয়ে কাঁপতো। সে ভাবতো, সে যদি দেহদানে অস্বীকার করে, তা'হলে তার স্বামীর আর দাবী করবার থাকবে কি? কিন্তু স্বামীর স্পর্শে তার মন বিরূপ হ'য়ে উঠ্‌তো, তার শরীরের রক্ত যেন ঠাণ্ডা হ'য়ে যেতো। তার দেহ যে নারীদেহ, এ বোধশক্তি যেন সে হারিয়ে ফেলতো।

আব্‌বাস্ তখন অন্যভাবে তার প্রেম জানাতে শুরু করে। এ ভাবটি তার স্ত্রী আগে আর কোনদিন লক্ষ্য করেনি। তার এ নতুন প্রেম সে কথা দিয়ে জানায়নি, সশঙ্ক চিত্তে উপহার এনে দিয়ে তার মনে অনুরাগ জন্মাতে চেষ্টা করেছে। তার এই প্রেম নিবেদনের মধ্য দিয়েই তার হৃদয়াবেগ প্রকাশ পেতো। আব্‌বাস্ মনে মনে ভাবতো, তার স্ত্রী যেন নিজেকে তার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে চায়। কিন্তু তাকে সে খুঁজে নেবেই। সে যেন তার স্ত্রীকে অনুসন্ধান ক'রে ফেরে, কিন্তু তার কোনো নাগালই সে পায় না। সে তখন হ'য়ে উঠ্‌লো ক্লিষ্ট পশুর মতো।

এমনি ক'রে কেটে গেলো প্রায় একটা বছর। ধীরে ধীরে আব্‌বাসের স্ত্রীর আতঙ্কও গেলো দূরে স'রে। তার মনে হ'লো সে আর এখন নিপীড়িত জীব নয় যে, স্বামীর কথা মতো তাকে উঠ্‌তে হবে, বস্‌তে হবে অথবা, স্বামীর ইচ্ছামতো সে বর্ধিত হবে, তার প্রয়োজন মতো তার অঙ্কশায়িনী হবে অথবা, স্বামীর খেয়ালখুশি মতো সে এখন তার প্রহার সহ্য করবে।

এইবার যেন সে তার নিজের মূল্য বুঝতে পারলো। একথাও সে বুঝলো যে, তার স্বামীর অন্যভাবেও তাকে প্রয়োজন আছে। সে প্রয়োজনে তার স্বামী তাকে সম্মান ও গৌরব দান করতে বাধ্য। মনের এই ভাব-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সে নিজের ইচ্ছায় স্বামীর দিকে ফিরে তাকালো। এক মাস পরেই আরবাসের স্ত্রী সন্তানসম্ভবা হ'লো।

এ বিষয়ে যখন আর কোনো সন্দেহই রইলো না, তখন তার সর্বশরীরে অদ্ভুত এক পরিবর্তন দেখা দিলো। যুবতীর মতো চপল পাদবিক্ষেপে সে ঘরময় এবং তার চতুর্দিকে ঘুরে বেড়ায়। হুকুমের পর হুকুম চালিয়ে অলস চাকরবাকরদের সে কাজ করাতে সুরু করে। ঘরকন্নার সমস্ত কাজ সে নিজের হাতে তুলে নেয়। সে হ'য়ে ওঠে মুখরা ; আনন্দে আর উৎসাহে সে যেন লাবণ্যময়ী রূপ ধারণ করে। তার রকম দেখে সবাই অবাক হয়ে যায়। আর্‌বাসও পরম কৌতূহলী হয়ে ওঠে। তার ভাণ্ডারে এতকাল কি জমে ছিল, যা সে অকপট হৃদয়ে তার স্বামীকে জানাতে চায়নি। তার ইচ্ছা হ'লো সে একটা উৎসবের আয়োজন করে। কেননা সে এবার তার স্বামীকে অমূল্য এক উপহার দিতে চলেছে।

বৃহস্পতিবার। ভালো দেখে সে সাজ পোশাক পরলো। রুপোর ক্লিপ দিয়ে মাথার টুপি দিলো এঁটে। তারপর সে তার স্বামীকে ডেকে আন্‌লো উপরতলাকার এক ঘরে। সেখানে আলমারিভরা ছিলো রুপোর ও চিনেমাটির নানান্ জিনিস। এই বংশের বহুদিনকার সম্পদ্‌রূপে সেগুলো এতকাল সযত্নে সংরক্ষিত হয়ে এসেছে। আরাম কেদারায় ঠেসান দিয়ে সে তার দুই হাত কোলের উপরে রেখে গম্ভীর হ'য়ে বস্‌লো। তারপর তার বক্তব্য খুব সংক্ষেপে এবং সরলভাবে তার স্বামীকে বলতে লাগলো।

স্ত্রীর কথা শুনে আর্‌বাসের সমস্ত শরীরটা একবার থর্‌থর্ ক'রে কেঁপে উঠ্‌লো। উনিশ বছর পরে যখন আর্‌বাস্-গৃহিণী এই দিনকার ছবিটি, সেই সঙ্গে তার স্বামীর উত্তেজনার কাহিনী বর্ণনা করছিল, তখন তার দিকে চেয়ে মনে হচ্ছিল সে যেন বহুদিন পূর্বেকার সেই বিশেষ ক্ষণটিতে আবার ফিরে গিয়েছে। মানসিক চঞ্চলতায় আর্‌বাসের মাটির মত ধূসর মুখখানি একেবারে রাঙা হয়ে উঠ্‌লো। একটু পরেই সে হেসে উঠ্‌লো

হো হো ক'রে। চোখ দিয়ে তার গড়িয়ে পড়লো ফোঁটা ফোঁটা অশ্রুবিন্দু। ভারী ভারী পা ফেলে সে এগিয়ে গেল তার স্ত্রীর দিকে। তারপর, তার কাঁধ ধ'রে এমন শক্ত একটা ঝাঁকানি দিলো যে, সে চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো বেদনায়। তার এই রকমের আদরটা তার স্ত্রী বুঝতে পারলো না দেখে আব্রবাস যেন একটু ক্ষুণ্ণ হ'লো।

সে তখন ধীরে ধীরে আদর ক'রে তার পিঠ্‌ চাপ্‌ড়াতে থাকে, আর অবাক-চোখে চেয়ে চেয়ে দেখে তার মুখখানি। তার কণ্ঠে তখন যেন সুর বাজ্‌ছে, বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনির মতো।

আব্রবাস তার স্ত্রীকে বল্‌লো—"এখন থেকে তুমি তোমার শরীরের দিকে বিশেষ ক'রে নজর দেবে, সাবধান হবে খুব।" গোপনে সে গেল ডাক্তারের কাছে পরামর্শ নিতে। তারপর সে একজন অতিরিক্ত পরিচারিকাকে নিযুক্ত করলো, তার স্ত্রীকে সমস্ত কাজকর্ম থেকে রেহাই দেবার জন্যে। স্ত্রীর প্রতি তার দৃষ্টি রইলো, সর্বক্ষণ সজাগ। কখনো যদি তার পায়ের কাছে কোনো জিনিস দেখলো, অমনি সে ছুটে এসে সেটাকে সরিয়ে দিতো দূরে। ভাবী সন্তানের জন্যে যখন জামা সেলাই হচ্ছে, আব্রবাস্ তখন বসে আছে স্ত্রীর পাশটিতে, গোল গোল চোখ দিয়ে দেখছে তা, মাঝে মাঝে মাথাটা নড়ে উঠ্‌ছে তার। এমনি ক'রে সময় কেটে গেলো নিয়মিতভাবে, প্রসবের দিন ঘনিয়ে এলো। নবজাত শিশুটিকে সে অনেকক্ষণ ধ'রে কোলে ক'রে রইলো; আনন্দ আর ভয় মেশানো দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো সেই ক্ষুদ্র মাংসপিণ্ডের দিকে।

অন্যান্য চাষীর ছেলের মতো সাইমনও ধীরে ধীরে বেড়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো, সহজে সে পেত' না কিছুই। তাকে জানতে দেওয়া হ'তো না তার অদর্শনে তার বাপ-মা কি অধীর-আগ্রহে তার প্রতীক্ষা করে। আত্মীয়-স্বজনের কাছে তাকে প্রমাণ ক'রতে হবে তার মূল্য, নিজের

অধ্যবসায় আর পরিশ্রম দিয়ে। তার কোনোরকম ছেলেমানুষীকে কেউ আমোল দিতো না কোনো দিন। ছেলেবেলাকার এই কষ্টকে মনে করা হ'তো ঈশ্বরের পরীক্ষা,—তুমি বংশের যোগ্য কি অযোগ্য তা প্রমাণ ক'রে দেখাতে হবে এইভাবে।

বিচক্ষণ কোনো লোক দেখলেই বুঝতে পারতেন যে, আব্রাস সর্বক্ষণ অশান্ত হৃদয়ে ছেলের দিকে দৃষ্টি রেখেছে। সে যেন তার ছেলের নাড়ীর স্পন্দন পর্যন্ত অনুভব ক'রছে। তার এই ব্যাকুল পর্যবেক্ষণের পরিশ্রম যেন তার নিজের প্রকৃতির উপরেও ছাপ রেখে গেল। আকুলভাবে চেয়ে চেয়ে তার কপালে কুঞ্চিত রেখা দেখা দিলো শেষটায়। যদিও সে এমনভাব দেখাতো যে, সাইমনের কোন কিছুতেই তার লক্ষ্য নেই, কিন্তু সেটা ভুল, সেটা মিথ্যা-ভাব। যা যা ঘটে যাচ্ছে সেদিকে তার যে কি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রয়েছে, সেকথা কেউ টের পেতো না। ঘটনাক্রমে আমি সমস্ত সত্য ঘটনাই জানতে পেরেছিলাম এবং এমনভাবে তা জেনেছিলাম যা ভুলবো না কোনোদিন। আমি যা সত্যি জেনেছি, আজ তাই প্রকাশ করছি লেখার মধ্য দিয়ে।

পিতা-পুত্রের সম্পর্ক কি মহান্, সে আদর্শ কত উঁচু—আব্রাসের সমস্ত অস্তিত্বের মধ্য দিয়ে যেন এই উপলব্ধি সঞ্চারিত হয়েছিল। সে জানতো, সে কৃষক—তার মানেই হ'লো সে রাজা। মাটি তার নিজের মাটি। গোলাবাড়ির চাকর-চাকরাণী সব তার আজ্ঞাধীন।

ঋতুচক্র আবর্তিত হচ্ছে বছরে বছরে, তার জমিতে ফসল ফলানোর জন্য। সে তার সমস্ত জমির একচ্ছত্র অধিপতি! চোখ দুটি তার চেয়ে থাকতো জমির চতুঃসীমানায়, পূর্বপুরুষদের আমলে যা ছিল, এখনো ঠিক তেমনি আছে। কোনো নড়্‌চড়্‌ হয়নি তার। তার ক্ষেতে কোনো কিছুই জন্ম নিচ্ছে না তার নাম না নিয়ে। আব্রাস্ ভাবতো—সব

জিনিসের সেরা হলো সম্পত্তি, সবচেয়ে পবিত্র তা। আর সে-সম্পত্তির অর্থই হ'লো যে, তার একজন মালিক আছে, সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ ক'রবে সে, শেষ পর্যন্ত রক্ষা ক'রবে তা, একটি শস্যকণাও অযথা নষ্ট হ'তে দেবে না। ছেলে তার বাপের কাছ থেকে বুঝে নেবে এই সম্পত্তি, আর বাপও তার ছেলেকে বুঝিয়ে দেবেন কড়ায় গণ্ডায়। এইভাবেই চ'লে আসছে সব, এইভাবেই ঘটে যাচ্ছে যতকিছু—অন্য কোনো দুনিয়া ভাবতেও পারা যায় না এ ছাড়া।

কিন্তু কি কথায় আমি কোথায় চ'লে এলাম। গল্পের সূত্র আমি হারিয়ে ফেলছি।

আমার কর্তব্য হিসেবে, এ-বিষয়ে আরবাস্‌কে অনেক প্রশ্ন ক'রেও বিশেষ কিছু জানতে পারিনি। সব সময় সে একই উত্তর দিতো। বারবার একই প্রশ্ন ক'রলে সে ক্লান্তিবোধ করতো, বিরক্ত হ'তো। সংক্ষিপ্ত সেই ঘটনার কথা ছাড়া, সে আর কিছুই ব'লতো না। তার পক্ষ নিয়ে কোনো কথা বলাও সে পছন্দ করতো না। তার নিজের উকীলের কথাও সে শুনতো না। আর আমার উপদেশ ও ইঙ্গিতেও সে নির্বিকার ছিলো! আমি যখন তাকে ব'লতাম, তার এই অপরাধের প্রকৃত কারণ সে যদি খুলে বলে তা'হলে তার লঘু দণ্ড হবে, তখন সে নির্লিপ্ত-স্বরে জবাব দিত কম শাস্তি সে তো চায় না। আমি আর এ ধরনের নিষ্ফল প্রশ্ন করব না ব'লে ঠিক ক'রলাম। কেননা, সাক্ষ্য প্রমাণে নিহত লোকটি ও তার আততায়ী সম্পর্কে যা যা জানা গিয়েছে, তা থেকেই এই হত্যার উদ্দেশ্য স্পষ্ট বোঝা যায়।

কিন্তু দুটি বিষয়ের উপর তখন পর্যন্তও কোনোরকম আলোকপাত করা যায়নি। প্রথমতঃ করোণারের বিবরণ থেকে জানা যায় মৃতদেহের কোথাও কোনরকম বলপ্রয়োগের চিহ্ন ছিল না। মৃদুশীতল তার

শক্তদেহে, কিংবা তার পোষাক-পরিচ্ছদে, কিংবা তার মৃত্যু-পাণ্ডুর মুখের ভাবেও ঐ রকম কোনো চিহ্ন দেখা যায়নি। আরবাস্ যদি না তার অপরাধ স্বীকার ক'রতো তা'হলে এটা যে আত্মহত্যা নয়, খুন, সেটা প্রমাণ করা শক্ত হ'য়ে দাঁড়াতো। দ্বিতীয়তঃ ছুরিটা হ'লো সাইমনের নিজের। আরবাস্ কিন্তু বেশ জোর দিয়েই ব'লেছিল যে ছুরিটা তার কোমরবন্ধেই ছিল, সে বের ক'রে নিয়েছে। অবিশ্যি একথাটা সে বলেছিল বারবার তাকে বলবার জন্যে চাপ দেওয়া হয়েছিল ব'লেই। কিন্তু আসলে তা ঠিক নয়। আরবাসও বুঝেছিল একটা অবিশ্বাস্য কথা ব'লে ফেলেছে। তাই পরদিন সে নিজের কথাটা উল্টে নিয়ে ব'লেছিল, যে, সাইমন ঐ ছুরিটা দিয়েই সেদিন রুটি কেটেছিল, আর সেটা পড়েছিল টেবিলের ওপরেই খোলাভাবে। এই রকম গুরুতর ব্যাপারে তার দু'রকম কথা শুনে আমি যখন বিস্ময় প্রকাশ ক'রলাম, তখন সে সসঙ্কোচে মাথা নীচু ক'রলো। এই একবারই সে যেন কিছু মুস্কিলে পড়েছে ব'লে আমার মনে হ'লো।

আমি শুধু ভাবতে লাগলাম, কি ক'রে তার নির্বাক কণ্ঠ থেকে কথা আদায় করতে পারি। সব সময় আমি সেই কথাই ভাবতে লাগলাম। এই মামলায় সে রকম কোনো জটিলতা নেই, অথচ এর কথা আমি ক্ষণকালের জন্যেও ভুলতে পারছি না, এই মনে ক'রে আমি চঞ্চল হ'য়ে উঠ্লাম। নিজের ওপরেই যেন কেমন রাগ হ'তে লাগলো। আমার অন্তরে অন্তরে কে যেন সর্বক্ষণ আমাকে জানিয়ে দিচ্ছিল—এ লোক কখনোই খুনী নয়। যে লোক মুরগী জবাই করবার মতো মানুষের গলা কাটতে পারে, যে তার নিজের ছেলেকে এমন নিষ্ঠুর ও পৈশাচিক ভাবে হত্যা ক'রতে পারে—এ সে জাতীয় লোকই নয়। তবু নিজের মুখে সে তার অপরাধ স্বীকার করেছে! তাহ'লে সত্যি ক'রে কি ঘটেছিল?

সে কতক্ষণ তার ছেলের কামরায় কাটিয়েছিল একথা তাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে কোনো উত্তর দেয়নি, হয় তো বা কাঁধ দুটো একটু ঝাঁকানি দিয়েছিল। শেষ বারের মতো তাকে জেরা করবার সময়, সে নেহাৎ অনিচ্ছার সঙ্গেই বলেছিল যে, সে আধঘণ্টাটাক হয়তো সে-ঘরে কাটিয়ে থাকবে। সেই আধ-ঘণ্টার মধ্যে তাহ'লে কি ঘটেছিল? আমার এই চিন্তিত হবার কারণ সে বোধ হয় আন্দাজ করতে পেরেছিল,—তাই তার ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠ্‌লো।

ঠিক ক'রলাম আমি যদি এই অসহনীয় মানসিক অশান্তি থেকে মুক্তি পেতে চাই, আমাকে তাহ'লে এইবার জজ্রীয়তির আচরণ ত্যাগ করতে হবে, মানুষ যেমন মানুষের সঙ্গে মেশে আমাকেও তেমনি ক'রে মিশতে হবে ওর সঙ্গে। আমার মনে হ'লো আমি যেন তার মনে কিছুটা বিশ্বাস জন্মাতে পেরেছি। এমন অনেক বিষয় ছিল, সেগুলো তার কাছে মোটেই প্রীতিপ্রদ নয়, অথচ সেগুলো তাকে জিজ্ঞাসা না ক'রেও পারা যায় না। মাঝে মাঝে আমি সেগুলি তাকে এমন সুরে জিজ্ঞাসা ক'রতাম, যার জন্যে তার চোখে মুখে একটা কৃতজ্ঞতার ভাব ফুটে উঠ্‌তো। যাই হোক, খোলাখুলি এমন ক'রে তার সঙ্গে আলাপ ক'রতে আমি প্রথম প্রথম দ্বিধাবোধ করতাম। কারণ, আমার মনে হ'তো, আমার মত ভিন্ন জগতের লোককে তার এই ব্যাপারে নাক গলাতে দেখে, জন্মগত সন্দিগ্ধ-প্রকৃতির বশে সে হয়তো আরও সতর্ক হ'য়ে উঠ্‌বে।

আমার মনে হ'তো আমাদের মধ্যে এমন কোনো সাধারণ গুণ নেই যাতে ক'রে তার ও আমার মতো দুই বিপরীত-ধর্মী লোকের খানিকটা মিল হ'তে পারে। কিন্তু তার সম্বন্ধে ভাবতেই আমার মন থেকে এরকম সন্দেহ দূর হ'লো। আদম আরবাস তো সাধারণ কৃষক নয়। সে আমাদের অভিজাত কৃষক-সম্প্রদায়েরই একজন। তার হাবভাবেই তার

বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ পেতো, চরিত্রগত-বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠ্‌তো তার চলাফেরায়। আমি মনে মনে তাই আশা করেছিলাম যে, আমার উদ্দেশ্য হয়তো ব্যর্থ হবে না। আমি আর ও নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে ডিসেম্বরের এক সন্ধ্যায় জেলখানায় গিয়ে উপস্থিত হ'লাম, সোজা গিয়ে ঢুকলাম আরবাসের সেলে।

কয়েদ থাকা অবস্থায় সে যাতে ভালোভাবে থাকতে পারে আমি তার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিলাম। সেলটা বেশ থাকবার মতই। তাছাড়া হাত মুখ ধোবার স্ট্যাণ্ড, বিছানা আর আয়না দিয়ে বেশ ক'রে তা সাজানো হয়েছিল। ঘরখানা বেশ তাপযুক্তও ছিল। আলোর সামনে সে বাইবেলখানা খুলে ধ'রে বসেছিল। আমি ঘরে ঢুকেই তাকে শুভেচ্ছা জানালাম। তারপর গায়ের কোট্‌টা খুলে ফেলে একটা পেরেকে টাঙিয়ে রেখে, টেবিলের বিপরীত দিকটায় তার মুখোমুখি হ'য়ে বস্‌লাম।

যতবারই তাকে আমি দেখেছি, প্রত্যেকবারই তার চেহারা আমাকে নতুন ভাবে আকৃষ্ট করেছে। এবারেও তাই হ'লো। ষণ্ডামার্কা বলিষ্ঠ তার চেহারা। খাঁটি ফ্রাঙ্কোবাসীব মতো গোলাকার তার মাথাটি। কিন্তু তার মাথার খুলিতে, বিশেষ ক'রে তার কপালের গঠনে বহু প্রাচীন বংশের চিহ্ন পরিস্ফুট। সেখানকার হাড় এতো সরু যে তা লক্ষ্য করবার বিষয়। তাছাড়া, সেখানকার চামড়া নীলাভ হলুদ রঙের, আর প্রায় স্বচ্ছ। তার মুখটা বেশ বড়, ঠোঁট দুটো পাতলা অথচ কঠিন, নাকটা বেশ উঁচু। তার সযত্নে কামানো মুখখানি দেখলে হয়তো সেকালের কোনো অভিনেতার কথাই মনে পড়ে যাবে। তার হাতদুটি যেন দানবের হাতের মতো। তার চোখের পাতা বেশ পুরু। প্রায় সময়ই চোখদুটি অর্ধ উন্মীলিত থাকতো। কিন্তু যখন সে পূর্ণ দৃষ্টি মেলে চাইতো, তখন তা

অদ্ভুত ভাবে মর্মে গিয়ে বিঁধ্‌তো। আমার পক্ষেও সে দৃষ্টি সহ্য করা কঠিন হ'য়ে দাঁড়াতো।

ভূমিকা করতে গিয়ে আমি বল্‌লাম—"তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে অনেক দিন থেকেই আসব আসব করছি। যাইহোক আমি যে আজ এসেছি সেটা সরকারী ভাবে নয়। বরং তুমি যদি না কিছু আপত্তি করো তা'হলে বলব, আমি বন্ধু হিসেবেই এসেছি। তোমাকে দেখবার জন্যে এ সুযোগ-সুবিধা আমার হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এখন আমি তোমার অভিভাবক—তোমার ভালমন্দের জন্য এখন আমি দায়ী।

সে নীরবে কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইলো। তারপর বল্‌লো—"আপনার অসীম অনুগ্রহ।"

তার কথায় আমি প্রতিবাদের সুরে বল্‌লাম—"না না ঠিক ও ভাবে তুমি আমাকে গ্রহণ ক'রো না। আমার অনুরোধ তুমি আমাকে বিশ্বাস করো। সাধারণতঃ এ অবস্থায় বিচারককে লোকে সন্দেহের চোখেই দেখে। তুমি হয়তো ভাবছ, আমি যদি এখানে তোমার শেষ জবানবন্দী নিতে না এসে থাকি, তাহ'লে নিশ্চয়ই কৌতূহলী হ'য়ে এসেছি তোমার নিজের ব্যাপারে মাথা ঢোকাতে। কিন্তু কোনটাই সত্যি নয়। মোকদ্দমার কাগজ-পত্র সব তৈরী হয়ে গেছে। আমরা এখন বিচারের জন্যে প্রস্তুত। আমার কৌতূহলী হবারও কোনো কারণ থাকতে পারে না; কেননা, আমার মনে হয় যা জানবার, আমরা তা সবই জানতে পেরেছি। কেন যে আমি এসেছি, তা আমি নিজেই জানিনা। কিন্তু তবু আমাকে আসতে হয়েছে। আমার মনে হয়েছে এখানে আসা আমার কর্তব্য।"

আর্‌বাস্‌ অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইলো। পরে বল্‌ল—"আমি আপনাকে বিশ্বাস ক'রছি।"

তার কথার সূত্র ধ'রে আমি বল্‌লাম—"আমাকে যদি বিশ্বাসই কর,

তাহ'লে আমরা তো দুটি পুরানো বন্ধুর মত বেশ হৃদ্যতার সঙ্গেই যা যা ঘটেছে তা নিয়ে আলোচনা ক'রতে পারি ?"

আবুবাস্ কিছুক্ষণ ভাব্‌লো। তারপর বল্‌লো—"আর ও নিয়ে আলোচনা ক'রে লাভ কি ? ঘটনাটা যে ঘট্‌লো সেইটাইতো যথেষ্ট দুর্ভাগ্যের বিষয়।"

আমি বেশ জোর দিয়েই বল্‌লাম—"সেইটাই তো প্রশ্ন। সত্যিই কি ঘটেছে ? সত্যি ?"

সে মাথা উঁচু ক'রলো, কিন্তু দৃষ্টি তার নিচের দিকে। সে বল্‌ল—"এ ঘটনা সম্পর্কে সন্দেহ করা মানে গোয়ার্তুমি ছাড়া আর কিছু নয়।"

আমি তবু তাকে বেশ জোর দিয়েই বল্‌লাম—"সন্দেহ তো আছেই। কিন্তু সত্যি হ'লেও সমাজ তোমার এই কাজকে অনুমোদন ক'রবে না, ঘৃণার চক্ষে দেখবে। প্রত্যেক মানুষই যদি এই রকম ব্যাপারে নিজের ইচ্ছা মতো দণ্ড দিতে চায়, সংসারে তাহ'লে আর ভীতির সীমা থাকবে না। আমাদের তাহ'লে বোধ হয় বন্য পশুর দ্বারা সীমাবদ্ধ হ'য়ে বাস ক'রতে হবে ! আমি বুঝতে পারছি না, কি ক'রে তুমি তোমার এই কাজকে নিজের কাছে এবং তোমার সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক সেই ভগবানের কাছে ন্যায়সঙ্গত ব'লে প্রতিপন্ন করবে ! সে যাই হোক, সমাজের কাছে তোমায় জবাবদিহি ক'রতেই হবে।"

আবুবাস মাথা নাড়্‌লো। নিতান্ত নির্লিপ্ত ভাবে বিড়্‌বিড়্‌ করে সে বল্‌ল—"শুধু কথায় কি আসে যায় ?"

আমি বল্‌লাম—"তোমার ও সমাজের মধ্যে সমস্ত গ্লানি ধুয়ে মুছে পরিষ্কার ক'রতে হবে। যতক্ষণ না তুমি তোমার এই বিস্ময়কর মৌনতা ভঙ্গ ক'রছ, ততক্ষণ যে ঘটনার ভয়ঙ্করতা ও জটিলতা থেকেই যাবে।"

—"কিন্তু কোন মানুষ যদি সবকিছু বুঝিয়ে বলার মতো কথা খুঁজে না পায়, তাহ'লে সে কি করতে পারে?"

আমি ঠাট্টার সুরে বল্লাম—"সত্যিই কি তার কথা জোগাচ্ছে না? না, সে তার অহঙ্কার ও নিজের জিদের বশেই কোন কিছু বল্ছে না? তুমি নিজের অন্তরের দিকে একবার তাকিয়ে দেখ তো?"

সে বল্লে—"আমার জিহ্বায় জড়তা আছে। আমি ভালো করে সব গুছিয়ে বল্তে পারি না।"

তার কপাল কুঞ্চিত হ'য়ে উঠ্লো! আমার মনে হ'লো, তাকে আর পীড়াপীড়ি করা ঠিক হবে না। চুপ ক'রে আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। অবশেষে তার বুকের মধ্যে যেন একটা চাপা কান্না গুম্রে উঠ্লো—"আমিই তাকে জন্ম দিয়েছিলাম।" তার দৃষ্টি আনত হ'লো। "আমিই কি আবার তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেল্তে পারি না?" কথা বল্তে গিয়ে তার মুখে চোখে একটা বিস্ময়কর অভিব্যক্তি ফুটে উঠ্লো। সে ব'লে চল্লো—"আপনার খুশি মত আপনি সব কিছু ধারণা ক'রে নিতে পারেন না! মানুষ যা তৈরী করে, যদি মনে হয় তা খারাপ কাজ করবার জন্যেই সৃষ্ট হয়েছে, তাহ'লে তাকে নষ্ট করতেও তার বাধে না। তাকে পাওয়ার জন্যে আমি বহু চেষ্টা করেছি। তার মাতৃগর্ভ থেকে আমি যেন তাকে খুঁড়ে বের করেছি। অন্য স্ত্রীরা নয় মাস সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে। কিন্তু তার মা তাকে তের বছর গর্ভে ধারণ করেছিল! এ কথা মিথ্যা নয়। আমি জেদ করেছিলাম, সে আমার স্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করুক, বার বার আমি ভগবানকে ডেকে ব'লেছিলাম—তাকে পাঠিয়ে দাও। সে জন্মাবার আগেই আমি তার সম্বন্ধে সব ঠিক ক'রে রেখেছিলাম। সে আমার এমনটি হবে, তেমনটি হবে—কত কল্পনাই না তখন ক'রেছি! ঠিক যেন আপনি এক তাল মাটি নিলেন তুলে—আপনার মনের ইচ্ছা মত

তাকে রূপ দেবেন ব'লে! কিন্তু কিছুক্ষণ পরে হয়তো আপনি দেখতে পেলেন, আপনার হাতে কাদার ঢেলা ছাড়া আর কিছুই নেই। আপনি তখন সেই মাটির ঢেলাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবেন মাটিতেই,—যেখান থেকে তাকে একদিন তুলে নিয়েছিলেন।"

তার কথা বলার ভঙ্গী যেন আরও গভীর হয়ে উঠ্‌লো। অর্ধউন্মীলিত চোখে সে যেন আমাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যাচাই ক'রে নিচ্ছিল।

আমি বল্‌লাম—"তুমি বুঝি ধীরে ধীরে টের পেলে সে অধঃপাতের পথেই যেতে বসেছে?"

অসহিষ্ণু ভাবে সে আমার কথায় বাধা দিয়ে বল্‌লো—"প্রথম থেকেই খারাপ। দূষিত রক্ত। আমি নাক দিয়েই সে গন্ধ টের পেতাম। অনেক ছেলেকে আমি আরও অনেক খারাপ অবস্থার মধ্যে মানুষ হ'তে দেখেছি। তাদের দিকে ফিরে চাইবার লোকও হয়তো ছিল না। অথচ তারা মন্দ হ'য়ে যায়নি। প্রথমটায় তারা হয়তো বেঁকে গিয়েছে, কিন্তু সময় তাদের আবার খাড়া ক'রে, সোজা ক'রে তুলেছে। কিন্তু এর বেলায় মন্দ হওয়ার ধারাটাই যেন বাড়তে লাগলো। বুঝলাম, আরও খারাপ কিছু ঘটবে। ঠিক তাই হ'লো! এক একটি বালুকণা জমেই একদিন পর্বতে পরিণত হয়। আমি নিজেকে প্রশ্ন ক'রলাম—এর পরিসমাপ্তি কোথায়? এক জায়গায় যেখানে আপনি মূলসুদ্ধ তাকে তুলে ফেল্‌লেন, অন্য জায়গায় তাই আবার দ্বিগুণ আকারে বেড়ে উঠ্‌লো। যখন তাকে হাত বাড়িয়ে ধরতে গেলেন—তখন সে আঙুল গ'লে বেরিয়ে গেল। বাধা দেওয়ার কোনো উপায় ছিল না।"

আমি তাকে প্রশ্ন ক'রলাম—"কিন্তু ভালো ক'রে যদি চাষ করা যায়, তাহ'লে কি খারাপ বীজেও ভাল গাছ হয় না? তুমি কি কোনদিন তার

বিবেক বুদ্ধি জাগাতে চেষ্টা ক'রেছিলে ? তাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যে সত্যি সত্যি কি তুমি সচেষ্ট হয়েছ ?"

এই প্রথম আর্‌বাস তার চোখের ভারী পাতা তুলে তাকালো। অবাক্ বিস্ময়ে সে চেয়ে রইলো কিছুক্ষণ। হঠাৎ সে বল্‌লে—"প্রকৃতিকে কেউ কি শাসন ক'রে বদ্‌লাতে পারে মশাই ? নিজের মনে মনে আমি বলেছিলাম—'চোখ যদি তার দৃষ্টি হারিয়ে ফেলে, তাহ'লে জিভ্ দিয়ে কি সেই দেখার কাজ চলে ? দৃষ্টান্ত দেখেও যদি লোকে না শেখে, তাহ'লে লাঠির ঘায়ে কি তাকে শিক্ষা দেওয়া যায় ?' সত্যি কথা বল্‌তে গেলে, আমার স্ত্রী তার কর্তব্য করেছে। মেয়েরাই এসব ব্যাপার ভালো বোঝে। আমার স্ত্রীর কথা যে আমার কথারই প্রতিধ্বনি, এ যদি না সে বুঝে থাকে, তাহ'লে সে দোষ কার ? নির্বাক থেকে যে কথা আমি তাকে বোঝাতে চাইতাম, আমার মুখের দিকে তাকিয়েও সে যদি তা বুঝতে না পারে, তাহ'লে স্বয়ং ভগবান এসে বল্‌লেও, সে বুঝতো না! এসবই আমি নিজের মনে মনে আলোচনা ক'রে দেখেছি। আমি যখন তাকে পথ দেখিয়েছি, তখন তা অনুসরণ করা তার উচিত ছিল। আমি যখন তার অনুসরণ করেছি, সে কেন তখন ফিরে দাঁড়ায়নি ? সে কোনদিন আমার দিকে তাকায়নি,—আমার কথাও শোনেনি। এ আমার নীতির বিরুদ্ধ যে, আমি কাউকে জোর ক'রে ধ'রে তাকে কানে কানে চীৎকার ক'রে বল্‌ব—'ওহে! তুমি সৎ হও!' যদি ভালো হবার গুণ তার মধ্যে না থাকে, তাহ'লে এসব কথায় তার কি হবে ? কোনো লোক যখন প্রার্থনা করে, তখন কেউ যদি তার দিকে চেয়ে মুখ ভ্যাঙ্‌চায়, তাহ'লে বুঝতে হবে তার আর উদ্ধারের কোনো আশাই নেই। শাস্তিদান করলে তখনই ফল হয়, গোড়ায় যখনও ঘুণ ধরেনি। পোকায় যতক্ষণ না গাছের শিকড় কেটে ফেলে, ততক্ষণই তো গাছের সজীব হওয়ার আশা থাকে।

তার কথার মধ্যে একটা দৃঢ়তা লক্ষ্য ক'রে আমার মনে হ'লো সে তার উক্তিগুলিকে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে। তবু আমি সংশয়-চিত্তে তাকে জিজ্ঞাসা ক'রলাম—"যা তুমি বল্‌লে, সত্যিই কি তোমার তাই ধারণা? তোমার যুক্তি যে অকাট্য, নিভু'ল—তোমার কি তাই বিশ্বাস?"

সে তার হাতদুটিকে টেবিলের ওপরে ছড়িয়ে দিলো। আমার কথার জবাব দিতে গিয়ে তার নিশ্বাস যেন ভারী হ'য়ে উঠ্‌লো।—"জালিয়াৎ ব্যবসাদারের মতো যদি আমার নিজের রক্তমাংস আমারই সঙ্গে প্রতারণা করে—আমি কি তাহ'লে তার সঙ্গে তর্ক ক'রে পারি? আমার নিজের হাতে বোনা বীজ থেকে যদি অসংখ্য বিষ ধরে জন্ম হয়—তাহ'লে কি স্কুল মাষ্টারের মতো বেত মেরে তাদের শিক্ষা দিতে পারি? তাতে কোনো গৌরব নেই, শালীনতাও নেই। যার জন্যে সব কিছু সমস্ত ভবিষ্যৎ পর্যন্ত পণ ক'রে রাখা হ'লো—সেই যদি শয়তানের দাসত্ব করে, আর তার শয়তানিতে যদি সমস্ত ঘর সংসার বিষিয়ে ওঠে তাহ'লে কি করা যাবে বলুন? তার অস্থি চূর্ণবিচূর্ণ ক'রে কি আর এই আশাই করা যাবে যে, তা থেকে আবার তার ভালো হাড় গজিয়ে উঠ্‌বে, তার মাথা হবে নতুন, নতুন মন নতুন প্রাণ সে ফিরে পাবে?"

তার দৃঢ় ভাবব্যঞ্জক মুখখানি থেকে থেকে কেঁপে ওঠে। একটা দীপ্তি ছড়িয়ে পড়ে তার সমস্ত মুখমণ্ডলে। এতদিন ধ'রে, সমস্ত জীবনব্যাপীই যে কারো কাছে নিজের মনের কথা খুলে বলেনি, সে আজ আমার চোখের সামনে তার সমস্ত অন্তরকে ধীরে ধীরে উন্মুক্ত ক'রে দিচ্ছে। কিন্তু সে যেন তার কথার ভাবে, কথার গাঁথুনিতে, তার কণ্ঠস্বরে আমাকে অভিভূত ক'রে ফেল্‌তে চায়, নির্বাক ক'রে দিতে চায়। এই যেন তার মনের বাসনা।

হঠাৎ আমার যেন মনে হ'লো, শুধু মনে হ'লো কেন, দৃঢ় ধারণা জন্মাল

যে, সে আমার দিকে চেয়ে কথা বল্‌ছে বটে, কিন্তু আসলে তার দৃষ্টি রয়েছে কোনো অদৃশ্য প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে! তাকে সে যেন দূরে সরিয়ে দিতে চায়। তার প্রশ্ন আর ভৎর্সনা সে যেন সর্বক্ষণ শুনতে পাচ্ছে। আমার মনে হ'লো, যে কথাগুলি সে আমাকে বল্‌ছে—অনেকদিন থেকেই সেগুলি তার অন্তরে অন্তরে পাক খাচ্ছিল। আজ সেগুলি যেন ঘা খেয়ে সজোরে বাইরে বেরিয়ে আসছে। এতদিন ধরে প্রাণপণে সে যে-সব কথা মনের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল, আজ প্রবল ধাক্কায় তাদের বেরিয়ে আসতে দেখে, সে বিস্ময়-বিহ্বল। নিতান্ত অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে যেন অন্তরের ক্রোধ চেপে রেখে, মহাদুঃখে নিজেই নিজের কথাগুলি শুনে চলেছে!

ক্রমে তার কণ্ঠস্বর অনেকটা হাল্‌কা হয়ে এলো। নতমস্তকে ও বিস্ফারিত নেত্রে সে ব'লে চল্‌লো—"আপনি হয়তো জিজ্ঞাসা ক'রবেন, কখন আমি টের পেলাম, কখন আমার আশা ভঙ্গ হ'লো। তাই না? কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত লোককে প্রশ্ন ক'রে দেখুন দেখি, কখন সে তার ব্যাধির কথা বুঝতে পারলো? সে নিশ্চয়ই প্রথম দিন থেকে টের পেয়েছিল, কিন্তু তার বিশ্বাস জন্মালো সেইদিনই যেদিন সে এই ব্যাধির কবলে প'ড়ে শয্যা নিলো। রাতের পর রাত আমি শুধু ভেবেছি আর ভেবেছি। ভাবনা আমার সম্বন্ধে, ভাবনা তার সম্বন্ধে। এ কথা নিয়ে মনে মনে কত না তোলপাড় করেছি! লক্ষ্য ক'রেছি—কুষ্ঠব্যাধি সমস্ত দেহ আচ্ছন্ন ক'রে ফেল্‌ছে। নিজের আত্মাকে চাবুক মেরে জিজ্ঞাসা করেছি, কেমন ক'রে এই শয়তানের সঙ্গে লড়াই ক'রব? শিক্ষা দিয়ে? সংযম দিয়ে? কিন্তু তা দিয়ে কাজ হয় কই, শয়তানি তো বেড়েই চলে! যে লাঠি দিয়ে আমি তাকে শাসন করতে পারতাম—সেটা হয়তো আমার হাতেই টুক্‌রো টুক্‌রো হ'য়ে ভেঙ্গে যেতো—কিন্তু তাতে ক'রে কোনো ফলই হ'তো না।

ঐ আঘাতে তার পিঠে কেবল কড়াই পড়তো। তার জন্মে কি কোনো নিয়ম-কানুন মেনে চলা উচিত ছিল? কি সে নিয়ম? এমন কোনো নিয়ম কি আছে, যা একেবারে অভ্রান্ত সত্য? তাকে কি কুকুরের মতো শেকল পরিয়ে বেঁধে রাখাই ঠিক হ'তো? কিন্তু তাকে বাঁধা মানেই তো আমাকে বাঁধা! আমি গাছ, সে তো তারই ডাল। আমি প্রদীপের সল্‌তে, সে তারই শিখা। আমি পৃথিবী, সে হ'লো ঋতুরাজ বসন্ত। কি ক'রে গাছ তার শাখার সঙ্গে বিবাদ ক'রবে? একই রস যে গাছের কাণ্ড থেকে শাখায়-প্রশাখায় ব'য়ে চলেছে! শল্‌তে আর শিখায় কি এই একই রসধারা নেই? পৃথিবীতে কি বসন্তের আগমন বন্ধ করা যায়? হ্যাঁ, এ সবই ঠিক। কিন্তু কোথা থেকে এই পাপের আবির্ভাব হ'লো? দাবানলের মতো কি ক'রে তা ছড়িয়ে পড়লো? কি থেকে এর উদ্ভব? কিন্তু কি ভয়ানক এর অগ্রগমন! প্রথমটায় ছোট্ট মিথ্যা, পরে গুরুতর অসত্য-ভাষণ। প্রথমে এক পেনি, পরে পাউণ্ড চুরি। প্রথমে পশু-নির্যাতন, পরে নরহত্যা। পকেট কাটা থেকে শুরু হ'লো ডাকাতি। দুষ্টবুদ্ধি থেকে সকল মান সম্ভ্রম করলো বিসর্জন। শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, সাধুতা, ভালোবাসা কিছু নেই তার। কোথা থেকে এমনটা হ'লো? আমার কাছ থেকে? নিশ্চয়ই তাই। আমি নিজেকে প্রশ্ন করেছি—'আরবাস্, কোন নরকে তোমার দেহ এমন কলুষিত হয়েছে যে, তুমি এমন একটা নোংরা বীভৎস জিনিসকে এই পৃথিবীতে নিয়ে এলে? এ কথা কি ঠিক যে, যে মানুষ নীচ, যে কলুষিত সে শুধু কদর্যতারই সৃষ্টি ক'রবে?"

আমার দিকে সে চেয়ে রইলো। অসহায় সকরুণ তার দৃষ্টি—ভারবাহী পশুর মতো। আবার সেই অখণ্ড নীরবতা। কোটের হাতা দিয়ে সে তার কপালের ঘাম মুছে ফেল্‌লো। তার কষ্ট দেখে আমারও কষ্ট হ'লো—তার মর্মবেদনায় আমিও যেন ব্যথা অনুভব ক'রলাম। কিন্তু তবু আমি

এ ধারণা দূর ক'রতে পারলাম না যে, সে অনেক বাড়িয়ে ব'লেছে। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে আমি তাকে বললাম—"মানুষের যতটা দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত,—আমার মনে হয়,—তুমি মিছামিছি তার চেয়ে নিজেকে বেশি দায়ী করছ। তোমার কর্তব্য সম্বন্ধে তুমি যদি বেশি বেশি চিন্তা ক'রে থাক, তাহ'লে তোমার নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধেও তুমি অতিরিক্ত ধারণা ক'রেছ নিশ্চয়ই! তুমি মানুষ হিসাবে, পিতা হিসাবে কেবল নিজের কথাই ভেবে দেখেছ। কিন্তু তোমার ছেলের মায়ের কথা কি চিন্তা করেছ কোনদিন? তাঁর কি তোমারই মতো,—এমন কি তোমার চেয়েও বেশি দাবী ছিল না তাঁর ছেলের উপর? তোমার স্ত্রী নিশ্চয়ই তোমার ভাবধারাকে সমর্থন ক'রবেন না, বিশেষ ক'রে তোমার এই নিষ্ঠুর কাজকে। এই কাজেই তোমাদের পারিবারিক বন্ধন একেবারে ছিন্ন হয়ে গেছে।"

নির্লিপ্ত-কণ্ঠে আব্‌বাস্ জবাব দিলো—"এ-সব নিয়ে আমি আর আলোচনা ক'রতে চাই না। যুক্তি-তর্কের সীমানা ছাড়িয়ে আমরা অনেক দূরে চ'লে গিয়েছি। জানিনা, আমার স্ত্রী আমার যুক্তি সমর্থন করে কিনা! যাই হোক্, সে যেমন কিছু হারিয়েছে, আমিও তেমনি হারিয়েছি। তার কষ্ট অত্যন্ত গভীর—কিন্তু আমি ভুগছি নরক যন্ত্রণায়। তার জীবনের কিছু আর বাকী নেই—আর আমার জীবন কলুষিত, বিষাক্ত। সে নিশ্চয়ই আমার চেয়েও বেশি সমবেদনার পাত্র। তার দেহরূপ বৃক্ষ যে ফল দিয়েছিল নিতান্ত অনিচ্ছায়—সে ফল আমার দম্ভকে চূর্ণ করেছে, আমার মূর্খতাকে দলিত ক'রে তার প্রতিশোধ নিয়েছে। মানুষের উচিত হ'লো প্রকৃতিকে বুঝতে চেষ্টা করা। কিন্তু আমরা সেই প্রকৃতিকে অবহেলা করি, তার উপর টেক্কা দিয়ে চলি। কোন স্ত্রীরই একটি সন্তানের মা হওয়া উচিত নয়। এর উপরে নির্ভর করে অনেক কিছু। আমার মায়ের ছিল নয়টি ছেলেমেয়ে। তার মধ্যে সাতটি আর এখন বেঁচে নেই।

আমার ঠাকুমার ছিল যোলটি—তার মধ্যে আটটি ছেলেবেলাতেই মারা গেছে। এই মৃত্যুতে শোক করবার মতো তেমন কিছু নেই। জমিতে বীজ বুনলে, তার সমস্ত বীজ থেকেই তো গাছ হয় না। কিন্তু কারও একক সন্তান কিছুতেই হওয়া উচিত নয়—তার বিপদ অনেক। এটা ঠিক যেন লটারীর মতো। না, এ তুলনা ভালো নয়। কারণ যে জলন্ত শিখার কথা নিয়ে আলোচনা করছি, তার উত্তাপ ফিরে এসে গায়ে লাগবে, হয়তো দাগও রেখে যাবে তার। যে মা-র একমাত্র ছেলেকে সকলেই পরিত্যাগ করলো, —তার মর্মবেদনা সত্যই ভয়ঙ্কর। কিন্তু এমন ছেলেও তার মায়ের সব-কিছু, তার চক্ষের মণি, হৃদয়ের স্পন্দন। সে যদি উন্মুক্ত কুঠার নিয়েও তার জননীর দিকে ধেয়ে আসে, তবু তার মা তার নিজের জীবনের চেয়েও তাকে বেশি মূল্যবান মনে ক'রবে। তার কাছে নিজের ভালোমন্দ সবই সমান। ভালোমন্দ যাচাই করবার আগে রক্তের দাবীই হ'লো প্রধান।

'বাবা!'—কে যেন আমাকে চীৎকার ক'রে এই নামে ডাকে। আমি মনে মনে ভাবি, কি এর অর্থ? 'বাবা' মানে কি? এর নিগূঢ় অর্থ জানবার জন্য আমি চেষ্টা করি। আমি যদি কোনো দাসীকে আমার অঙ্কশায়িনী করতাম, সে যদি আমার শয্যাসঙ্গিনী হ'তো—তাহ'লে সে অবস্থায় যদি আমাদের কোনো পুত্র জন্মাতো, তাহ'লে সেও তো আমাকে 'বাবা' ব'লেই ডাকতো। কিন্তু এই দুই ব্যাপারই কি সমান? তা নয়। হয়তো দাসীর গর্ভে আমার পুত্র জন্মাতো। হয়তো বা সে আমি যেমনটি চেয়েছিলাম সেই রকম, সৎ, ভক্তিপরায়ণ হ'য়েই উঠ্‌তো। তবে কেন আমি সেভাবে পুত্রের জন্ম দিইনি? কেন এই কু-পুত্রের জনক হ'য়েছিলাম? কিন্তু সামাজিক আইন আমাকে বাধা দিয়েছে। সে-আইন পবিত্র। সেই দাসী যদি আমার বিবাহিতা স্ত্রী হ'তো? আমি এখানে বল্‌তে চাই যে, পুরুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ধ্যান-ধারণা স্ত্রীলোকের চেয়ে অনেক বড়।

আবার একথাও আমি বলবো যে, পিতার দোষ, মায়ের দোষের চেয়ে অনেকগুণ বেশি। ঈশ্বরের অতি কাছে তাঁর কোল ঘেঁষে বসবার অধিকারিণী সেই মা। তার যাতে কোন অশুভ বা অকল্যাণ না হয় ঈশ্বর তা দেখে থাকেন। কিন্তু ভগবানের দরবারে পিতাকে দাঁড়াতে হয় যুক্ত-করে। যথাযথ ভাবে সে তার কর্তব্য পালন করেছে কিনা সেজন্য ভগবানের কাছে তাকে কৈফিয়ৎ দিতে হয়। অগ্রগামী পূর্বপুরুষ আর পশ্চাদ্‌বর্তী বংশধররা যে শৃঙ্খলে বাঁধা পড়েছে, পিতা হ'লেন তার মধ্যবর্তী যোগসূত্র। সে হয়তো কোমলতা চায় না, আদর যত্নের কোনো প্রয়োজনই হয় তো তার নেই—কিন্তু তার পুত্র, তার সমাজ, তার রাজ্য, তার পূর্ব-পুরুষ, তার অধস্তন বংশধরেরা সকলেই চেয়ে আছে তার দিকে। পুত্রকে সে যেন ঋণ হিসেবে পেয়েছে। সময় হ'লে সেই পুত্রকে ছেড়ে দিতে হবে সমাজেরই হাতে, ঋণ শোধ করবার জন্যে! তার মতো হতভাগ্য আর কে আছে বলুন, যে শুধু হাতে ফিরে এসে বলে আমার ওপরে ঈশ্বর যে বিশ্বাস রেখেছিলেন, আমি তা ভঙ্গ করেছি।—"

বিহ্বল দৃষ্টিতে সে চেয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। আবার ফিরে এসে বস্‌লো। অস্ফুটস্বরে বারবার ব'লে উঠ্‌লো—"আমার ওপরে ন্যস্ত বিশ্বাস আমি ভঙ্গ করেছি, আমি ভঙ্গ করেছি।"

তার সেই অভিভূত অবস্থায় তাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করতে সাহস হ'লো না। শুধু ভাবতে লাগলাম—কি ক'রে আরও অগ্রসর হওয়া যায়। মনে মনে আমি যা সিদ্ধান্ত ক'রে রেখেছি, তার সত্যতা সম্বন্ধে ক্ষণে ক্ষণে আমার বিশ্বাস যেন আরও গভীর হ'য়ে উঠ্‌ছে। কিন্তু তবু আমি ভয় পাচ্ছিলাম কিছু প্রকাশ করতে। কতকগুলি ধারণাকে কেন্দ্র ক'রেই আমার সিদ্ধান্ত গ'ড়ে উঠেছে। আর বাস্তব ঘটনাগুলি প্রত্যক্ষ ক'রে

আমার ধারণাকেই সত্য বলে মনে করছি। বিশেষ ক'রে পারিপার্শ্বিক সমস্ত ঘটনাই আমার বিশ্বাসের অনুকূলে। একটা ছবির সঙ্গে আর একটা ছবি এমন ক'রে মিলে যাচ্ছে, যাতে ক'রে ভবিষ্যৎকে বাস্তবের মতই আরও সুস্পষ্ট বলে মনে হচ্ছে। এই যে লোকটি আমার মুখোমুখি ব'সে আছে—তার বিশেষ একটা আকর্ষণী শক্তি আছে। সেই শক্তি দিয়ে সে যেন তার দৃষ্টিভঙ্গী ও সমস্ত চিন্তাকেই নিয়ন্ত্রিত করছে। এতে কোনো ভুল নেই। অনেকদিন ধ'রে ওকালতী আর জজিয়তী ক'রে এসেছি বটে, কিন্তু চিন্তা-সঞ্চালন ব্যাপারকে হেসে উড়িয়ে দেবার মত ক্ষমতা আমার নেই। ওকালতী আর জজিয়তী করবার ফলেই বোধ হয় পরস্পরের মধ্যে নীরবে ভাবের আদান-প্রদান সম্বন্ধে আমার বেশ একটা অভিজ্ঞতা হয়েছে। সেই থেকেই এ-কথা ব'লছি।

পবিত্র একটা ভাব ঘিরে রয়েছে ঐ লোকটার চতুর্দিকে। তাই তার মনের গোপন কথাকে জোর ক'রে আদায় ক'রে নিতে আমার কুণ্ঠা হচ্ছিল। আমি মনে করেছিলাম, সেটা তার প্রতি অসম্মানজনক কাজ হবে। তাই, ঠিক কেমন ক'রে যে আবার কথা সুরু করব, তাই ভেবে পাচ্ছিলাম না। শেষটায় গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে টেবিলের ওপর একটু ঝুঁকে তাকে প্রশ্ন ক'রলাম—"সত্যিই কি তুমি তাকে খুন করবার জন্যে ঐ ঘরে গিয়েছিলে?"

তার কোনো জবাব এলো না। সে যেন কঠিন হয়ে গেছে। তার ঠোঁট থেকে সে যেন কোনো কথা বের হ'তে দেবে না। কিন্তু তার সুপ্রশস্ত ললাট যেন আমার দৃষ্টির সম্মুখে খুলে গেল। ঠিক যেন একখানা খোলা বই। তাতে কি লেখা রয়েছে। আমি সব যেন প'ড়ে ফেল্‌লাম।

সাহস ক'রে আমি বল্‌লাম—"ছেলের ঘরে তুমি দু'বার গিয়েছিলে।" সাহস ক'রে হয়তো কথাটা বলিনি। কিন্তু তখনকার সেই উত্তেজনায়

আমার মুখ দিয়ে ঐ কথা আপনা থেকেই বেরিয়ে গিয়েছিল। আমি তাকে বল্‌লাম—"হ্যাঁ দুইবারই তুমি গিয়েছিলে। যখন তুমি প্রথমবার ঘর ছেড়ে এসেছিলে তখনো সে বেঁচে। কিন্তু দ্বিতীয়বার যখন তুমি তার ঘরে ঢুকলে, তখন সে আর বেঁচে নেই,—তুমি দেখতে পেলে তার শবদেহ বিছানায় প'ড়ে আছে।"

আমি ভাবতে পারিনি যে, এই কথায় কৃষকটির চেহারার পরিবর্তন হবে। দারী কাঠের মতো ধূসর রঙের মুখখানি তার একেবারে সাদা হ'য়ে উঠ্‌লো। তার মুখে যেন আর রক্ত নেই! কে যেন সেখানে ভিজে খড়িমাটি লেপে দিয়েছে। দুই চোখ বিস্ফারিত ক'রে সে আমার দিকে চাইলো। তার গাল দুটি কাঁপতে লাগলো। দুই হাত দিয়ে সে তার নিজের গলা চেপে ধরলো। আমার মনে আর কোনো দ্বিধা রইলো না। এবার আমি শান্ত স্বরেই তাকে বল্‌লাম—"তুমি তাকে কিছু টাকা ধার দেবার জন্যে তার ঘরে গিয়েছিলে। সেই রবিবারে তোমার কাছে টাকা ছিল না। আহারাদির পর তুমি তোমার প্রতিবেশী ষ্টিফেন্ বুক্‌নারের কাছ থেকে দুই হাজার মার্ক এনেছিলে ধার ক'রে। কি, এ কথা ঠিক তো? এই টাকা দিয়ে তুমি সাইমনকে দূরে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলে। সেইদিনই সন্ধ্যাবেলায় জাহাজ ঘাটায় গিয়ে তার আমেরিকাগামী জাহাজ ধরবার ব্যবস্থাও ঠিক করা ছিল। আমি কি মিথ্যে কথা বলছি? তুমি তাকে টাকা দিতে চেয়েছিলে। তোমার প্রস্তাবও তুমি তাকে বুঝিয়ে বলেছিলে। দ্বিধাহীন চিত্তে সে তোমার প্রস্তাব মেনে নেবে, এ ধারণাও তোমার ছিল। কিন্তু সে তোমার প্রস্তাবই শুধু অগ্রাহ্য করেনি, তোমার টাকাও সে স্পর্শ ক'রতে চায়নি। তুমি তখন তার কারণ জানতে চাও। সে তখন কথা বল্‌তে শুরু করে। প্রথমতঃ তার কথা জড়িত এবং অসংলগ্ন মনে হচ্ছিল। কারণ তখনও তার নেশার আমেজ কাটেনি। পরে

তোমার কাছে তার সব কথা পরিষ্কার হ'য়ে গেলো। তুমি তার সামনে তখনও নির্বাক ভাবে দাঁড়িয়ে। যদিও সে বিছানায় চিৎ হ'য়ে শুয়ে ওপরের দিকে তাকিয়ে কথা ব'লে যাচ্ছিল, তবু তুমি তার ওপরে রাগ করনি। কারণ, একথা তুমি বেশ ভালো ক'রেই জানতে যে, তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে সে কোন কালেই কথা বল্‌তে পারবে না। তার কথাগুলি তুমি শুনে গেলে। যা ঘটতে পারে তার ইঙ্গিতও ছিল সেই কথার মধ্যে। আমার কথা কি ঠিক নয় ?"

আমার সামনে থেকে আরবাস্ তার ভীতিবিহ্বল দৃষ্টি কিন্তু সরিয়ে নিলো না। গভীর বিস্ময়ে কোন রকমে সে বল্‌লে—"আপনি নিশ্চয়ই তখন ভূতের মত ঐ ঘরে উপস্থিত ছিলেন !"

আমি জবাব দিলাম—"না। তা নয়। তথ্য থেকেই সত্যকে জানা যায়। অতি বড় বীভৎস ঘটনাও তার পেছনে এমন সব চিহ্ন রেখে যায়, যাতে ক'রে প্রকৃত তথ্য আবিষ্কার করা মোটেই শক্ত হ'য়ে ওঠে না। এতে ডাইনি বা জাদুবিদ্যার কোনো দরকার করে না। প্রকৃতির নিয়মই হ'লো, মানুষের সমস্ত কাজ এক তারে বাঁধা থাকবে। তুমি হয়তো একটা নুড়ি জলে ফেল্‌লে, জলে উঠলো ঢেউ। তারপর তোমার মনে হবে ধীরে ধীরে সে ঢেউ গেল মিলিয়ে। আসলে কিন্তু জলের মৃদু কম্পন অত সহজে মিলোয় না, অনেকক্ষণ ধ'রে চলে। মানুষের চোখে সেটা ধরা পড়ে না। তাইতো ঘটনা-জালের হাত থেকে কারো রেহাই নেই। মানুষের প্রতি পদে পদে, আঙুলের স্পর্শে, নিশ্বাসে নিশ্বাসে সেই ঘটনা-জালে মানুষকে জড়িয়ে ধরে। আমার একটি তথ্য জানা ছিল। কিন্তু তার উপর আমার তেমন আস্থা ছিল না। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সব কিছুই পরিস্ফুট হ'য়ে উঠ্‌লো। সমস্ত ব্যাপারটা যেন চকিতে আমার চোখের সামনে উদ্ঘাটিত হ'লো।

"ইস্‌টাডে একজন চিত্রকর আছে। তার নাম কিসলিং। সে হ'লো

সাইমনের বন্ধু, তার সাথী। এ লোকটি অবিশ্যি কোনো সৎ কাজ করবার জন্যে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেনি। কিন্তু মোটামুটি ধরনের সাধুতা তার ছিল। আমাকে তার অনেক কথাই বলবার ছিলো। এই ধরো না কেন, —তোমারও হয় তো মনে আছে যে,—গত বছর শীতের সময় তোমাদের একটি অতি প্রাচীন সুচিত্রিত চীনেমাটির জলদানি উধাও হ'য়ে যায়। তুমি ও তোমার স্ত্রী সুনিশ্চিত ধারণা ক'রে বসো যে, সাইমনই সেটা সরিয়ে শহরের কোনো দোকানদারের কাছে বিক্রী ক'রে দিয়েছে। কারণ, সেটা বেশ মূল্যবান ছিল। তোমার স্ত্রীর মনে এমন সন্দেহও দেখা দেয় যে, বিক্রীর ব্যাপারে কিসলিং মধ্যস্থতা করেছে। অবিশ্যি এ কথা ঠিক যে, সাইমনই সেই জলদানিটা সরিয়ে ছিল। আর, এটাও ঠিক, এ ব্যাপারে কিস্‌লিংয়েরও হাত ছিল, অবিশ্যি সে এ কথা স্বীকার করতে চায় না। কিন্তু তার মত লোকের পক্ষে বিক্রীর টাকায় ভাগ বসাবার ইচ্ছা না হয়েই যায় না। আসলে কিন্তু ব্যাপারটা এতদূর গড়ায়নি। সাইমন্ তার বন্ধুর চোখের সামনেই সেই জলদানিটা ভেঙে চুরমার করে।

"কিস্‌লিং তখন বসেছিল প্লিন-ফেল্ডের একটা ছোট্ট দোকানে। সাইমন সেখানে জলদানিটা নিয়ে যায়। তার থেকে কিস্‌লিং সেটা নিয়ে বেশ বিজ্ঞের মত নেড়েচেড়ে দেখতে থাকে। জিনিসটা যে খুব দামী সে তা বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু সাইমন হঠাৎ সেটা তার হাত থেকে তুলে নিয়েই সজোরে ফেলে দেয় মাটিতে। ভেঙে সেটা চৌচির হ'য়ে যায়। কিস্‌লিং তাতে ক্ষেপে ওঠে। গালাগালিও করে খুব। কিছুক্ষণ বিরস বদনে সাইমন যেন কি ভাবে। পরক্ষণেই চীৎকার ক'রে ব'লে ওঠে— 'এমন কাজ আমি করতে চাই, যাতে ক'রে সত্যিই সে কষ্ট পায়। সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে যেন সেই কষ্ট অনুভব ক'রতে পারে।'—কার ওপর তার এই নিদারুণ আক্রোশ কিস্‌লিং তা গোড়ায় বুঝে উঠ্‌তে পারেনি।

সাইমনের সঙ্গে তখনো তার খুব বেশি দিনের পরিচয় নয়। পরে অবিশ্যি সে বুঝতে পারে—কার উদ্দেশে সাইমন ও-কথা বলেছিল। কিসলিং বলেছে—'নিজের বাপের ওপর ছেলের এমন ঘৃণা, আমি আর কখনো দেখিনি। এম্‌নিতর ক্রোধের অভিব্যক্তি সাইমনের মুখে আরও কয়েকবার প্রকাশ পেয়েছে। ব্যর্থতায় সে অভিভূত হ'য়ে পড়তো। সব কিছু ভেঙ্গে দেবার, ধ্বংস করবার দুর্বুদ্ধি তাকে যেন পেয়ে বস্‌তো। ক্রোধের পরেই কিন্তু দেখা দিত বিষণ্ণতা। মানসিক অবসাদে সে যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলতো। এমনিতর মনের অবস্থা যখন, সে তখন রাতদিন যেন কি ভাবতো। তার ভাবগতিক দেখে মনে হ'তো সে যেন আতঙ্কে এ-সব করছে, ঘৃণার জন্যে নয়। আমার মনে হ'তো—হয়তো ঠিক আতঙ্কও নয়। এমন একটা কিছু যা হয়তো বুঝিয়ে বলা অসম্ভব।' অনেকে নাকি তাকে বল্‌তেও শুনেছে—'তার মুখের ওপর যদি সোজাসুজি সব কথা বল্‌তে পারতাম, তাহ'লে আমার শাস্তি হ'তো, বোধ হয় স্বস্তি পেতাম।' তার এ-সব কথা বলবার কি অর্থ? কিসলিং একাই তার স্বপক্ষে বলেনি। আরও অনেকে আছে। তারা বলেছে—সাইমন বাস্তবিকই দুষ্ট প্রকৃতির ছিল না। একথা যারা বলেছে, তারা তার দিক টেনে একথা বলেছে, এমন নয়। উপরন্তু তারা একথাও বলেছে যে, সাইমন ছিল দুর্বলচিত্ত। কুপথে তাকে চালিত করা ছিল সহজ। তার মনের কোনো স্থিরতা ছিল না। স্নায়ুতন্ত্রীকে অবসন্ন করবার জন্য সে নিজের শরীরের ওপর কত না অত্যাচার ক'রেছে। তা দেখলেই মনে হ'তো, কে যেন তাকে সর্বক্ষণ তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। তার ফলে সংসারকে ফাঁকি দিয়ে সে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

"গভীর কোন মর্মবেদনার জন্য সে ঘৃণ্য ব্যবহার ক'রতেও দ্বিধা বোধ করতো না। আসলে কিন্তু সে মোটেই খারাপ ছিল না। আমি নিজেও

তাকে এই ভাবেই বিচার ক'রে দেখছি। কিন্তু কে তাকে সর্বক্ষণ অনুসরণ ক'রছে ব'লে সে ভাবতো? কাকে সে অবহেলা করতে চাইতো? নিজের মধ্যেই সে কি তার কোনো প্রবৃত্তিকে অবদমিত করতে চেয়েছিল? আরবাস্! এর জবাব শুধু জানো তুমি, আর জানি আমি। আমার তো তাই মনে হয়। সমস্ত পৃথিবীর লোক হাজার মাথা খুঁড়লেও সঠিক তথ্য বের করতে পারবে না। কিন্তু প্রকৃত তথ্য তুমি আর আমি জানি। কিন্তু এসব কথা তুমি সেদিন তার শোবার ঘরে ঢোকবার আগে পর্যন্তও জানতে না। সব কথা তুমি জেনেছিলে তারপর।"

আরবাস্ স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করলো।

তার মুখের কুঞ্চিত ভাব দেখে মনে হ'লো, কে যেন তাকে ভেতর থেকে ঘা মারছে। কথা বলবার সে চেষ্টা করলো। কিন্তু মুখ দিয়ে তার স্বর বেরুল না। কিন্তু তার সর্বশরীর দিয়ে যেন তার অস্ফুট বাণী ফুটে উঠ্ছিল। সর্বশরীর তার অস্থিময়, ভাবপ্রবণতা যেন জড়িয়ে আছে অঙ্গে অঙ্গে। দেখলেই যেন সম্ভ্রমের ভাব জেগে ওঠে মনে। সে মনে করেছিল তার মনের গোপন কথা কেউই কখনো টের পাবে না। কিন্তু কিন্তু সে আশা নিরাশ হ'তে দেখে সে ভয়ে, বিস্ময়ে যেন অভিভূত হ'য়ে পড়্ছিল। ধীরে ধীরে তার সে-ভাবটা কেটে যায়। গোপনীয়তা রক্ষার পরিশ্রম থেকে সে যেন রেহাই পেলো, ভারমুক্ত হ'লো। সেইদিনই সে প্রথম স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করলো।

আমি তাকে মন খুলে সব কথা বলবার শেষ অসুবিধা থেকে মুক্তি দেবার সাহায্যে বল্লাম—"তুমি যদি ভালো ক'রে চিন্তা করো, তাহ'লে বুঝতে পারবে এ-সব ব্যাপারে মানুষ পশুর চেয়েও অসহায়। পশুরা পরস্পরকে ভুল বোঝে না। কিন্তু মানুষ সর্বক্ষণ কাজে এবং চিন্তায় পরস্পরকে ভুল বুঝছে। একথা ভাইয়ে-ভাইয়ে, বন্ধুতে-বন্ধুতে, পিতা-পুত্রে

সকলের বেলাতেই সমান ভাবে প্রযোজ্য। প্রত্যেক মানুষই তার নিজের মানসিক গণ্ডীর মধ্যে বাস করে। সে-গণ্ডী অন্ধকার গহ্বরের মতো ভয়াল। কিন্তু মানুষ আবার তাকেই উজ্জ্বল ক'রে দেখে, সব যেন তার কাছে আলোকিত মনে হয়। যে-মানুষ একদিন কল্পনায় বিভোর হ'য়ে মনে করে ভগবানের মুখপাত্ররূপে সে এই ধরাতলে জন্ম নিয়েছে, সেই মানুষই আবার একদিন আবিষ্কার ক'রে বস্‌লো, সে হচ্ছে শয়তানের হাতের ক্রীড়নক। তের বছর ধ'রে তোমার খালি চিন্তা ছিল একটি পুত্র সন্তানের জন্য। পরে তুমি একদিন সেই প্রার্থিত বস্তু হাতে পেলে। তার জন্মাবার পর আঠার বছর পার হ'য়ে গেল। তুমি তখন তার স্বরূপ আবিষ্কার করলে। কিন্তু তখন অনেক দেরী হ'য়ে গেছে। মানুষের বুদ্ধির সীমানা তো বড় নয়! তাহ'লে আর্‌বাস্, যে অপরাধ তুমি করনি, সেই অপরাধের বোঝা কেন তুমি ঘাড়ে নিতে চাইছ? সে নিজেই যখন এ পৃথিবী থেকে সরবার ব্যবস্থা করেছে, তখন তুমি কেন তার হত্যাকারী হিসেবে নিজেকে অভিযুক্ত করছ? কেন তুমি এ পৃথিবীর ন্যায্য বিচারকে ফাঁকি দিতে চাও? কেন,—আরবাস্! কেন?"

আর্‌বাস বল্‌লে—"এর কারণ আছে। বল্‌ছি আপনাকে। আমার মনের গোপন কথা সব প্রকাশ হ'য়ে পড়েছে। তাই, এখন আর বল্‌তে বাধা নেই। কিন্তু আপনাকে একটু ধৈর্য ধ'রে থাকতে হবে। সব কথা বলাও আমার পক্ষে কঠিন।" সে আত্মস্থ হ'য়ে কি যেন ভাবতে লাগলো। তার চিন্তার সঙ্গে তাল রেখে তার হাতের আঙুলগুলিও বারবার আকুঞ্চিত হচ্ছিল। তারাও যেন তার ভাবধারার সঙ্গে সঙ্গে জবাবদিহি করতে চায়!

ধরা-গলায় সে ব'লে উঠ্‌লো—"টাকা দিতেই আমি তার ঘরে যাই।" হ্যাঁ, একথা ঠিক। আমি তখনো তার আমেরিকা যাওয়ার কথা ভাবিনি।

কিন্তু তাকে দূরে সরানোই ছিল আমার একমাত্র চিন্তা, যত তাড়াতাড়ি আর যত দূরে সম্ভব। যাতে ক'রে আর বাড়িতে পুলিশ আসা দেখতে না হয়, তাই শুধু ভাবছিলাম তখন। আমি তার শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। সে সময় ঘরটা ছিল অন্ধকার। একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে নিলাম। সে বিছানায় শুয়ে আমার দিকে তাকিয়েছিল। হ্যাঁ, একথাও ঠিক—সে আমার টাকা নিতে রাজী হয়নি। দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে, দাঁতে দাঁত ঘস্‌তে ঘস্‌তে সে আমায় জানালো—আর টাকা দিয়ে কোন ফল নেই। আমি তার খাটের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। তাকে বল্‌লাম—'আমার সামনে উঠে দাঁড়াও।' সে জবাব দিলো—'কেন? কেন উঠে দাঁড়াব? যে তুমি আমাকে এই অবস্থার মধ্যে ফেলেছ, সেই তোমার হুকুমে উঠে দাঁড়াব?'

"তার কথা শুনে আমার হাতের মুঠি আপনা থেকেই শক্ত হ'য়ে উঠ্‌লো। বল্‌লাম—'কি বলছ তুমি? আমি তোমাকে এই অবস্থায় ফেলেছি? হতভাগা কোথাকার!'...

"তার মুখ দিয়ে শুধু একটিমাত্র কথা বের হ'লো 'তুমি।' আর কোনো কথা নয়। শুধু—'তুমি'। আমি তার দিকে চাইলাম। সে-ও আমার দিকে তাকালো। তারপর একটু থেমে আবার বল্‌ল—'তুমি—'। তার সেই কথার মধ্যে যেন ছিল ঘৃণা, ক্রোধ, তিক্ততা। এমন বেপরোয়া ভয় দেখানোর ভাব ছিল তার কথায়, যে, শুনে আমার বুক কাঠ হ'য়ে গেল। চীৎকার ক'রে আমি বল্‌লাম—"আমি? তার মানে কি? কি বল্‌তে চাও তুমি?"

দাঁতে দাঁত চেপে সে আবার বল্‌ল—"হ্যাঁ! তুমিই। জন্মাবার পর থেকেই তোমার বোঝা আমার বুকে চেপে বসে আছে।' আমি আর কথা বল্‌তে পারলাম না। সে আবার ব'লে চল্‌ল—'এখানে দাঁড়িয়ে

দাঁড়িয়ে তুমি শুধু চেয়ে থাক আমার দিকে। তোমার ঐ একদৃষ্টে চেয়ে থাকার কি শেষ নেই ? জ্ঞান হবার পর থেকেই দেখছি এই একই ভাব। খালি চেয়ে আছ, একদৃষ্টে চেয়ে আছ আমার দিকে। পলকহীন দৃষ্টি তোমার। মুখেও কোনো কথা নেই। টেবিলে রয়েছি ব'সে। সবই জানছ তুমি আমার সম্বন্ধে—কিন্তু তাও ঐ চেয়ে চেয়েই। কোন কথাই বলছ না তুমি। এতকাল ধ'রে খালি ঐ চোখের চাহনী দিয়েই তাড়া ক'রে এসেছ আমাকে। কেন আমার নামটা ধ'রে ডাকনি একবার ? কেন আমার সঙ্গে একটা কথা বলনি তুমি ? কেন তোমার মুখ থেকে কোনদিন কোনো কথা শুনতে পাইনি আমি ? আমি অধঃপাতে গেছি—এটা তোমার কাছে ভারী বিস্ময়কর, না ? আমার দৃষ্টি পড়লো আমোদ-প্রমোদ, হৈ হল্লার দিকে, বন্ধু-বান্ধব নিয়ে খুব স্ফূর্তি ক'রলাম। তোমার কাছে এটা ভারী অস্বাভাবিক লাগলো তাই নয় কি ? কিন্তু তারা অন্ততঃ আমার সঙ্গে কথা বলে, হাসে,—তাদের বন্ধুকে দুটো আনন্দের কথা ব'লে যায়। তাদের সঙ্গে তোমার তুলনা ? তোমার সঙ্গে আমার যে কি সঠিক সম্পর্ক, কখনো কি তা আমায় জানতে দিয়েছ ? আমি নিজের মনে মনেই বলি—ঐ যে রয়েছে দাঁড়িয়ে, সে তোমারই জন্যে ! বিশেষ কোনো মতলব আছে। দেখছ না ওর চাহনী ! আমি যখন নেহাৎ শিশু, ছোট্টটি—তখনও যদি তুমি কখনো দোর গড়ায় এসে দাঁড়াতে—আমার মুখের খাবার গলায় গিয়ে আটকে যেতো। কতবার যে তোমার হাতে খাবার আমার সাধ হয়েছে তার ঠিক নেই। কিন্তু তোমার দিকে পা বাড়াতে আমার সাহস হয়নি, ভয় পেয়েছি। গোড়ায় গোড়ায় মনে হ'তো কি এমন অন্যায় করেছি আমি ? কিন্তু তারপর যখন সত্যিই অন্যায় ক'রতে শুরু ক'রলাম—তখন শান্তি পেলাম অনেকখানি। কারণ, তখন অন্ততঃ এটুকু বুঝতে পারলাম যে আমি অন্যায় ক'রেছি, করতে পেরেছি।

তারপর থেকে খালি অন্যায় কাজ করবার জন্যে ছট্‌ফট্‌ ক'রে বেড়াতাম। লোকে যাতে বিরক্ত হয়, ক্ষতি যাতে আর পূরণ না ক'রতে পারে এমনি অন্যায় কাজ করবার জন্যে চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌তাম। হ্যাঁ, আমি খারাপ, আমি মন্দ—কিন্তু জানি না জন্ম থেকেই খারাপ কিনা। হ'তে পারি আমি হতচ্ছাড়া, বখাটে, তাই ব'লে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের মতো তুমি আমার সঙ্গে ব্যবহার ক'রতে পারো না। তার কোনো মানেই হয় না। আমার প্রতি কর্তব্য পালনে কেন তুমি অবহেলা করেছ,—সে-কথা তোমার ভেবে দেখা উচিত ছিল। তুমি তোমার কর্তব্য পালন ক'রলে আমিও হয়তো তোমাকে শ্রদ্ধা করতাম, ভক্তি করতাম, তোমার চির অনুগত হ'য়ে থাকতাম। সত্যিই আমি তা ক'রতাম। কারণ, আমার মধ্যে সে-প্রবৃত্তি ছিল। কিন্তু সে-প্রবৃত্তিকে তুমিই নষ্ট ক'রে দিয়েছ।—আমি এখন শয়তানের ক্রীতদাস। জীবন আমার বিষময় হ'য়ে উঠেছে। মানুষকে আমি আর সহ্য ক'রতে পারি না। আমার প্রাণের বন্ধুর সঙ্গও এখন আমার কাছে অসহনীয়। আমাকে কোনো কিছুই এখন আর আনন্দ দেবে না, খুশি ক'রবে না।'

"—এম্‌নি ক'রেই সে যে কতো কথা ব'লে গেল, সব মনেও নেই! ভুলে গেছি! তারপর সে বিছানায় শুয়ে শুয়ে খালি ছট্‌ফট্‌ করতে লাগলো, দাঁতে দাঁত চেপে বিড়্‌বিড়্‌ ক'রে কি যেন সব বকে যেতে লাগলো অনর্গল। তারপর হঠাৎ একবার অট্টহাসি হেসে, দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে নীরব হ'লো। আমি তখন নিজেকে লক্ষ্য ক'রে বল্‌লাম—'আরবাস্‌! এর আত্মার তো অধোগতি দেখছ, কিন্তু তোমার আত্মাও আর নিষ্কলুষ নেই।' কিন্তু মুখ ফুটে তখন কিছুই ব'ল্‌তে পারলাম না। আমার জিহ্বা যেন কিসে জড়িয়ে যেতে লাগ্‌লো। ভগবানের কাছে কাকুতি-মিনতি ক'রেই বা কি হ'তো! একটি কথাও

আমার মুখ দিয়ে বেরুল না। আমি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। গোলাবাড়ির আঙিনা ছাড়িয়ে দূরে বেড়ার ধার পর্যন্ত দৃষ্টি চালিয়ে দিলাম। দেখলাম—সব দিকেই পরিপূর্ণ শান্তি। বসন্তকালের মধুযামিনীতে যে শান্তি এই ধরিত্রীকে আরও মধুময় ক'রে তোলে ঠিক সেই শান্তি। চেয়ে রইলাম আকাশের দিকে। দেখতে লাগ্লাম নক্ষত্রের দল। কিন্তু কোনো সান্ত্বনা পেলাম না সেখানে। গেলাম গোয়ালঘরে। দরজা খুলে গোয়ালঘরের ভেতরে ঢুকলাম। সেখানকার বদ্ধ কটুগন্ধযুক্ত একটা ভ্যাপ্সা বাতাস আমার নাকে এসে ঢুকলো। একটা ষাঁড় মাথা তুললো। জাবর কাটতে লাগলো একই ভাবে। হঠাৎ যেন কেমন দুশ্চিন্তা হ'লো। ভয় পেলাম। অভিভূত হয়ে পড়লাম কিছুক্ষণ। কে যেন আমার ভিতর থেকে ব'লে উঠ্লো—'আবার সে ঘরে ফিরে যাও। কথা না ব'লতে পারলেও কিছু করতেই হবে তোমাকে।'

"আমি ফিরে গেলাম সেই ঘরে। ঘরে ঢুকেই দেখি—সে শুয়ে আছে নিজেরই রক্ত-স্রোতের উপর। আমি অনেকক্ষণ ধ'রে নিশ্চল পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইলাম সেখানে। তারপর নিজেকে বল্লাম—তোমার পুত্রের এই পরিণতির জন্যে তুমিই দায়ী, তুমি তাকে খুন করেছ। তোমার বিরুদ্ধে যদি ঐগুলিই তার অভিযোগ হ'য়ে থাকে, তাহ'লে সেজন্য তোমার শাস্তি পেতে হবে। নিশ্চয়ই।

"আমার সব কথাই আপনাকে বল্লাম। আর আমার কিছুই বলবার নেই।"

দুই হাত জোড় ক'রে সে বাইবেলের উপরে রাখলো। তারপর বিহ্বল চক্ষে তাকিয়ে সে মৃদুকণ্ঠে আবার ব'লতে লাগ্লো—"এই ঘটনার আগের দিন রাত্রে আমি এক স্বপ্ন দেখি। সে-কথাও বলছি আপনাকে। একজন চাকর আমার ঘরে ঢুকে বললো—'হুজুর! গাড়িতে ঘোড়া জোতা

হয়েছে। এই বেলা বেরিয়ে পড়ুন!' তখন বরফ ঝরছিল অবিশ্রান্ত ভাবে। ঘোড়া দুটি গাড়ি নিয়ে তারই মধ্যে দাঁড়িয়েছিল। সেখানে গিয়ে আমি গাড়ি চালাবার জন্যে গাড়িতে উঠে বস্‌লাম। কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে দেখি ঘোড়া দু'টির পেট পর্যন্ত বরফের স্তূপে ডুবে গিয়েছে। হঠাৎ পেছনে তাকিয়ে দেখি গোলাবাড়িতে আগুন লেগেছে। তারই লাল আভা পড়েছে বরফের ওপর। জ্বল্‌জ্বল্‌ ক'রছে। ঘোড়া দু'টি ছুট্‌তে শুরু করলো, আর আমি যেন গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে লাগাম হাতে তাদের পাশে পাশে ছুট্‌তে লাগলাম। নিশ্বাস নিতে আমার কষ্ট হচ্ছিলো। দম বন্ধ হবার জোগাড় আর কি! লাগামটা এমন ভাবে আমার হাতে জড়িয়ে গিয়েছিল যে, ছাড়াতে পারছিলাম না। এম্‌নি ক'রে ছুট্‌তে ছুট্‌তে রেলওয়ে ব্রীজ পর্যন্ত এলাম। সেখানে নদীটা অনেক বড় হয়ে গিয়েছে—জলও অনেকটা গভীর। সেখানে এসেও কিন্তু ঘোড়া থামলো না—ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট্‌তে লাগ্‌লো। তাকিয়ে দেখি, সারা আকাশ আলোয় আলোময়। নদীর জল জ'মে বরফ হ'য়ে গিয়েছিল। ভয় হ'লো—এই জমাট বরফ গাড়ি ও ঘোড়ার ভার সইতে পারবে কিনা! সেই তেজীয়ান ঘোড়া দুটি নেমে গেল দ্রুতগতিতে। বরফ কিন্তু তেমনি জমাট হ'য়ে রইলো।

"চেয়ে দেখি—ওপারে সাইমন দাঁড়িয়ে আছে। ঘোড়া দুটি যখন গাড়ি সুদ্ধ বরফের ওপর দিয়ে ছুট্‌তে লাগলো, আমি তখন চীৎকার ক'রে ব'লছি—'সাইমন! সাইমন! আমাকে সাহায্য কর। আমাকে বাঁচাও।' সে জবাব দিলো—'গোলাবাড়িতে আগুন লেগেছে, সব পুড়ছে—আমাকে এক্ষুনি বাড়ি যেতে হবে।' কিছুতেই আমি গাড়ির ওপরে উঠ্‌তে পারছিলাম না। ঘোড়া দুটি তাদের পাশেই আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। আর্তকণ্ঠে আমি চেঁচিয়ে উঠ্‌লাম—'সাইমন! আমাকে রক্ষা কর। আমার হাত থেকে লাগাম খুলে দাও।' সে বল্‌লে—'ওটা

তোমাকে নিজেকেই খুলতে হবে। আমাদের দু'জনের ভার বরফ সইতে পারবে না।' আমি চীৎকার ক'রে বল্‌লাম—'দোহাই তোমার! আমার যা আছে, গাড়ি ঘোড়া সব কিছু, সর্বস্ব তোমাকে দেব। একটু সাহায্য কর। ভগবানের দোহাই, একটু সাহায্য কর।'

"সে আমার দিকে ফিরে তাকালো। ঘোড়া দু'টি তৎক্ষণাৎ স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে গেল। কিন্তু সাইমন্ যেই বরফের ওপর পা দিয়েছে—অম্‌নি জমাট্ বরফে ফাটল দেখা গেল। সে লাগাম তুলে ধরতেই বরফের স্তূপ গেল ফাঁক হ'য়ে। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি ঘোড়া সুদ্ধ সাইমন ও আমি জলে গিয়ে পড়লাম। আমি ডুবে যাচ্ছিলাম। এমন সময় আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল।"

সে এবার থামলো। একেবারেই থামলো।

আমার কাছ থেকে সে কোনো মন্তব্য শুনবে আশা করেনি। আর, আমারও কিছু বলবার ছিল না। আমি অবাক হ'য়ে দেখলাম এই কয় মিনিটের মধ্যেই সে কেমন বুড়ো হ'য়ে গেছে। তার চিবুক হয়েছে ছুঁচলো, চোখের দৃষ্টি যেন নিভু নিভু, কণ্ঠস্বর ভগ্নপ্রায়, হাতের চামড়া গেছে কুঁকড়ে। সর্বাঙ্গ তার দুর্বল। বার্ধক্যের চিহ্ন যেন তার অঙ্গে অঙ্গে। যে তীক্ষ্ণবুদ্ধি, শক্তিশালী, বলিষ্ঠ পুরুষ আমার সাম্‌না সাম্‌নি বসেছিল—সে যেন হঠাৎ কুঁকড়ে গিয়েছে।

আমি যখন তার কাছ থেকে বিদায় নিলাম, সে তখন মুখ তুলেও চাইলো না। আমি যে চলে যাচ্ছি, এ যেন সে লক্ষ্যই ক'রলো না। যে নীরবতা, নিস্তব্ধতা তার জীবনের সবটাই একরকম ঘিরেছিল—সেটা যেন আবার এসে তাকে জড়িয়ে ধরলো। মনে হ'লো সেই অখণ্ড নীরবতা যেন তাকে মরণের পথে নিয়ে চলেছে।

পরদিন সকালে তাকে আদালতে হাজির করবার জন্যে জেল-দারোগা তার কক্ষে গিয়ে উপস্থিত। সে তখন জানলার কড়িকাঠে ফাঁস লাগিয়ে ঝুলছে।

স্টেফান ট্‌সোয়াইগ্‌—

অদৃষ্টের পরিহাস

নেপল্‌স্‌ বন্দরে জাহাজ থেকে মাল নামানোর সময় একটা দুর্ঘটনা হয়। সেটা ১৯১২ সালের মার্চ মাসের ঘটনা। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে কত রকমের আজগুবি মিথ্যা খবরই না প্রকাশিত হয়েছিল খবরের কাগজে কাগজে! অন্যান্য যাত্রীর মত ঘটনাটির দিকে আমারও তেমন নজর ছিল না। আমি তখন ভিড় এড়িয়ে কি ক'রে পারে নামতে পারি তাই নিয়ে ব্যস্ত। সন্ধ্যাটা যাতে নির্বিঘ্নে কাটে, সেই ছিল আমার আশা। দুর্ঘটনার কারণ আমি জানতাম। অনেক বছর পার হয়ে গেছে এই ঘটনার পর। এখন আমার ইচ্ছে হচ্ছে যে, চুপ ক'রে না থেকে এবার আমি আসল ব্যাপারটা খুলেই বলি।

আমি তখন মালয়-ষ্টেটে কাজ ক'রে বেড়াচ্ছি। হঠাৎ একটা তার এলো দেশের বাড়ি থেকে। পারিবারিক ব্যাপার। তখনই ছুটতে হ'লো। সিঙ্গাপুর থেকে উটন জাহাজে রওনা হ'লাম। জাহাজে সেবার বেজায় ভিড়। আমার কেবিনটা ছিল ঠিক এঞ্জিনের পাশেই। বড় গরম বোধ হ'তো সেখানে। কেবিনে আলোও ঢুকতো বড় কম। বাতাস তো একেবারেই আসতো না। তাই সর্বক্ষণ আমাকে পাখাটা চালাতেই হ'তো। সব সময়ই এঞ্জিনের আওয়াজ আসতো নিচে থেকে। সে কী ঝক্‌ঝক্‌ আওয়াজ! কেবিনটাকে কাঁপিয়ে তুলতো একেবারে। মনে হ'তো, সারা দিনরাত ধরেই যেন একটা কয়লাবাহী কুলি, মোট নিয়ে

সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত যাওয়া আসা করছে। তার ওপর, জাহাজের ওপর তলায় যাঁরা পায়চারী ক'রে বেড়াতেন তাঁদের জুতোর মস্‌মসানিও শুনতে পেতাম কানে।

মালপত্তর সব কেবিনটার একটা কোণে ভালোভাবে গুছিয়ে রেখে আমি গেলাম ওপরকার ডেকএ। দক্ষিণ বাতাসের সেখানে ছড়াছড়ি। প্রাণ, মন, শরীর সব যেন জুড়িয়ে যায়। কিন্তু সেখানেও ভিড়ের কম্‌তি নেই। চারিদিকে লোক গিস্‌গিস্ করছে। চারিদিকেই কোলাহল। আমার চারপাশেই লোক। অনর্গল তারা বক্‌বক্ ক'রে চলেছে। ওদিকে ডেক চেয়ারে শুয়ে আছেন মহিলারা। মাঝে মাঝে ভেসে আসছে তাঁদের চটুল হাসি। তাঁদের সেই হাসির ফোয়ারা, আর পুরুষ যাত্রীদের অকারণ কোলাহল কিছুই আমার ভালো লাগছিল না। কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ ক'রছিলাম। মালয়, বর্মা, শ্যাম, সমস্ত অপরিচিত জায়গাতেই আমি গিয়েছি। একে একে মনে হচ্ছিল পুরোনো স্মৃতি সব। অবসর সময়ে সেই সব স্মৃতির ছবি আমি মনের পটে এঁকে রাখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু এই গণ্ডগোলে বিশ্রাম করবার কোনো উপায় নেই। বই পড়বার চেষ্টাও ক'রেছিলাম বার কয়েক। কিন্তু মন বসেনি তাতে।

তিনদিন ধ'রে আমি সহযাত্রীদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে, তাদের মতো নিজেকে মাতিয়ে নিতে চেয়েছি। বিস্তীর্ণ ঐ নীল সমুদ্রের দিকে চেয়ে সময় কাটাতেও চেষ্টা করেছি কত। যেদিকে তাকাই সেদিকেই শুধু নীল জল। মাঝে মাঝে রাত্রে কেবল সমুদ্রের কোন কোন জায়গা আলোয় ঝক্‌মক্ ক'রে উঠ্‌তো। এইভাবে কেটে গেল তিনদিন, তিনরাত। যাত্রীদের কোলাহল তখন অসহ্য হ'য়ে উঠেছে। বাধ্য হ'য়েই কেবিনে ফিরে আসি। সাংহাই থেকে দুটি ইংরেজ তরুণী উঠেছিলেন।

আহারের আগে পর্যন্ত তাঁরা কি ভীষণ ভাবে নাচের গৎ বাজাতে শুরু করেন। অদ্ভুত, উৎকট সেই সুর। পালিয়ে বাঁচি। আমি চিরদিনই একলা থাকতে ভালোবাসি। নির্জনতা ও নীরবতাই যেন আমার কাম্য।

বিকেলবেলাকার খাবারের সঙ্গে দু'বোতল মদ সাবাড় ক'রলাম। ভাবলাম নৈশভোজ ও নাচের উৎপাত থেকে অন্তত রেহাই পাওয়া যাবে। ঘড়ির কাঁটাকে এইভাবে উপেক্ষা ক'রতে চাইলাম। ভাবলাম, স্বচ্ছন্দমনে কল্পনার রাজ্যে বিচরণ ক'রব। তন্দ্রা গেল টুটে। চেয়ে দেখি সন্ধ্যার ছায়া পড়েছে জাহাজের গায়ে। কেবিনটাও যেন তেতে উঠেছে খুব। আমি তখন গরমে ঘামছি। পাখাটা চালিয়ে দিলাম। আবার বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। একটু পরে ঘুম ভেঙে যেতেই মনে হ'লো, রাত অনেক হয়েছে। কারণ, গানের আওয়াজ তো আর নেই। ওপরতলাকার চলাফেরার শব্দও তখন থেমে গিয়েছে। শুধু সেই রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বিরাট যন্ত্রদানবের শব্দ হচ্ছিল—ঝক্ ঝক্ ঝক্।

আমি বাইরে বেরিয়ে অন্ধকারের মধ্যে কোনোরকমে ডেকএ গিয়ে হাজির হ'লাম। ডেক শূন্য। কেউ কোথাও নেই। নজর গিয়ে পড়্লো জাহাজের বড় বড় চোঙ্গুলির দিকে, তারপর আকাশে। তারায় ভরা এমন সুন্দর আকাশ এর আগে চোখে পড়েনি কোনদিন। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছিল তখন। বড় আরামদায়ক সে হাওয়া। দূরে দূরে দ্বীপগুলি যেন ভাস্ছে। হাওয়ার সঙ্গে ভেসে আসছে সুমিষ্ট গন্ধ, সেই সব দ্বীপ থেকে। রাত্রির এই স্বপ্নিল মাদকতায় নিজেকে যেন বিলিয়ে দিতে মন চায়। ডেকএর ওপর শুয়ে ইচ্ছে করে আকাশের তারার দিকে চেয়ে থাকি, বুঝতে চেষ্টা করি কি ওদের ভাষা। ডেক-চেয়ারে যাত্রীরা সব ঘুমোচ্ছে। ধারে কাছে কোথাও এমন নিরিবিলি একটা জায়গা চোখে পড়ল না, যেখানে আমার মত কল্পনা বিলাসী একটু বিশ্রাম-

সুখ উপভোগ করতে পারে। অনন্যোপায় হ'য়ে রেলিং ধ'রে দাঁড়িয়ে থাকি। ঠাণ্ডা হাওয়ায় চোখ বুজে আসে।

হঠাৎ শুকনো একটা কাসির আওয়াজে তন্দ্রা টুটে যায়। অস্পষ্ট আলোতে চোখে পড়ে একজোড়া চশ্‌মা তাকিয়ে আছে আমার দিকে। লোকটির কাছে গিয়ে জার্মান ভাষায় বলি—"আমাকে ক্ষমা করুন স্যার!" তিনিও জার্মান ভাষায় জবাব দিলেন—"সে কি, ক্ষমা ক'রবার কি আছে!"

আমার যেন তখন মনে হ'লো, আমি যেমন কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে তাঁকে লক্ষ্য করছি তিনিও তেমনি আগ্রহভরা চোখে আমার দিকে চেয়ে আছেন। ভালো ক'রে তাঁর চেহারাটা বোঝা যায় না, সেই আব্‌ছা আলোতে। কানে ভেসে আসে তাঁর নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ আর মুখের জ্বলন্ত পাইপটার মৃদু আওয়াজ। কিন্তু দু'জনেই আবার চুপ্‌ চাপ্‌। এ নীরবতা আমার ভালো লাগে না। ইচ্ছে হয়, সেখান থেকে চলে যাই। ভারী অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। পকেট থেকে একটা সিগারেট বের ক'রে ধরিয়ে ফেলি। দেশলাইয়ের আলো জ্বলে উঠ্‌তেই ভদ্রলোককে দেখতে পেলাম, তিনিও দেখলেন আমাকে। কিন্তু তাঁকে আমার অপরিচিত ব'লেই মনে হ'লো। কারুর মুখেই কোন কথা নেই। দীর্ঘকাল ধ'রে এই নিস্তব্ধতা আমাকে অস্থির ক'রে তুল্‌লো। আমি আর চুপ ক'রে থাকতে না পেরে বল্‌লাম—"আচ্ছা চলি, নমস্কার।" ভদ্রলোক এবার বেশ জোরেই ব'লে উঠ্‌লেন—"নমস্কার। কিন্তু ক্ষমা ক'রবেন, একটু দাঁড়িয়ে যাবেন। আমার একটা কথা আছে।" অবাক হ'য়ে ফিরে দাঁড়াই।

ভদ্রলোক বেশ তাড়াতাড়িই ব'লে চলেন—"ব্যক্তিগত একটা শোকে আমি বড় মুহ্যমান। তাই, এখানকার কারুর সঙ্গেই এ পর্যন্ত আলাপ ক'রে উঠ্‌তে পারিনি। আপনার কাছে অনুরোধ, কাউকে যেন ব'লবেন

না আমি এই জাহাজেই আছি। আমি তাহ'লে আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।" বলতে বলতে তিনি হঠাৎ মাঝপথে থেমে যান। আমি তাঁকে বললাম—"কথা দিচ্ছি, আপনার কথা কাউকেই ব'লব না। আমি একজন ভবঘুরে মানুষ। এখানে আমারও পরিচিত কেউ নেই।"

ঘুমে তখন আমার দু'চোখ জড়িয়ে আসছে। ভদ্রলোকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কেবিনে ফিরে এলাম। রাত্রে কিন্তু ভালো ঘুম হ'লো না।

যাত্রাপথের খুঁটিনাটি অনেক ব্যাপার মনের মধ্যে বেশ একটা ছাপ রেখে যায়। সহযাত্রী ঐ ভদ্রলোকটির প্রতি আমি যেন কেমন আকৃষ্ট হ'য়ে পড়ি। সারাদিন কেটে যায় অস্থিরতার মধ্যে। রাত্রে ভদ্রলোককে দেখবার জন্য আমি উদগ্রীব হ'য়ে উঠি; কিন্তু দিন যেন আর কাটতেই চায় না। শুয়ে পড়লাম বিছানায়। গত রাত্রের মত নির্দিষ্ট সময়েই আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। রেডিয়াম লাগানো টাইমপিস্‌টার দিকে তাকিয়ে দেখি—রাত তখন দুটো। কেবিন ছেড়ে তাড়াতাড়ি ডেকএ গিয়ে হাজির হ'লাম।

কালকের রাতের মতো আজকের রাতটাও গম্ভীর, নিস্তব্ধ। সারা আকাশ ছেয়ে গেছে তারায় তারায়। এগিয়ে গেলাম ডেকএর ওপর দিয়ে। অপরিচিত সেই লোকটার উদ্দেশে। সে কি এখন জাহাজের কুণ্ডলী পাকানো কাছির পাশে ডেক-চেয়ারে ব'সে আছে! নির্দিষ্ট জায়গার কাছাকাছি হাজির হ'তেই নজরে পড়ল লাল্‌চে আলো। ভদ্রলোক পাইপ্ টানছিলেন। হাঁ, তিনি তাঁর নির্দিষ্ট আসনেই ব'সে আছেন ঠিক। যদিও মন সায় দিচ্ছিল না, তবু একবার মনে হ'লো,—কাজ নেই ওঁর কাছে গিয়ে, ফিরে যাই। এমন সময় ভদ্রলোক যেন আমায় দেখে ফেললেন। চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে আমার হাতটা ধ'রে বল্লেন—"একি, এত কাছে

এসেও আপনি চ'লে যাচ্ছিলেন কেন? আসুন, আসুন, আমার পাশে এসে বসুন।"

আমি বল্লাম—"তা, নয়। আপনাকে বিরক্ত ক'রতে ইচ্ছে হ'লো না তাই ফিরে যাচ্ছিলাম।"

তিনি দুঃখ প্রকাশ ক'রে বল্লেন—"সে, কি! আপনার উপস্থিতি তো আমার কাছে পরম আনন্দের, বিরক্ত হ'তে যাব কেন?"

একটু থেমে আবার তিনি বল্তে সুরু ক'রলেন—"বহুদিন ধ'রে আমার একা একাই কেটেছে। ভালো ক'রে কারুর সঙ্গে দুদণ্ড কথা বলার অবকাশ পাইনি পর্যন্ত। কিন্তু এমনি ক'রে চুপ্‌চাপ থাকতে আর ভালো লাগে না আমার। কেবিন তো নয়, যেন কয়েদখানা! আর যাত্রীদের ঐসব হট্টগোল, হাসাহাসি তাও যেন অসহ্য।" চেয়ার ছেড়ে উঠে প'ড়লেন ভদ্রলোক। আমার দিকে তাকিয়ে আবার ব'ল্লেন—"বড্‌ড বেশি কথা বলি আমি, তাই না? আপনার হয়তো কষ্ট হচ্ছে!"

আমি তাঁকে বসতে অনুরোধ ক'রে ব'ললাম—"না, না, কষ্ট হওয়া তো দূরের কথা, আপনার সঙ্গলাভ ক'রে, এই তারায় ভরা আকাশের নিচে কত আনন্দই না পাচ্ছি; আপনার সঙ্গে কথা ব'লে সুখ মিলবে।···নিন্, এই যে সিগারেট।" এই ব'লে তাঁকে একটা সিগারেট এগিয়ে দিয়ে দেশলাইটা জ্বাল্লাম। ক্ষীণ আলোতে ভদ্রলোকের পরিচিত মুখখানি আর একবার বেশ ক'রে চোখে প'ড়ল।

আমার যেন ম'নে হ'লো ভদ্রলোক আমাকে তাঁর কাহিনী শোনাতে চান। দু'জনেই আমরা কুণ্ডলী পাকানো সেই জাহাজের কাছির ধারে ব'সেছিলাম। একটু পরে ভদ্রলোক হঠাৎ ব'লে উঠ্‌লেন—"আপনি বুঝি খুব ক্লান্ত?"

—"কই, না তো!"

—"তাহ'লে একটু বসুন দয়া ক'রে। আপনাকে আমি কিছু বলতে চাই।"

বেশ একটু ন'ড়ে চ'ড়ে ব'সে তিনি স্পষ্ট ভাষায় ব'ল্‌তে শুরু ক'রলেন —"আমি একজন চিকিৎসক। ধরুন, কাহিনীটা আমার জীবনকে কেন্দ্র ক'রেই। আমাকে একটু উত্তেজিত মনে হচ্ছে, না? তাই ব'লে বিচলিত হবেন না যেন। ভাববেন্ না বেশি মদ খেয়েছি ব'লে, আমার এই উত্তেজনা। তবে এটা ঠিক যে, মদটা একটু বেশি মাত্রাতেই খেয়ে ফেলেছি। জাহাজের ওপর এতটা খাওয়া উচিত নয়।

"কিন্তু এই প্রাচ্যদেশের একঘেয়ে জীবনে, মদ না খেয়ে আর খাব কি বলুন। সাত সাতটি বছর ঘুরে বেড়িয়েছি এই দেশের লোকেদের মধ্যে, অনেক সময়ই কেটেছে বনে বনে জন্তু জানোয়ারের আশ্রয়ে। এ অবস্থায় কি ক'রে মাথা ঠিক থাকে! ভদ্রভাবে চলিই বা কি ক'রে? হঠাৎ যদি দেশের কোনো লোককে কাছে পাওয়া যায়, তা হ'লে তার সঙ্গে প্রাণ খুলে দুটো কথা বললে সুখ লাভ ক'রতে পারি।"

হঠাৎ তিনি যেন সেই অন্ধকারে কি খুঁজতে লাগলেন। ঠুন্ ক'রে কিসের যেন আওয়াজও হ'লো। মনে হ'লো তাঁর পাশে দুটো মদের বোতল রয়েছে। এক পেগ্ হুইস্কী ঢেলে আমায় বল্‌লেন—"চল্‌বে কি একটু?"

গ্লাসটা হাতে নিয়ে এক চুমুকে কিছুটা পান ক'রলাম। আর গ্লাস নেই। ভদ্রলোক তাই বোতলে মুখ দিয়েই ঢক্ ঢক্ ক'রে খেলেন বেশ খানিকটা।

ঘড়িতে আড়াইটে বাজার ঘণ্টাধ্বনি হ'লো। ভদ্রলোক একটু ইতস্ততঃ ক'রে আবার ব'ল্‌তে শুরু ক'রলেন—"ঘটনাটা আমি আপনাকে আগাগোড়া খুলেই ব'লছি। এর মধ্যে কোনো লজ্জা নেই। গোপন করবার মতও

কিছু দেখছি না। আমার কাছে চিকিৎসার পরামর্শ নিতে রুগীরা প্রায়ই আসত। কারো কোনো গোপনীয় রোগ থাকলে, আমাকে তার দেহ অনাবৃত ক'রে বিশেষ কোন স্থান পরীক্ষা ক'রে দেখতে হ'তো। এই রকম দেখতে গিয়ে সূক্ষ্ম রুচিবোধ আমার আর ছিল না। প্রাচ্যের দেশগুলি রহস্যাবৃত সন্দেহ নেই। এখানকার মন্দিরগুলির শিল্পসৌন্দর্যও যথেষ্ট। কিন্তু এসব থাকা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে প্রাণ আমার হাঁপিয়ে উঠ্‌ত। দেহের শক্তি যেন ফুরিয়ে আসত ক্রমে ক্রমে। ম্যালেরিয়া জ্বর হ'লে কুইনাইনই খাওয়া চলত, কিন্তু এসব জ্বরে শরীর আর থাকে না, মানুষ নিজের শক্তি যেন হারিয়ে ফেলে। য়ুরোপের কোনো ভদ্রলোককে শহর ছেড়ে গাঁয়ের ঘরে যেতে হ'লে, তিনি মনের সকল আনন্দ ও শান্তি যেন একেবারে হারিয়ে ফেলেন। সেই নিদারুণ অবস্থা থেকে রেহাই পাবার জন্য কেউ কেউ মদ ধরেন। জীবনকে তাঁরা ভুলে থাকতে চান। কেউ কেউ বা ঘরে ফিরে যাবার জন্যে অস্থির হ'য়ে ওঠেন। এইভাবেই কেটে যায় বছরের পর বছর। কোনো আনন্দ নেই, কোনো বৈচিত্র্য নেই এ জীবনে।

"জার্মানীতেই আমি ডাক্তারী পড়ি। পাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই লিপ্‌জিগের ক্লিনিকে একটা চাকুরী জুটে যায়। ধীরে ধীরে বেশ নাম ছড়িয়ে পড়লো আমার। পসারও জমে উঠ্‌লো বেশ। এমনি সময় প্রণয় সংক্রান্ত একটা ব্যাপারে প'ড়ে গিয়ে ভবিষ্যৎ-জীবনটা একেবারে নষ্ট ক'রে ফেলি। হাসপাতালের একটি মেয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হ'য়। সে একটি ভদ্রলোকের প্রেমে পড়ে। তাঁকে সে একেবারে পাগল ক'রে তুলেছিল। শেষ পর্যন্ত তাঁকে না পেয়ে ভদ্রলোক একেবারে আত্মহত্যা করতেই উদ্যত হন।

"আমার অবস্থাও অনেকটা সেই ভদ্রলোকের মত হয়েছিল। যে-সব

মেয়ে লজ্জা বিসর্জনে দিয়ে পুরুষের ওপর অনায়াসেই তার কর্তৃত্ব খাটাতে পারে, আমি তাদের কাছে হেরে যাই। না গিয়েই উপায়ই বা কি! এই ধরনের এক মেয়ে-ই আমাকে সম্পূর্ণ বশ ক'রে ফেলেছিল। সে আমাকে যখন যা আদেশ ক'রত, আমি নির্বিচারে তা পালন ক'রতাম। তার জন্যই একবার আমাকে হাসপাতালের সিন্ধুক থেকে টাকা চুরি ক'রতে হয়। শেষটায় সব জানাজানি হ'য়ে যায়। কিন্তু আমার এক কাকা আমাকে বাঁচিয়ে দেন। হাসপাতালের টাকাটা তিনিই পরিশোধ করেন।

"এই ঘটনার পর লিপজিগে আর চাকুরীই পেলাম না। হঠাৎ খবর পেলাম ডাচ্-সরকার তাঁদের উপনিবেশের জন্য জনকয়েক ডাক্তার চাই ব'লে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। দরখাস্ত পাঠিয়ে দিলাম সঙ্গে সঙ্গে। চাকুরীও পেয়ে গেলাম একটা। দশ বছরের জন্য চুক্তি হ'লো। আগাম টাকাও পেয়ে গেলাম অনেক। তার অর্ধেকটা পাঠিয়ে দিলাম কাকাকে, আর বাকীটা শহরের এক মেয়ের পেছনে খরচ ক'রলাম। এইভাবে একরকম কপর্দকশূন্য অবস্থায় ইউরোপ থেকে বেরিয়ে পড়লাম। আপনি এখন ঠিক যে-ভাবে ব'সে আছেন, আমিও ঠিক অমনি অবস্থায় তখন জাহাজে বসেছিলাম। দিন কেটে গেল একে একে।

"ওদিকে ডাচ্-সরকার আমাকে ব্যাটাভিয়া বা ঐ ধরনের কোন শহরে না পাঠিয়ে এমন একটা জায়গায় ঠেলে দিলেন যেখানে শ্বেতকায় নরনারীর দর্শন মেলা ভার। মেশবার তেমন কোনো ঠাঁইও ছিল না সেখানে। সেখানকার সোসাইটি যেন কতকগুলো বেরসিকের আড্ডা! আবার দো-আঁশলা জাতের লোকও ছিল সেখানে। ধীরে ধীরে একরকম ক'রে টিকে গেলাম! কাজের জন্যে আর পড়াশোনার তেমন অবসর মিল্‌তো না। ধীরে ধীরে সেখানকার জলবায়ুও আমার সহ্য হ'য়ে এলো।

"উপনিবেশে যে-সব শ্বেতকায় লোক থাকতো তাদের সঙ্গে মিশ্‌তে আমার তেমন ভাল লাগতো না। তাই একা একাই কাটতে লাগলো আমার জীবন। তখন এই মদই ছিল আমার একমাত্র সঙ্গী। যখন কোনো কাজ থাকতো না হাতে, তখন ব'সে ব'সে আকাশ পাতাল কত কী-ই না চিন্তা ক'রতাম। চুক্তি মত আমার কাজ শেষ হ'তে আর দু'বছর মাত্র বাকী ছিল। তারপর কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ ক'রে নিজের খেয়াল খুশি মতো য়ুরোপে গিয়ে জীবন কাটানো যেতো। এই দু'বছর শেষ হবার প্রতীক্ষায় দিন গুনছিলাম। কিন্তু হঠাৎ একটা কাণ্ড ঘটে গেল এর মধ্যে।"

কথা বল্‌তে বল্‌তে তিনি থেমে গেলেন। জাহাজ তখন নিস্তব্ধ, নিঝুম। চতুর্দিক এত নীরব যে জাহাজের চাকার আওয়াজ স্পষ্ট আমার কানে আসতে লাগলো। ইচ্ছে হ'লো একটা সিগারেট ধরাই। পরক্ষণেই আবার ভাবলাম, দেশলাইয়ের সামান্য শব্দে আর আলোয় হয়তো তিনি চম্‌কে উঠ্‌বেন। কাজ কি তাঁর চিন্তাসূত্র ছিন্ন ক'রে! কি হ'লো তিনি যে একেবারে চুপ ক'রেই রইলেন, ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি!

এইসব যখন ভাবছি, ঘড়িতে তখন তিনটে বাজার শব্দ হ'লো।

ভদ্রলোক হঠাৎ নড়েচড়ে বস্‌লেন। মনে হ'লো তিনি যেন একটা মদের বোতল হাতে ক'রে তুলছেন। নিস্তব্ধতা আবার ভঙ্গ হ'লো। ভদ্রলোক ব'লে উঠ্‌লেন—"শুনুন তারপর। আমি তো সেখানকার কর্মের বেড়াজালে নিজেকে বেশ ক'রে জড়িয়ে ফেল্‌লাম। মাঝে মাঝে হাতে যখন কাজ থাকতো না, তখন যেন আমি আমার ছোট্ট ঘরে জেলখানার কয়েদীর মত বন্দী। সময় যেন আর ফুরোতে চায় না। বর্ষাও শেষ হয়ে এলো। ক্রমাগত সাতদিন ধ'রে ছাতের ওপর বৃষ্টিধারার শব্দ শুনলাম। এর মধ্যে কিন্তু আমার বাড়িতে কারো পায়ের ধুলোও

পড়েনি। সেখানকার কোনো বাসিন্দা অথবা কোনো য়ুরোপীয় ভদ্রলোক কেউই আসেননি একটিবার। বাড়িতে ছিলো একটা ঐ-দেশী চাকর আর ছিল এই মদের বোতল। ওরাই ছিলো আমার বন্ধু।

"উপন্যাসের পাতায় যখন দেশের কথা ইউরোপের সুন্দরী মেয়েদের কথা পড়তাম, তখন আমার প্রাণ কেঁদে উঠতো দেশের জন্যে। মনে প'ড়ে যেতো আলোকোজ্জ্বল রাস্তাঘাট, বাড়িঘর।" একটু থেমে আবার তিনি বল্‌তে শুরু ক'রলেন—"আপনি হ'লেন ভবঘুরে মানুষ। কিন্তু আপনি জানেন না ওসব দেশের লোকের অবস্থা কি রকম। শ্বেতকায় ভদ্র-লোকেরাও ওখানে নানারকম দেশী অসুখে ভুগে কষ্ট পান। বিকারের ঘোরে তাঁরা দেশে ফিরে যাবার জন্যে কত না আকুলিবিকুলি করেন। তাঁদের কথা চিন্তা ক'রতে ক'রতে আমার মন ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠ্‌তো। টেবিলের ওপর প'ড়েছিল ম্যাপ। এরপর কোথায় কোথায় আমাকে যেতে হবে তাই দেখছিলাম মন দিয়ে। এমন সময় আমার চাকর এসে জানালে—'আপনার সঙ্গে একজন মেমসাহেব দেখা করতে এসেছেন।' অবাক হ'য়ে মুখ তুলে তাকালাম। কোনো ঘোড়ার গাড়ী বা মোটর-কারের আওয়াজ কানে এলো না। ভাবলাম—কে এই শ্বেতাঙ্গ মহিলা? কেনই বা এই নির্জন স্থানে এসেছেন? আমার সঙ্গে তাঁর কি দরকার?

"আমি তখন দোতালার বারান্দায় ব'সেছিলাম। উঠে গিয়ে পোশাকটা পাল্‌টে এলাম দু'তিন মিনিটের মধ্যে। ভদ্রস্থ হ'লাম আর কি! সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামবার সময় কিন্তু কেমন যেন একটা স্নায়বিক দুর্বলতা অনুভব করছিলাম। নাম্‌তে নাম্‌তে আবার ভাবছিলাম—কে ইনি? কি উদ্দেশ্যেই বা এখানে এসেছেন?

"নিচে বস্‌বার ঘরে মহিলাটি একখানি চেয়ার দখল ক'রে বসেছিলেন। তাঁর পেছনে একটি চীনা ছোকরা। বোধ হ'লো মহিলাটির চাকর।

আমাকে নামতে দেখেই মহিলাটি এক লাফে চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে আমাকে সাদর সম্ভাষণ জানালেন। তাকিয়ে দেখলাম তাঁর মুখখানি ওড়না দিয়ে ঢাকা। আমি কথা বল্‌বার আগেই তিনি ইংরেজীতে বল্‌তে শুরু করলেন—'আমায় মাফ্‌ ক'রবেন ডাক্তার। আপনার সঙ্গে আগে থাকতে কোনো যোগাযোগ ক'রে আসতে পারিনি। এই বস্তীর পাশ দিয়ে মোটর ক'রে যাচ্ছিলাম। মনে হ'লো আপনি তো এখানেই থাকেন। লোকের মুখে আপনার সুখ্যাতি আর ধরে না। এখানে সবাই আপনাকে চেনে। আচ্ছা, আপনি শহরে কেন আসেন না বলুন তো? এখানে এই নির্জন বাড়িতে কি ক'রে থাকেন? আপনার এই বৈরাগ্যের কারণটা জানতে পারি কি?'

"আমাকে জবাব দেবার সুযোগও দেন না তিনি। একটানা কেবল ব'কেই চলেছেন। তাঁর কথা বলবার সময় লক্ষ্য করলাম, তিনি যেন স্নায়বিক দুর্বলতায় ভুগছেন। এটা তাঁর অঙ্গভঙ্গিতেই সুস্পষ্ট। অনর্গল এই যে কথা বলছেন, এর মানে কি! আর নিজের পরিচয়টাও দিচ্ছেন না, এরই বা কি কারণ থাকতে পারে, ভেবে পেলাম না। বেশ একটু অবাক হ'লাম। একবার ভাবলাম, তিনি বোধ হয় অসুস্থ। আর একবার মনে ক'রলাম ভদ্রমহিলা বিকৃতমস্তিষ্কা।

"কথায় কথায় আমি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছি। তিনি কিন্তু সমানে প্রশ্ন ক'রে যাচ্ছেন। শেষটায় যখন তাঁর বক্তব্য শেষ হ'লো, তখন তাঁকে অভ্যর্থনা ক'রে ওপরে নিয়ে গেলাম। ওপরকার বসবার ঘরটা তিনি বেশ ক'রে একবার দেখে নিয়ে বল্‌তে শুরু ক'রলেন—'এখানকার ঘরগুলি কিন্তু বেশ। আপনার বইগুলোও ভারী সুন্দর। ইচ্ছে ক'রছে সবগুলোই প'ড়ে ফেলি।'

"মহিলাটি উঠে গেলেন বইয়ের আলমারীর কাছে। বইগুলির নাম

দেখতে লাগলেন বেশ মনোযোগ দিয়ে। আমি তাঁকে উদ্দেশ ক'রে বল্লাম—'এক পেয়ালা চা দিই আপনাকে ?'

"তার জবাব এলো—'ধন্যবাদ। এখন থাক। হাতে আর সময় নেই মোটে। দেখুন, একটা কথা। আপনার বইগুলি দেখে মনে হচ্ছে, আপনি বেশ ভালো ফরাসী জানেন। তাই না ? আর আমাদের ডাক্তারটির কথা বল্‌বেন না। ব্রিজ খেলতেই ওস্তাদ। অন্য কাজে অষ্টরম্ভা ! এখান দিয়ে যাবার সময় আপনার কথা ম'নে হ'তেই চ'লে এলাম। ভাবলাম আপনার কাছ থেকে একটা পরামর্শ নেব,—নিজের কোন ব্যক্তিগত ব্যাপারে।'

"কথাগুলি তিনি ব'লে গেলেন বই দেখতে দেখতে। আমার দিকে মুখ তুলে তাকাননি তখন। একটু পরেই আবার বললেন—'আপনি এখন বড় ব্যস্ত, না ? আচ্ছা, আর একদিন আসব তাহ'লে।' আমি তাঁকে বল্লাম—'নিশ্চয়ই আসবেন। এখানে আপনার অবারিত দ্বার। যখনই আমার কাছে কোনো দরকার পড়বে, তখনই সোজা চ'লে আসবেন। কোনরকম দ্বিধা বা কুণ্ঠাবোধ ক'রবেন না যেন।'

"ভদ্রমহিলা একটুখানি ঘুরে দাঁড়ালেন। কিন্তু আমার দিকে না তাকিয়ে, তাক্ থেকে বই নিয়ে তার পাতা ওল্‌টাতে ওল্‌টাতে বল্লেন—'আমার রোগ্‌টা এমন কিছু সাংঘাতিক নয়। সাধারণতঃ মেয়েরা যে সব কষ্ট ভোগ করে, আমার অসুখটাও প্রায় সেই রকমের। যেমন ধরুন—ঘন ঘন মাথা ধরা, গা বমি বমি করা, মাঝে মাঝে মূর্ছা যাওয়া। আর বেশি কিছু নয়। আজ সকাল বেলাকার কথাই ধরুন না। মোটরে ক'রে যাচ্ছিলাম। এক জায়গায় যখন মোটর বাঁক ফিরছিল তখন আমি হঠাৎ ফিট্ হ'য়ে পড়লাম। ভাগ্যিস্ চাকরটা আমায় ধ'রে ফেলেছিল। নইলে, নিচে প'ড়ে যেতাম। বেশ খানিকটা জল খেয়ে, কিছুক্ষণ পরে,

সুস্থ বোধ করি। আচ্ছা, আপনার কি এ থেকে মনে হয় না যে ড্রাইভারটা খুব স্পীডে গাড়ি চালাচ্ছিল ?'

"আমি বল্লাম—'হঠাৎ অমন ক'রে কি প্রশ্নের জবাব দেওয়া চলে ? আচ্ছা, বলুন তো, এরকম ফিট্ কি আপনার হামেশাই হয় ?'

"তিনি বল্লেন—'না, এর মধ্যে আর হয়নি। কিন্তু গত হপ্তায় বার কয়েক হয়েছিল। সকাল বেলার দিকে আজকাল খুব অবসন্ন বোধ করি।'

"কথা বল্তে বল্তে আবার তিনি এগিয়ে গেলেন বইয়ের তাকের দিকে। একখানা বই টেনে নিয়ে নিজের মনে পাতা ওল্টাতে লাগলেন। তাঁর চলার মধ্যে কেমন যেন একটা অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য ক'রলাম। ইচ্ছে ক'রেই আমি আর কথা ব'ল্লাম না। তাঁর এই উপস্থিতি কিন্তু আমার কাছে খারাপ লাগেনি।

"হঠাৎ তিনি বেশ হাল্কা সুরেই ব'লে উঠ্লেন—'আপনার তাহ'লে মত আছে ? আমাকে দেখবেন তো পরীক্ষা ক'রে ? শক্ত কিছু নয়। দেশী রোগে ভুগছি তাও মনে করবেন না যেন। সে-সব ভয় নেই।'

"জবাব দিলাম—'আচ্ছা এগিয়ে আসুন দিকি। নাড়ীটা একবার দেখি, জ্বর আছে কিনা।'

"তাঁর দিকে এগিয়ে গেলাম। তিনি কিন্তু স'রে দাঁড়িয়ে বল্লেন— 'না জ্বর নেই আমার। ফিট্ হবার পর থেকে রোজই থার্মোমিটার লাগিয়ে দেখেছি। কিন্তু জ্বরের কোনো লক্ষণই নেই। তাছাড়া হজমও বেশ হচ্ছে।'

"তাঁর আচরণে কেমন যেন সন্দেহ হ'লো। মনে মনে ভাবলাম, তিনি যেন কি ব'লতে চাইছেন, অথচ মুখ ফুটে তা বল্তে পারছেন না। শহর থেকে দূরে এই যে তিনি সুদীর্ঘ দুশো মাইল পথ মোটরে এসেছেন

এ নিশ্চয়ই ফ্লবার্টের সাহিত্য নিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা করবার জন্যে নয়। মৌনতা ভঙ্গ ক'রে বল্‌লাম—'দেখুন, মনে কিছু করবেন না, আপনাকে গোটা কয়েক প্রশ্ন ক'রতে পারি কি ?'

"মহিলাটি জবাব দিলেন—'নিশ্চয়ই। ডাক্তারের কাছে এলাম তো সেই মনে ক'রেই।' আবার তিনি পেছন ফিরে বই ঘাঁটতে আরম্ভ ক'রলেন। আমি জিজ্ঞাসা ক'রলাম—'আপনার সন্তান কি ?'

"তিনি জবাব দিলেন—'একটিমাত্র ছেলে।'

"আবার প্রশ্ন ক'রলাম—'আপনি যখন প্রথম অন্তঃসত্ত্বা হন, তখনও কি এই ধরনের লক্ষণ অনুভব ক'রেছিলেন ?'

"তাঁর জবাব এলো—'হাঁ।' এবারকার কথা বলবার সময় তাঁর মধ্যে যেন একটা চাঞ্চল্যের ভাব দেখা গেল।

"আমি ব'ল্‌লাম—'তাহ'লে যা অনুমান ক'রছি, তাই ঠিক, কি বলুন ?'

"—'হাঁ।'

"তাঁকে পরীক্ষা করবার জন্য বল্‌লাম—'একবারটি এ-ঘরে আসুন।' তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন—'পরীক্ষার কোনো দরকারই নেই। আমার সমস্ত অবস্থাই আমি বেশ বুঝতে পারছি।' "

আর এক গ্লাস মদ নিঃশেষে পান ক'রে ভদ্রলোক ব'ল্‌তে লাগলেন—"ভেবে দেখুন ব্যাপারটা। জনহীন প্রান্তরে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করছি তখন। এমন সময় তাঁর আবির্ভাব। অনেক বছর পরে এই প্রথম চোখে পড়ল একজন ইউরোপীয় মহিলা। প্রথমটা তাঁকে দেখে কেমন যেন একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, শুধু বুঝি গল্পগুজব ক'রতেই এসেছেন। পরক্ষণেই সে ভুল ভাঙলো। একটু পরেই তিনি যা বল্‌লেন, আমি তাতে চম্‌কে উঠ্‌লাম। মনে হ'লো তিনি যেন আমায় একটা

কঠিন অস্ত্র দিয়ে আঘাত ক'রতে উদ্যত হ'য়েছেন। আমার কাছে তিনি কি ধরনের সাহায্য চাইতে এসেছেন, বুঝতে আর বাকী রইল না। এই প্রথম নয়। এ ধরনের সাহায্যপ্রার্থী হ'য়ে এর আগেও অনেক নারী আমার কাছে এসেছে। ছলোছল চোখে তারা কলঙ্কের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য কি কাকুতি মিনতিই না ক'রেছে। কিন্তু এই মহিলাটি ঠিক তাদের মতো নয়। ইনি যেন অনেকটা স্থির সংকল্প ক'রেই এসেছেন। বেশ টের পেলাম, তাঁর মধ্যে একটা তেজস্বিতা আছে। হয়তো বা তার বলেই তিনি আমাকে দিয়ে কার্য উদ্ধার করতে পারেন! আমার মনের মধ্যেও তখন একটা পাপের ছায়া ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ভারি বিরক্ত বোধ ক'রলাম। তাঁর প্রতি কেমন যেন রুষ্ট হ'য়ে উঠ্‌লাম। মনে হ'লো, তিনি আমার সঙ্গে শত্রুতা করতে এসেছেন। কথা না ব'লে খানিকক্ষণ আরাম-কেদারায় শুয়ে রইলাম। মনে হ'লো তিনি যেন ওড়নার মধ্য থেকে একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে আছেন। তাঁর দৃষ্টিতে যেন কিসের আজ্ঞা। আমি কোনো জবাব দিলাম না। এমন ভান ক'রে শুয়ে রইলাম, যেন তাঁর কোনো কথাই ভালো ক'রে বুঝিনি।

"একটু পরে কথাবার্তা শুরু হ'লো আবার। বল্‌লাম—'ভয় পাবার কিছু নেই। গর্ভের প্রথম দিকটায় এরকম ফিট্ হ'তে পারে।...'

"আমার কথায় বাধা দিয়ে তিনি হঠাৎ ব'লে উঠ্‌লেন—'সে আমি জানি। কিন্তু এখন আমার প্রধান উপসর্গ হচ্ছে বুকের ধড়ফড়ানি।'

"আমি বল্‌লাম—'হৃদ্‌যন্ত্রের কষ্টই বেশি পাচ্ছেন? বেশ তাহ'লে দেখি একবার।' এই ব'লে ষ্টেথ্‌স্কোপটার দিকে যেই হাত বাড়াতে গেছি, তিনি অম্‌নি বাধা দিয়ে ব'লে উঠ্‌লেন—'ওর আর দরকার নেই। আপনি আমার কথা বিশ্বাস করুন। মিছিমিছি পরীক্ষা করতে গিয়ে আপনার মূল্যবান সময় অপব্যয় করব না। আমার অনুরোধ, আপনি

আমার কথা বিশ্বাস করুন। বুকের কষ্ট ছাড়া আমার আর কোনো কষ্টই নেই। সত্যি বলছি, আপনার ওপরে অনেকখানি নির্ভর ক'রে আমি এতটা পথ এসেছি।'

"তার জবাবে আমি ব'ললাম—'বেশ তাহ'লে দয়া ক'রে সব কথা পরিষ্কার ক'রে খুলেই বলুন। তার আগে কিন্তু আপনাকে ঐ মুখের পরদাটা সরিয়ে ফেলতে হবে। চিকিৎসকের কাছে পরামর্শ নিতে এসে কেউ বুঝি ওভাবে মুখ ঢেকে বসে ?'

"এবার তিনি আমার সামনে ব'সে মুখের সেই ওড়নাটা তুলে দিলেন ওপরে। খাস্ ইংরেজ তরুণী। তাঁর ভরা যৌবনের অপূর্ব শ্রী আমাকে মুগ্ধ করেছিল। কিছুক্ষণ আমরা নির্বাক হ'য়ে পরস্পরের দিকে চেয়ে রইলাম।

"স্নায়বিক দুর্বলতাটা কিন্তু আগের মতই তাঁর মুখে চোখে ফুটে আছে। কাঁপা গলায় তিনি ব'লে উঠ্লেন—'ডাক্তার! আমি আপনার কাছে কি সাহায্য চাই আশা করি তা বুঝতে পেরেছেন। পারেন নি ?'

"জবাব দিলাম—'হাঁ, অনুমান করেছি, কি আপনি চান। দেখুন, খোলাখুলি ভাবেই তাহ'লে আলাপ হওয়া ভালো। আপনি এখন চাইছেন যাতে আর এই ফিট্ না হয়, গা-বমি-বমির ভাবটা যাতে চিরতরে কেটে যায়, আমি তার একটা ব্যবস্থা ক'রে দিই। সত্যি কিনা ?'

"—'হাঁ, আপনি ঠিকই অনুমান ক'রেছেন।' তিনি জবাব দিলেন।

"আমি তখন বললাম—'দেখুন, বিপদটা বড় সোজা নয়। এতে ক'রে দুজনেই বিপদগ্রস্ত হ'তে পারি। এ ব্যাপারে অপারেশন করাটা যে বে-আইনী, সে কথা বুঝি জানেন না ?'

"মহিলাটি তখন জবাব দিলেন—'আমি কিন্তু জানি, এরকম অনেক ক্ষেত্রে ডাক্তারী-আইনে, এ ধরনের অপারেশন করাটাকে বে-আইনী না ব'লে আইনসঙ্গত বৈধই বলা হয়েছে।

"আমি বল্লাম—'হাঁ, প্রয়োজন মনে ক'রলে ডাক্তাররা এরকম অপারেশন করেন।'

"তিনি বল্লেন—'আপনি যখন ডাক্তার, তখন অপারেশন করা না করা তো আপনারই হাতে।'

"তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে মনে হ'লো, তিনি যেন আমাকে এ কাজ করতে হুকুম ক'রছেন। তাঁর সেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে, নিজেকে যেন ছোট, দুর্বল ব'লে মনে হ'লো। মনে মনে প্রতিজ্ঞা ক'রে বসলাম তাঁর কাছে কিছুতেই নত হব না। একটু চিন্তা ক'রে জবাব দিলাম—'দেখুন, অন্য কোন ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে ঐমন একটা দায়িত্ব নিতে ভরসাও যেমন হচ্ছে না, সাহসও তেমনি পাচ্ছি না।'

"তিনি বল্লেন, 'অন্য ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে কি হবে? আমি তো কেবল আপনারই মতামত চাই।'

"আমি বল্লাম—'সে কি!'

"তিনি তখন ধরা গলায় বল্লেন—'আপনার সুখ্যাতি অনেক শুনেছি লোকের মুখে, তাছাড়া, আপনি শহর থেকে অনেক দূরে নির্জন স্থানে বাস করছেন, আপনার সঙ্গে আমার কোনো পরিচয়ও নেই—সব দিক ভেবে আপনার কাছে আসাই যুক্তিযুক্ত মনে ক'রলাম। আচ্ছা, এ কাজের জন্য আপনাকে যদি প্রচুর টাকা দিই, তা'হলে বোধ করি আপনি এ কাজ করতে আর অমত করবেন না?'

"বেশ একটা উত্তেজনা অনুভব ক'রলাম। ভাবলাম, অস্ত্রোপচারের জন্য যদি এতগুলো টাকা রোজগার করা যায় তো মন্দ কি? আবার মনে হ'লো, তরুণী আমাকে বশ করবার জন্যেই এই কথা বল্ছেন। ব্যঙ্গের সুরে বল্লাম—'এতগুলো টাকা আপনি দিয়ে দেবেন?'

"তিনি জবাব দিলেন—'হাঁ দেব। কিন্তু দুটো সর্তে। প্রথম সর্ত

আপনি আমার প্রস্তাবে রাজী হ'য়ে কাজ ক'রবেন। দ্বিতীয় সর্ত এই ওলন্দাজ উপনিবেশ ছেড়ে আপনি দেশে ফিরে যাবেন।'

"তাঁর কথার উত্তর দিয়ে বল্লাম—'কিন্তু তাতে ক'রে যে আমার পেন্‌সন্‌টা চিরদিনের মতো বন্ধ হ'য়ে যাবে ?'

"তিনি বল্লেন—'ভয় নেই, আপনার আমি ক্ষতি ক'রব না। আমি যে টাকা আপনাকে দেব, তা আপনার পেন্‌সনের টাকার চেয়েও অনেক বেশি হবে।'

"বল্লাম—'তবু শুনিই না, কত টাকা আপনি দেবেন ?'

"তিনি জবাব দিলেন—'এক হাজার পাউণ্ড।'

"কথা শুনে আমার যেন কেমন ভয় হ'লো। আবার রাগও হ'লো কম না। ভাবলাম; এই করে তিনি আমায় কিনে নিন্। আর ওদিকে ডাচ-গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে চুক্তিভঙ্গ ক'রে ফ্যাসাদে পড়ি! তাঁর ঐ বশ করবার ভাবটা দেখে রাগে আমার সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠ্‌ল। অন্তর্দ্বন্দ্বে আমি যেন ক্ষত বিক্ষত হ'তে লাগলাম। কি করব ঠিক ক'রে উঠ্‌তে পারছি না। এমন সময় দৃষ্টি পড়লো তাঁর সেই গর্বিত চোখ দুটির দিকে। হঠাৎ একটা পাশবিক প্রবৃত্তি আমার মনের মধ্যে জেগে উঠ্‌লো। কামনা ও লালসায় আমি যেন সর্বশরীরে শিহরণ অনুভব ক'রলাম। আবার ঘৃণাও হ'লো কম না। মনে হ'লো, আমার মধ্যে তিনি যেন সাপের বিষ ঢুকিয়ে দিয়েছেন, আর সেই বিষের জ্বালায় আমি একেবারে পাগল হ'য়ে উঠেছি। আর কোনো সঙ্কোচ না ক'রে আমি তাঁকে ব'লেই ফেল্‌লাম।

"এবার আপনাকে সেই কথাই বলব যে, কি ক'রে আমার মনে এই উন্মত্ততা এসেছিল ?"

ভদ্রলোক এবার একটু থেমে, মদের গেলাসে আবার একটা চুমুক দিলেন। বেশ খানিকটা মদ গিলে, গলাটা ভিজিয়ে নিয়ে, ব'লতে শুরু

ক'রলেন—"বন্ধু! ভুল বুঝবেন না যেন। আমি যে খুব একটা মহৎ ব্যক্তি তাও বল্‌ছি না। কিন্তু আমার কাছে যারা সাহায্যের জন্য এসেছে, তাদের আমি চিরদিন উপকারই করেছি। যে কুৎসিত, নোংরা পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে আমাকে থাকতে হ'তো, সেখানকার দুর্বল ও স্বাস্থ্যহীন নরনারীকে বাঁচিয়ে তোলাই আমি আমার ধর্ম ব'লে মনে ক'রতাম। কিন্তু কেন জানি না, এই মহিলাটিকে দেখা অবধি, আমি চঞ্চল হ'য়ে উঠেছিলাম। বেশ একটা উত্তেজনার ভাব অনুভব করেছিলাম দেহে ও মনে। তাঁর চলাফেরা ও কথাবার্তায়, বিশেষ ক'রে তাঁর ঐ খামখেয়ালী আচরণে, আমার মনের পশু-প্রবৃত্তিটা মাথা চাড়া দিয়ে জেগে উঠেছিল। আমি তাঁর কথা থেকেই এটা স্থির বুঝে নিয়েছিলাম যে, মাস তিনেক আগে তাঁর এই পদস্খলন ঘটে। এক সময় হঠাৎ তিনি অসম্ভব রকম কামার্ত হ'য়ে পড়েন, সেই দুর্বল মুহূর্তে কোনো পর-পুরুষকে তিনি দেহ দান করেছিলেন। তার ফলেই এই অবাঞ্ছিত শিশুর আবির্ভাব। সেই কলঙ্কের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যেই তিনি আজ আমার সাহায্যপ্রার্থী।

"এর আগে কখনো আমি এমন জটিল ব্যাপারে জড়িয়ে পড়িনি। আমি যে মহিলাটির প্রতি আসক্ত হ'য়ে পড়েছিলাম, তার আসল কারণ ঠিক যৌন প্রবৃত্তির তাড়না নয়; আমার প্রবল ইচ্ছা হয়েছিল আমি আমার ব্যক্তিত্ব দিয়ে এই উদ্ধত নারীর উপরে প্রভাব বিস্তার ক'রব। সত্যি কথা ব'লতে কি, এই সতেরো বছরের মধ্যে আমি কোনো শ্বেতাঙ্গ তরুণীর প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ হবার সুযোগ লাভ করিনি। প্রেমের ব্যাপারে এ রকমের বাধাও আমি পাইনি কখনো। লক্ষ্য ক'রে দেখেছি নেটিভ্ মেয়েরা, সাহেব দেখলেই ভয় পায়, ভক্তিও করে। একটু চেষ্টা ক'রলেই তাদের পাওয়া যায়। কিন্তু আমার মনে সে রকম বাসনা জাগেনি

কোনদিন। শুধু এই মহিলাটি এসেই সব ওলটপালট্ ক'রে দিয়ে গেলেন। তাঁকে দেখা মাত্রই আমি চঞ্চল হ'য়ে উঠ্লাম। তাঁর ঐ গর্বিত ভাবটি বেশি ক'রে আমায় তাতিয়ে তুলেছিল, তাই তাঁকে লাভ করবার জন্যে মরীয়া হ'য়ে উঠ্লাম।

"এই সব ভাবতে ভাবতে আমি অস্থির হ'য়ে উঠ্লাম। মুখে একটু অনাসক্তির ভাব দেখিয়ে ব'ললাম—'মাত্র এক হাজার পাউণ্ড নিয়ে অমন একটা গুরু দায়িত্বপূর্ণ কাজ আমি হাতে নিতে পারব না।'

"তিনি যেন নিরাশ হ'য়েই আমার দিকে তাকিয়ে বল্লেন—'বেশ, তাহ'লে কত হ'লে আপনি পারবেন শুনি ?'

"আমি ব'ল্লাম—'দেখুন, আমাকে ঠিক অভাবগ্রস্ত মনে ক'রবেন না, যে, সুযোগ বুঝে ব্যবসাদারী ক'রে বেশ কিছু উপায় ক'রে নিতে চাইছি। তা যদি মনে ক'রে থাকেন, তাহ'লে আমার কাছে সাহায্যের আশা বৃথা, সেটা আপনার ধৃষ্টতা। টাকার বিনিময়ে এ কাজ আমার দ্বারা হবে না।'

"তিনি জিজ্ঞাসা ক'রলেন—'তাহ'লে, কি আপনি আশা করেন আমার কাছে ?'

"বেশ উঁচু স্বরেই আমি ব'লে উঠ্লাম—'টাকার লোভ দেখিয়ে কেউ আমাকে দিয়ে কাজ হাসিল করে নেবে, সে বান্দা আমি নই। আপনি যদি তাই ভেবে থাকেন, তাহ'লে সাংঘাতিক ভুল করেছেন। আমার কাছে যারা আসে বিনীতভাবে, কাতর প্রার্থনা জানিয়ে যারা আমার কাছে সাহায্য ভিক্ষা করে, আমি শুধু তাদেরই সাহায্য করি।'

"মহিলাটি জবাব দিলেন—'তবে কি আপনার সামনে আমায় হাত জোড় ক'রে সাহায্য ভিক্ষা ক'রতে হবে ?'

"বল্লাম—'হাঁ, তাই ক'রতে হবে আপনাকে।'

"গর্বভরে তিনি ঘাড় নাড়লেন। ব'ল্লেন—'আমার পক্ষে তা

একেবারেই অসম্ভব। কখনোই পারব না তা। তার চেয়ে আমার মৃত্যুও ভালো।'

"আমি বেশ সাহস ক'রেই ব'ললাম—'আমি আপনার কাছে ঠিক কি চেয়েছি, তা বুঝতে পেরেছেন তো ? আমার দাবী পূরণ ক'রলেই, আমি আপনাকে কলঙ্কমুক্ত ক'রতে এগিয়ে যাব।'

"ভদ্রমহিলা আমার দিকে কট্‌মট্ ক'রে তাকালেন। পরক্ষণেই হো হো ক'রে হেসে উঠ্‌লেন। তাঁর সেই বিদ্রূপের হাসিতে ঘর ভ'রে উঠ্‌লো। মনে হ'লো, তাঁর কাছে যেন নিজেকে খাটো ক'রে ফেল্‌লাম। তাঁর সেই অট্টহাসি আমার কানে বজ্রের মত শোনালো। মাথাটাও যেন ঘুরে গেল আমার। ভাবলাম, নতজানু হ'য়ে এই অন্যায়ের জন্যে তাঁর কাছে ক্ষমা চাই। ভগ্নকণ্ঠে বল্‌লাম—'আমাকে আপনি ক্ষমা করুন।'

"ভদ্রমহিলা ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। যাবার আগে দৃপ্তকণ্ঠে যেন আদেশ ক'রে গেলেন—'আমার পেছু নেবেন না। তাহ'লে কিন্তু পরে আপনাকে অনুশোচনা করতে হবে।'

"সমস্ত ঘর আবার নিস্তব্ধ। কোথা থেকে যেন কি হ'য়ে গেল! আমার তখন রোখ চেপে গিয়েছে, তাঁকে ধরতেই হবে। বেশ কিছুটা শাস্তি দিতে না পারলে আমি যেন আর শান্তি পাচ্ছি না। ধীরে ধীরে মনের এই প্রতিক্রিয়া নিভে এলো। নিচে নেমে গেলাম সিঁড়ি বেয়ে। সাইকেলটা বের ক'রে উঠে পড়লাম। ঊর্ধ্বশ্বাসে চালিয়ে দিলাম সামনের দিকে। তাঁকে ধরতেই হবে। মনে হ'লো, তিনি বড় রাস্তায় গিয়ে মোটরে ওঠ্‌বার আগেই তাঁকে ধ'রে ফেল্‌ব। ছোট গলি রাস্তা তখনো শেষ হয়নি। দু'পাশেই ঘন জঙ্গল। হঠাৎ দেখি ভদ্রমহিলা হন্ হন্ ক'রে এগিয়ে চলেছেন। তার পেছনে পেছনে চলেছে সেই চীনা ছোকরাটি। আমাকে আসতে দেখে ভদ্রমহিলা হঠাৎ সেই ছেলেটিকে পথের মাঝখানে

দাঁড় করিয়ে একাই দ্রুতগতিতে এগিয়ে চল্‌লেন। আমি যেই সাইকেলটা একটু জোরে চালিয়েছি, ছেলেটি অম্‌নি আমার সাম্‌নে এসে পথরোধ ক'রে দাঁড়ালো। তাকে বাঁচাতে গিয়ে আমি রাস্তা থেকে সোজা গড়িয়ে পড়লাম পাশের খাদে। খুব বেশি চোট লাগেনি। দাঁড়িয়ে উঠে ছেলেটাকে খুব একচোট বক্‌লাম।

"আবার যেই সাইকেল চালাতে যাব, ছোকরাটি অমনি এসে হাতলটা চেপে ধ'রে ইংরেজীতে ব'ল্‌ল—"দোহাই আপনার, যাবেন না।' তার ঐ ঔদ্ধত্য দেখে রেগে গেলাম। ভাবলাম, দিই কয়েক ঘা বসিয়ে। কিন্তু মনের রাগ চেপে গেলাম। ছেলেটি আমার মুখচোখের ভাব দেখে ভয় পায় সত্যি, কিন্তু হাতটা সরায় না। আবার সে বলে—"আপনার পায়ে পড়ছি, আপনি যাবেন না।'

"আমি চোখ রাঙিয়ে বল্‌লাম—'যা যা পালা। নইলে মারব এক গাঁট্টা।' ভয় পেয়ে সে আমার মুখের দিকে তাকায়। কিন্তু একটুও স'রে দাঁড়ায় না। বেশ বুঝতে পারলাম, আমি যাতে মহিলাটিকে ধরতে না পারি সেইজন্যই সে আমাকে সাইকেল চালাতে দিচ্ছে না, বারে বারেই বাধা দিচ্ছে।

"কিন্তু আর সহ্য হ'লো না। এক ঘুষি মেরে তাকে মাটিতে ফেলে দিলাম। সাইকেল যেই চালাতে যাব, অমনি নজরে পড়লো সাম্‌নের চাকাটা একদম বেঁকে গিয়েছে। কি আর করি! উপায়ান্তর না দেখে ছুটতে শুরু ক'রে দিলাম। চাষাভুষো যত জংলীদের চোখের সামনে দিয়ে পাগলের মত ছুটে চ'লেছি। তারা তো হাঁ ক'রে আমায় দেখছে। মান-সম্ভ্রম আর রইলো না। ছুটতে ছুটতে বড় রাস্তার প্রায় কাছে এসে গেছি। কিন্তু গাড়ি তো নেই। আমি তখন কেবল হাঁপাচ্ছি। চীৎকার ক'রে ব'লে উঠ্‌লাম—'গাড়িটা কোথায়?' দেশী লোকেরা জবাব দিল—'সেটা

তো এই মাত্তর চ'লে গেল সাহেব!' অবাক্ বিস্ময়ে তারা আমার দিকে চেয়ে থাকে।

"যতদূর দৃষ্টি যায়, কোনোখানেই মোটরের চিহ্নমাত্র নেই। বুঝতে আর বাকি রইলো না যে, ছোকরাটিকে দিয়ে তিনি আমার পথরোধ করিয়ে, নিজে চম্পট্ দিয়েছেন। কিন্তু এরকম পালিয়ে যাবার কোনো মানেই হয় না। কারণ, এদেশে যে কয়েকজন ইউরোপীয় কর্মচারী কাজ ক'রছেন, তাঁদের প্রত্যেকের সব খবরই প্রত্যেকে জানতে পারে অনায়াসেই।

"জাভা খুব বড় শহর নয়! সেখানে এসব ঘটনা নিয়ে প্রায়ই চর্চা হয়। মহিলাটি যখন আমার বাড়িতে আসেন, তখন সেই ছেলেটির কাছ থেকে তাঁর নাম-ধাম সব কিছুই জেনে নিয়েছিলাম। তিনি প্রদেশীয় রাজধানী থেকে প্রায় দেড়শ মাইল দূরে থাকতেন। নামকরা একজন ডাচ্-ব্যবসায়ীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। ভদ্রলোক মাস পাঁচেকের জন্য আমেরিকায় গিয়েছিলেন, ব্যবসায়-সংক্রান্ত কোন একটা কাজে। একথা আমি নিশ্চয় ক'রে ব'লতে পারি যে এই সময়ের মধ্যে, ঠিক মাস তিনেক আগে ভদ্রমহিলা অন্তঃসত্ত্বা হন।

"এখন আমি সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার ক'রেই বুঝিয়ে বলতে পারব। আমি আমার নিজের রোগ, নিজেই টের পেয়েছিলাম। জ্বরের ঘোরে রোগী যেমন প্রলাপ বকে, আমার অবস্থাও তখন অনেকটা সেই রকম হয়েছিল। আমি যেন নিজের সমস্ত সংযম হারিয়ে ফেলেছিলাম। যদিও বুঝতে পারছিলাম অন্যায় আচরণ ক'রছি তবু বারে বারে আমি সেই ভুলই ক'রে যাচ্ছিলাম।

"মালয়ের লোকেরা একরকম মানসিক রোগে ভোগে। আপনার হয়তো সে সম্বন্ধে কোনো' ধারণা নেই। আমিও সেইরকম মানসিক

পীড়ায় ভুগছিলাম। এই রোগের লক্ষণ হ'লো—নির্লিপ্ত ভাবে চুপচাপ ব'সে থাকা। অথচ বাইরে থেকে বোঝবার উপায় নেই যে কিছু হয়েছে। মহিলাটি যখন আমার বাড়িতে এসেছিলেন, তার আগে থেকেই আমি ঐ ভাবে চুপচাপ একলাটি বসেছিলাম। মালয়বাসী যারা এই রোগে ভোগে, তাদের মধ্যে এমনও দেখা গেছে, মানসিক উত্তেজনায় তারা ঐ অবস্থায় খুনখারাপি পর্যন্ত করতে পারে। একটা খুন ক'রেও সে থামে না, ক্রমাগত একটার পর আর একটা খুন ক'রে যায়। খুনের নেশা যেন তাকে পেয়ে বসে। শেষটাতে সেইরকম লোককে গুলী ক'রে মারতে হয়। তাছাড়া আর উপায় কি!

"আমার অবস্থাও হয়েছিল সেইরকম মানসিক পীড়াগ্রস্তের মতো। মহিলাটিকে আর একবার দেখবার আশায় আমি পাগলের মত তাঁকে অনুসরণ করেছিলাম। আমার স্কন্ধে তিনি যেন একটা দুষ্টগ্রহের মতই চেপে বসেছিলেন। আমি আর সেখানে দেরি না ক'রে বাড়ি ফিরে এলাম। তারপর একটা সুটকেশে কিছু টাকা আর জামাকাপড় ভ'রে নিয়ে ছুটলাম ষ্টেশনের দিকে সাইকেলে। কিন্তু এত তাড়াহুড়ো ক'রেও কোনো লাভ হ'লো না। যতদূর মনে পড়ছে, ষ্টেশনে পৌছুবার আগেই সন্ধ্যা হয়ে এলো। কাজেই রাতের মতো ডাকবাংলোয় শুয়ে কাটিয়ে দিলাম। কারণ, ওসব পাহাড়ে জায়গায় রাত্রে ট্রেন চলাচল করে না। পরদিন সন্ধ্যার দিকে—মহিলাটি যে শহরে থাকেন, সেখানে গিয়ে হাজির হ'লাম। স্টেশন থেকে তাঁর বাড়ি যেতে মিনিট দশেক সময় লাগলো। আপনি হয়তো আমাকে উন্মাদ ভাবছেন। ভাবছেন, লোকটার কি কোনো কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নেই? সত্যি তাই। তখন আমি কি করছি, আর কি না করছি, কিছুই যেন বুঝে উঠ্‌তে পারছিলাম না। কার্ড বের ক'রে তাঁর চাকরটার হাতে দিলাম। কিছুক্ষণ বাদে সে ফিরে

এসে বল্‌লো—'মার শরীর খারাপ। এখন তিনি কারো সঙ্গে দেখা ক'রতে পারবেন না।'

"বাইরে বেরিয়ে কিছুক্ষণ তাঁর বাড়ির আশপাশ দিয়ে ঘোরা ফেরা ক'রলাম। যদি দৈবাৎ তাঁর দেখা মিলে যায়। কিন্তু ব্যর্থ হ'তে হ'লো। তখন তাঁর বাড়ির কাছাকাছি একটা হোটেলে গিয়ে উঠ্‌লাম। বেশ কয়েক পাত্র হুইস্কী টেনে, আর সেই সঙ্গে একটা ভেরানল ট্যাবলেট খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। বেজায় ঘুমিয়েছিলাম, একেবারে অজগর সাপের মতো।"

এই সময় জাহাজে ঢং ঢং ক'রে আটবার ঘণ্টাধ্বনি হয়। তখন প্রায় ভোর হ'য়ে এসেছে। ভদ্রলোক তখন তন্দ্রায় ঢুলছিলেন। তন্দ্রা টুটে যেতেই আবার গতরাত্রির কাহিনীটা ব'লতে শুরু ক'রলেন—"কি যেন ব'লছিলাম ? ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। তারপর সেই ঘুম ভাঙতে মনে হ'লো আমার যেন জ্বর এসেছে। মাথাটাও বেশ টন্‌টন্ করছিল উত্তেজনায়। মঙ্গলবার বিকেলে জাহাজঘাটায় গিয়ে খবর নিয়ে জানতে পারলাম, ভদ্রমহিলার স্বামী সামনের শনিবারেই আমেরিকা থেকে ফিরবেন। ভাবলাম, এখনো তো হাতে তিনদিন সময় আছে। এর মধ্যেই মহিলাটিকে তাঁর আসন্ন বিপদের হাত থেকে মুক্ত করতে পারি। তাহ'লে আর এক মিনিটও সময় নষ্ট করা চল্‌বে না। প্রত্যেকটি মুহূর্ত যেন মূল্যবান। কিন্তু ভদ্রমহিলার সঙ্গে আমি এমনি অভদ্র আচরণ করেছিলাম যে দ্বিতীয়বার আর তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াতে ভরসা পাচ্ছিলাম না। ভেবে দেখুন আমি একজনকে কলঙ্কের হাত থেকে রেহাই দিতে চলেছি, অথচ সে নিজেকে ধ্বংসের পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। তাঁর দোষ নেই। আমার সেই ঘৃণ্য প্রস্তাবে তিনি আমার মধ্যে কেবল শয়তানকেই দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন আমি তাঁর চরম

আত্মসম্মানে ঘা দিয়েছি, তাঁর নারীত্বের অবমাননা করেছি। কিন্তু সত্যি কথা বল্‌তে কি, তখন তাঁকে কলঙ্কমুক্ত করাই ছিল আমার একমাত্র কামনা। আমি ভেবেছিলাম তিনি এবার আমার সাহায্য গ্রহণে অসম্মত হবেন না।

"পরদিন সকালে উঠে দেখি, সেই চীনে ছোকরাটি তাঁর দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে। তাকে দেখেই আবার সব ঘটনা চোখের সামনে ভেসে উঠ্‌লো। মহিলাটির সঙ্গে দেখা ক'রতে আর সাহস পেলাম না। হোটেলের কামরায় ফিরে গেলাম বিষণ্ণচিত্তে। ব'সে ব'সে ভাবতে লাগলাম। তিনিও হয়তো ওদিকে সংশয়াকুলচিত্তে আমার সাহায্যের জন্যই ব'সে আছেন।

"এদিকে এই অপরিচিত শহরে কি ক'রে দিন কাটাব, ভেবে পাচ্ছিলাম না। মনে পড়ে গেল ওলন্দাজ-রাজপ্রতিনিধির কথা। একবার এক মোটর দুর্ঘটনায় ভদ্রলোক বড় জখম হন পায়ে। আমার চিকিৎসায় তিনি ভালো হ'য়ে যান। তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রতে গেলাম। তাঁকে বল্‌লাম—'দেখুন, এই উপনিবেশ থেকে আমায় বদ্‌লী করুন; আমার অনুরোধ, বিশেষ অনুরোধ। এরকম বুনো জায়গায়, এই জংলা অসভ্য দেশে আমি আর থাকতে পারছি না।' তিনি আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে চাইলেন। ডাক্তার যে-দৃষ্টি নিয়ে তার রোগীকে পরীক্ষা করে, সেইভাবেই যেন তিনি আমায় দেখছিলেন। বল্‌লেন—'আপনি মানসিক পীড়ায় খুব ভুগছেন, না?' তা দেখুন, আপনার জায়গায় আর একজন ডাক্তার এসে গেলেই আপনাকে ছুটি দেওয়া যাবে।' মনে হ'লো পরের চাকুরী ক'রে নিজেকে যেন একেবারে বিক্রী ক'রে ফেলেছি! ভাবলাম, চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে দেব।

"একটু পরে রাজপ্রতিনিধি আবার কথা কইলেন। মনে হ'লো, তিনি

যেন আমার মনের কথা টের পেয়েছেন। আমাকে না চটিয়ে বেশ বন্ধুত্বের সুরেই বল্লেন—'হাঁ, আমি এটা বেশ লক্ষ্য করেছি, আপনি খুব খাট্ছেন। এত দিন হ'য়ে গেল, অথচ একটিবারও আপনি ছুটি নিলেন না। কম অবাক হইনি এতে। আমার মনে হয় সেরকম আমুদে লোকের পাল্লায় পড়লে আপনি আর এমনটি থাকতেন না। শুনুন, আজ সন্ধ্যায় একটা নাচ-গানের আসর বস্ছে সরকারী কুঠীতে। আপনারও নিমন্ত্রণ রইলো সেখানে। উপনিবেশের সব লোকই যাচ্ছেন। আপনার পরিচিত-ও অনেকে থাকবেন সেখানে।' নিমন্ত্রণের জন্য রাজপ্রতিনিধিকে ধন্যবাদ জানিয়ে, ভাবতে বসলাম—'পরিচিতের মধ্যে কি সেই ভদ্রমহিলাও থাকবেন ?'

"সন্ধ্যার কিছু আগেই রাষ্ট্রদূতের বাড়িতে গিয়ে হাজির হ'লাম। কিন্তু তখনো কেউ আসেনি। আমি পাক্কা কুড়ি মিনিট সেই ঘরে একলাটি বসে। ক্রমে ক্রমে সবাই এসে হাজির হ'তে লাগলেন। প্রায় সকলেই রাজকর্মচারী। সস্ত্রীকও এসেছেন কেউ কেউ। পূর্বোক্ত সেই রাজপ্রতিনিধি আমাকে সাদর সম্ভাষণ জানালেন। একটু পরেই কিন্তু আমার যেন কেমন মাথা ঘুরতে লাগ্লো। বুঝলাম স্নায়বিক ক্রিয়া শুরু হয়েছে।

"হঠাৎ অবাক হ'য়ে দরজার দিকে তাকিয়ে দেখি সেই ভদ্রমহিলাটি হল্ঘরে প্রবেশ ক'রছেন। পরনে তাঁর হ'লদে রঙের পোষাক। মানিয়েছে ভারী চমৎকার। কাঁধ দুটি খোলা। ঠিক যেন হাতীর দাঁতের শুভ্রতা সেই কাঁধদুটিতে। সবার সঙ্গেই তিনি হেসে হেসে কথা ব'লছেন। মিষ্টি মিষ্টি কথার টুক্রো। কিন্তু অন্তরে অন্তরে তিনি যে একটা প্রবল অস্বস্তি বোধ করছিলেন, সেটা আমি তাঁর মুখ দেখেই টের পেয়েছিলাম।

"তাঁর কাছে এগিয়ে গেলাম। কিন্তু তিনি আমায় দেখেও যেন

দেখতে পেলেন না। তাঁর মুখেচোখে একটা হাসির আভা ফুটে উঠ্‌লো। ভাবলাম, কি আশ্চর্য। দু'একদিনের মধ্যেই তাঁর স্বামী এসে হাজির হচ্ছেন, আর তিনি কিনা পরম নিশ্চিন্ত মনে আছেন! অথচ আমি এদিকে তাঁর ভাবী বিপদের আশঙ্কায় চঞ্চল হ'য়ে উঠেছি। বুঝলাম, অন্তরের পুঞ্জীভূত বেদনারাশিকে তিনি ঐ হাসি দিয়েই চাপা দিতে চাইছেন। আসলে হাসিটা একটা ছল।

"সঙ্গীতের সুর ভেসে আসছিল পাশের ঘর থেকে। নাচ শুরু হবে এবার। একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক এসে মহিলাটিকে তাঁর নাচের সঙ্গী হ'তে অনুরোধ জানালেন। সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তিনি সেই ভদ্রলোকের হাত ধ'রে বল্‌-রুমে এগিয়ে গেলেন। আমাকে যেন এবার চোখে পড়্‌লো তাঁর। যেতে যেতে নিতান্ত পরিচিতের মতই শুধু ব'লে গেলেন—'আচ্ছা আসি ডাক্তার, নমস্কার।'

"তাঁর এই আচরণের মধ্যে কি ভাব যে লুকিয়েছিল কেউ তা টের পায় নি। আমি তাঁর এই আচরণে কিন্তু বেশ খুশি হ'য়ে উঠ্‌লাম। ভাবলাম, তবে কি তিনি পুরোনো তিক্ত সম্পর্কটা এবারে মিটিয়ে ফেল্‌তে উৎসুক? কিন্তু ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পারলাম না, তাঁর মনের ভাবটা। তাই, চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌লাম। নাচের ঘরে ঢুকে দেখি, তিনি বেশ স্বচ্ছন্দ মনে নেচে চ'লেছেন। মুখে তাঁর সেই সুমধুর হাসির ভাবটি তখনো ছিল। আমার কিন্তু মনে হ'লো এ হাসির সঙ্গে নাচের কোনো সম্পর্ক নেই, এ হাসি আমাদের সেই পুরোনো স্মৃতি স্মরণ ক'রে। তাঁর ভাব দেখে মনে হ'লো সেই স্মৃতিই যেন তাঁকে কেমন বিমনা ক'রে তুলেছে।

"কথাটা মনে হ'তেই আমি কেমন যেন একটা উত্তেজনা বোধ ক'রলাম। একদৃষ্টে চেয়েছিলাম তাঁর দিকে। ভাব দেখে মনে হ'লো আমার চাউনি তাঁর ভালো লাগছিল না। নাচ্‌তে নাচ্‌তে তিনি একবার

তাঁর সেই গর্বিত দৃষ্টি হেনে, আমাকে যেন সংযত হ'তে উপদেশ দিলেন। আমার মনে হ'লো মানসিক পীড়ায় আমি বড় বেশি অস্থির হ'য়ে পড়েছি। ভদ্রমহিলার সেই ইঙ্গিতের অর্থ আমি বুঝেছিলাম। কিন্তু নিজেকে আর স্থির রাখতে পারলাম কই? নবাগত অতিথিদের ভিড় ঠেলে তাঁর দিকে এগিয়ে গেলাম। আমার সঙ্গে কেউ একটা কথাও বল্‌ল না, অভ্যর্থনা করা তো দূরের কথা। ভদ্রমহিলার আচরণেও এটা সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌লো যে তিনি আমার অনধিকার প্রবেশ কোনমতেই মেনে নেন্ নি। আমি কিন্তু তাঁর দিকে অভিভূতের মতো চেয়েছিলাম একদৃষ্টে। হঠাৎ তিনি যেন বিচলিত হ'য়ে উঠ লেন। নাচ থামিয়ে সকলের কাছে বিদায় নিয়ে ব'ল্‌লেন 'মাফ ক'রবেন আপনারা, আমি বড় ক্লান্তি বোধ করছি আজ। আর থাকতে পাচ্ছি না। আজ আসি। আর একদিন আসব। আচ্ছা চলি, নমস্কার।'

"যাবার সময় তিনি আমার দিকে তাকিয়ে একটু মাথা নাড়লেন। আমিও বেরিয়ে গেলাম সঙ্গে সঙ্গে। নিমন্ত্রিত অতিথিরা সকলেই আমাকে দেখছিলেন অবাক্ হ'য়ে। কেমন যেন একটু লজ্জা বোধ হ'লো। কিন্তু আর থাকতে পারলাম না। তাঁর একখানা হাত ধ'রলাম। তিনি তৎক্ষণাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে আমার দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চাইলেন। পরক্ষণেই আবার সে ভাবটা কাটিয়ে, খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠে ব'ললেন—'কি ডাক্তার, আমার ছোট ছেলের ওষুধটার কথা মনে পড়্‌লো? আপনাদের নিয়ে আর পারা যায় না। ডাক্তার হ'লে হবে কি, যা খেয়ালী মানুষ আপনারা!' তাঁর এই উপস্থিত বুদ্ধির তারিফ না ক'রে পারি না। আমি সত্যি তখন ভারী অবাক্ হ'য়ে গিয়েছিলাম। পকেট থেকে একটা সাদা কাগজ বের ক'রে তাতে মিথ্যে একটা প্রেস্‌ক্রিপশন লিখে তাঁর হাতে দিলাম। তিনি সেটা নিয়ে বল্‌লেন—'ধন্যবাদ'। পরক্ষণেই বেরিয়ে গেলেন হন্ হন্ ক'রে।

"এই ভাবে তিনি আমাকে লোকের সন্দেহ থেকে মুক্তি দিয়ে গেলেন। অথচ আমার মনে দৃঢ় ধারণা জন্মাল তিনি আমাকে ঘৃণা করেন। কুকুরের মতই ঘৃণার চক্ষে দেখেন। বড়ই ক্লান্তি বোধ হচ্ছিল। টল্‌তে টল্‌তে এগিয়ে গেলাম মদের কাউণ্টারের দিকে। বোতল থেকে চার পাঁচ পেগ্‌ মদ ঢেলে সাবাড় ক'রে দিলাম। এত দুর্বলতা বোধ করছিলাম যে, মদ না খেয়ে এক পা চলাও আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। ভাবলাম, মত্ত অবস্থায় ভুলে যাব সব। কিন্তু তা আর হ'লো কই?

"যাবার আগে ভদ্রমহিলার সেই হাসি আমি কিছুতেই যেন ভুলতে পারছিলাম না। বিদ্রূপের মতই আমার কানে এসে বিঁধ্‌ছিল তা। সমুদ্রের ধারে পায়চারী ক'রে বেড়াচ্ছিলাম। হঠাৎ মনে পড়লো পিস্তলটা সঙ্গে আনলাম না কেন। তা হ'লেই তো সব সমস্যার সমাধান হ'য়ে যেত এক মিনিটে। অবসন্ন দেহে, ক্লান্ত মন নিয়ে ফিরে এলাম হোটেলে। ভাববেন না যেন, আমি আত্মহত্যা ক'রতে ভয় পেয়েছিলাম। কিন্তু কর্তব্যের কথা চিন্তা ক'রে মনের অশান্ত উন্মাদনার রাশ চেপে ধরলাম। ভাবলাম, তাঁকে আমার সাহায্য ক'রতেই হবে। আমার সাহায্য যে একান্তই প্রয়োজন তাঁর। আর দু'দিন বাদেই তো তাঁর স্বামী এসে হাজির হবেন। কলঙ্কের কথা প্রকাশ পেলে ভদ্রমহিলার যে লজ্জা, অপমানের আর শেষ থাকবে না।

"ভাবতে লাগলাম কি ক'রে তাঁর কাছে গিয়ে বলা যায় যে আমি তাঁকে কলঙ্কমুক্ত ক'রতেই উপস্থিত। উপায়ান্তর না দেখে শেষটায় তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে একটা চিঠি লিখলাম। চিঠিতে একথাও তাঁকে জানিয়ে দিলাম যে, তাঁকে বিপদ থেকে উদ্ধার ক'রেই আমার কাজ শেষ হ'য়ে যাবে। তারপর তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি চ'লে যাব। আমার সেই চিঠিখানার উচ্ছ্বাসপূর্ণ ভাব আর আবেগময়ী ভাষার বহর দেখলে

লোকে আমাকে পাগলই মনে ক'রত। চিঠিখানা শেষ ক'রে যেই উঠ্লাম, অমনি মাথা ঘুরতে লাগলো আমার। জল খেলাম এক গ্লাস। তারপর চিঠিখানা খামে ভর্তি ক'রে তার পেছনে লিখে দিলাম—'আপনার ক্ষমা প্রত্যাশা ক'রে ব'সে আছি। আজ সন্ধ্যার মধ্যে যদি কোনো জবাব না পাই, তাহ'লে জানবেন আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছি আমি। তা ছাড়া আমার আর উপায় নেই। চিঠির জবাবের আশায় ব'সে রইলাম।'

"এমনি ক'রেই কাটিয়ে দিলাম সারাটা দিন চুপচাপ ব'সে। মনে হ'লো পুরোনো সেই মনের অসুখটা ভূতের মত আমার কাঁধে চেপেছে। তার হাত থেকে যেন নিস্তার পাবার আশা নেই। ব'সে ব'সে এমনি ক'রে যখন ভাবছি, হঠাৎ এক সময় দরজাটা খুলে গেল। তাকিয়ে দেখি ঐ-দেশী একটা ছোকরা। সে ঘরে ঢুকে আমার হাতে একটুক্রো কাগজ দিল। তাতে লেখা ছিল—'বড়ই দেরি ক'রে ফেলেছেন। যাই হোক, আপনি হোটেলেই থাকবেন। শেষের দিকে হয়তো আপনার সাহায্য দরকার হবে।'

"চিঠির জবাব যে তিনি দিয়েছেন, তাতেই আমি খুশি। ভাবতে লাগলাম, মরা আমার হবে না। বেঁচে থাকতেই হবে তাঁর জন্য। আমার সাহায্য যে তাঁর চাই-ই। একটা পুলকানন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে চুম্বনের রেখা এঁকে দিলাম সেই চিঠির গায়ে। ধীরে ধীরে মনে হ'লো আমি যেন সংজ্ঞা হারিয়ে ফেল্ছি। ঘণ্টা চারেক আমি ঐভাবে তন্দ্রাভিভূত হ'য়ে প'ড়েছিলাম। যখন সে ভাবটা কেটে গেল, তখন দেখি সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে। দরজার কড়াটা হঠাৎ ন'ড়ে উঠ্ল। উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিতেই দেখি, সেই চীনে ছোক্রাটি দাঁড়িয়ে। আমাকে দেখেই সে ব'লে উঠ্ল—'শীগ্গির আসুন, দেরি ক'রবেন না আর।' আমি আর এক মুহূর্ত সেখানে

না দাঁড়িয়ে তাকে অনুসরণ ক'রলাম। আমরা উঠতেই গাড়ী ছেড়ে দিল।

"গাড়িতে তাকে জিজ্ঞাসা ক'রলাম—'কি ব্যাপার? কি হয়েছে সব খুলে বল।' বার বার প্রশ্ন করেও কিন্তু ছেলেটির কাছ থেকে কোনো জবাব পেলাম না। সে শুধু ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে রইলো উদাসীন দৃষ্টি মেলে। মাঝে মাঝে ঠোঁট দুটি কামড়াতে লাগলো। তার ঐ চুপ করে থাকাতে ভারি রাগ হ'লো আমার। ইচ্ছে হ'লো দিই দু'ঘা লাগিয়ে। কিন্তু ছোক্‌রাটি সেই মহিলার বড় অনুগত ও বিশ্বস্ত। সেই ভেবে ক্রোধ সংবরণ ক'রলাম। কোচ্‌ওয়ান তখন গাড়ি ছুটিয়ে দিয়েছে। চাবুকের ঘা খেয়ে ঘোড়াগুলি এত দ্রুতবেগে ছুটতে আরম্ভ করেছে, যে গাড়িচাপার ভয়ে রাস্তার লোকগুলি প্রাণ নিয়ে ছুটে পালাচ্ছে।

"ইউরোপীয়ানদের পাড়া ছেড়ে আমরা তখন চীনে পাড়ার বস্তির মধ্যে ঢুকে পড়েছি। সরু একটা গলির মোড়ে এসে গাড়িটা থামলো। বস্তির ধারেই একটা ছোট হোটেল। কি রকম একটা দুর্গন্ধ বেরিয়ে আসছিল সেখান থেকে। কতকগুলি ঘরে বসেছে আফিংখোরদের আড্‌ডা। কতক্‌গুলি ঘরের সামনে আবার দেহোপজীবিনীরা দাঁড়িয়েছিল গ্রাহকের আশায়। চীনে ছোক্‌রাটি আমাকে ঐ রকম পরিবেশের মধ্য দিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো। শেষটায় আমরা ছোট একটা ঘরের সামনে এসে থামলাম। দরজায় ধাক্কা দিতেই, একটি চীনা রমণী চীৎকার ক'রে ছুটে এলো।

"ছেলেটি আমাকে সরু বারান্দার ওপর দিয়ে আর একটা ঘরে নিয়ে গেল। দরজাটা খুলে ফেলতেই শুনলাম কে যেন গোঙ্‌রাচ্ছে। বেদনা-দায়ক অস্ফুট সেই কাতর ধ্বনি! ঘরের সেই গাঢ় অন্ধকারে কিছু ঠাহর ক'রতে পারলাম না। শব্দটাকে লক্ষ্য ক'রে এগিয়ে গেলাম খানিকটা।

সেই চীনে ছোক্‌রাটি আমাকে কি যেন বল্‌তে গিয়ে হঠাৎ কেঁদে উঠ্‌লো ফুঁপিয়ে।

"আমি খানিকটা এগিয়ে যেতেই দেখি, আমার পূর্ব্বপরিচিত সেই ভদ্রমহিলাটি একটা ছেঁড়া নোংরা মাদুরের ওপর শুয়ে অসহ্য যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ ক'রছেন। অন্ধকারে ভালো ক'রে তাঁর মুখটা নজরে পড়লো না। তাঁর গায়ে হাত দিয়ে দেখি জ্বরে গা যেন একেবারে পুড়ে যাচ্ছে। তাঁর সেই অবস্থা দেখে আমি দারুণ ভয় পেলাম। সর্বশরীর যেন কণ্টকিত হ'য়ে উঠ্‌লো! বুঝতে পারলাম—আমার কাছ থেকে তিনি কোনো সাহায্য না নিয়ে শেষটায় চীনা ধাত্রীর কাছে এসেছেন। আমার মনে হ'লো, তিনি আমার অন্যায় আচরণে এতই রুষ্ট হয়েছিলেন যে, আমার মতন ডাক্তারের কাছ থেকে সাহায্য নেবার চেয়ে, এক অশিক্ষিতা চীনা-ধাত্রীর হাতে মরাও ভালো মনে করেছিলেন। নইলে এমনটা তিনি ক'রবেন কেন?

"আমি বল্‌লাম—'শীগ্‌গির একটা আলো চাই।' নার্সটি তৎক্ষণাৎ একটা কেরোসিনের ল্যাম্প্‌ নিয়ে এলো হাতে ক'রে। ভারি রাগ হ'লো। ইচ্ছে হ'লো ওর গলাটা টিপে দিই! কিন্তু তাতে আর কি হবে। উপায়ান্তর না দেখে সেই অল্প আলোতেই হতভাগ্য মহিলাটিকে পরীক্ষা ক'রলাম। ধীরে ধীরে আমার ভয়ের ভাবটা যেন কেটে গেল। আমি চিন্তা ক'রলাম এখন আমায় মাথা ঠিক ক'রে কাজ ক'রতে হবে। আমি চিকিৎসক, আর আমার সামনে একটি মরণাপন্ন রুগী। ভাবপ্রবণতার সময় এ নয়!

"কি আশ্চর্য দেখুন, যে দেহের জন্য আমি একদিন কামনায় অন্ধ হ'য়ে গিয়েছিলাম, এখন সেই নগ্ন দেহে হাত দিয়ে পরীক্ষা করছি, অথচ মনে আর কোনো উত্তেজনাই নেই। সব চাঞ্চল্য কোথায় যেন উবে গেছে!

তখন কোনরকমে যাতে তাঁকে বাঁচাতে পারি, এই ছিল আমার একমাত্র চিন্তা। আনাড়ী চিকিৎসার ফলে তাঁর অনবরত রক্তস্রাব হচ্ছিল। সেই অপরিষ্কার নোংরা ঘরে কি ক'রে যে তাঁর রক্ত পড়া বন্ধ করি, ভেবে পাচ্ছিলাম না। সেখানে না আছে এক ঘটি পরিষ্কার জল, না আছে পরিষ্কার একটুক্‌রো কাপড়! মহিলাটিকে উদ্দেশ ক'রে আমি বল্‌লাম—'দেখুন, আপনাকে এক্ষুণি হাসপাতালে যেতে হবে।' অব্যক্ত যন্ত্রণায় হাত-পা ছুঁড়ে মহিলাটি কোনরকমে যেন ব'লে উঠ্‌লেন—'না না সে কিছুতেই হবে না। এখানে মরণ হয় সেও ভালো, তবু আমি আমার কলঙ্কের কথা কাউকে জানতে দেব না। আপনি আমাকে বাড়ী নিয়ে চলুন, বাড়ী নিয়ে চলুন।' স্পষ্টই বুঝতে পারলাম, জীবনের চেয়ে তাঁর কাছে চরিত্রের মূল্য অনেক বেশি। আমরা তাঁকে ধরাধরি ক'রে একটা খাটিয়ায় শুইয়ে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলাম। তাঁর নিজের শোবার-ঘরেই তাঁকে শুইয়ে দিলাম ভালো ক'রে। বুঝতে পারলাম তিনি এখন জীবন্মৃত্যুর মোহানায় গিয়ে ঠেকেছেন।"

কথা ব'লতে ব'লতে ভদ্রলোকটি আমার দু'হাত জড়িয়ে ধ'রে ব্যথায় যেন ভেঙে প'ড়লেন। প্রদোষালোকে আমি তাঁর ঝক্‌ঝকে দাঁত আর তাঁর চশমার কাঁচ দুটি স্পষ্ট দেখতে পেলাম।

খানিক বাদেই তিনি বেশ স্পষ্ট কণ্ঠে ব'লে উঠ্‌লেন—"আপনি তো একজন ভবঘুরে মানুষ। কি ক'রে আপনি বুঝবেন সেই মৃত্যু-যাতনা? মুমূর্ষু লোক যখন মরণের তীরে দাঁড়িয়ে বাঁচার জন্যে আকুলি বিকুলি করে সে কি আপনি চোখে দেখেছেন কখনো? কি করুণ, কি মর্মান্তিক সেই মৃত্যু-সংগ্রাম! সামান্য একজন পরিব্রাজক আপনি, এসবের ধারণাও কখনো ক'রতে পারবেন না। কিন্তু মৃত্যু যে কি ভয়ঙ্কর হ'তে পারে আমি তা দেখেছি, আমার এই সুদীর্ঘ ডাক্তারী-জীবনে। মৃত্যুপথযাত্রী

কত রোগীর পাশে ব'সেছি আমি। ধীরে ধীরে আমার চোখের সামনেই তাদের জীবন-দীপ চির-নির্বাপিত হয়ে গেছে। মহিলাটিকে বার বার ক'রে অনুরোধ করলাম, কিন্তু তিনি কিছুতেই হাসপাতালে যেতে রাজী হ'লেন না। অবশেষে একান্ত নিরুপায় হ'য়েই আমাকে তাঁর শয্যাপ্রান্তে ব'সে মৃত্যু-যন্ত্রণা প্রত্যক্ষ ক'রতে হ'লো। আমিও কেন তাঁর সঙ্গে মরে গেলাম না! মনে মনে ভাবলাম, তাঁর জীবনের বাতি যখন নিভে যাবে, তারপরেও তো আমি বেঁচে থাকব, রোজকার কাজ ক'রে যাব! কিন্তু কেন? তাঁকে বাঁচাবার সকল চেষ্টাই কি আমার বিফলে যাবে? আমি কি শুধু ব্যর্থ হতাশায় ভগ্ন হৃদয়ে ঘরে ফিরে যাব?

"চীনা ছেলেটি তখন ঘরের মেজেতে হাঁটু গেড়ে ভগবানের কাছে তার প্রভু-পত্নীর জীবন-ভিক্ষা ক'রছে। মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখছে আমাকে। তার তখনো আশা, আমি যদি কোনরকমে তাঁকে বাঁচাতে পারি। সে তার রক্তের বিনিময়েও তার কর্ত্রীকে বাঁচাতে প্রস্তুত ছিল। আমিও তা দিতে পারতাম। কিন্তু রক্ত দিলেও তো তাঁকে আর তখন বাঁচানো যেত না, ইঞ্জেকৃশন ক'রে শুধু শুধু কষ্ট দেওয়া হ'তো। কি অদ্ভুত তেজস্বিতায় তিনি আমাদের ওপর প্রভাব বিস্তার ক'রেছিলেন যে, আমি ও চীনা ছেলেটি তাঁর জন্যে প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিলাম।

"ভোরবেলার দিকে তাঁর জ্ঞান ফিরে এলো। সেই দৃষ্টিতে কিন্তু আর তেজ নেই, গর্বের কোনো চিহ্নও নেই তাতে। অপলক নয়নে বিহ্বল দৃষ্টিতে তিনি চেয়ে আছেন আমার দিকে। মনে হ'লো তিনি যেন আমাদের সেই বিগত দিনের ঝগড়ার কথা স্মরণ ক'রছেন; আমি তাঁর দৃষ্টির বাইরে গেলেই যেন তিনি শান্তি পান! কিন্তু প্রশান্ত দৃষ্টিতে তিনি আমার দিকে চেয়ে কি যেন ব'লতে চাইলেন, উঠে ব'সতেও চেষ্টা

ক'রলেন একটু। আমি তাঁকে বাধা দিয়ে বললাম—'উঠ্‌বেন না। শুয়ে থাকুন।'

"অস্পষ্ট কণ্ঠে তিনি আমাকে বললেন—'আমার এই কলঙ্কের কথা যেন কেউ জানতে না পারে। আমার অন্তিম অনুরোধ আপনার কাছে।'

"বল্‌লাম—'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, এ পৃথিবীতে আর কেউ জানবে না আপনার কথা।' স্পষ্টই লক্ষ্য ক'রলাম, তিনি যেন অস্থির হয়ে উঠ্‌ছেন। অনেক কষ্টে আবার তিনি বল্‌লেন—'আমার কাছে আপনি শপথ করুন। শপথ ক'রে বলুন এ কথা প্রকাশ হবে না।' আমি শপথ করলাম। এবারে তিনি যেন অনেকটা শান্তি পেলেন মনে। কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন আমার মুখের দিকে। তাঁর প্রতি আমি নিদারুণ অন্যায় করা সত্ত্বেও তিনি আমায় ক্ষমা ক'রে গেলেন। আরেকবার তিনি যেন কি কথা বলতে চাইলেন। কিন্তু বলা হ'লো না। তাঁর সব চেষ্টাই ব্যর্থ হ'লো। ধীরে ধীরে তাঁর চোখ বুজে এলো। পরম শান্তিতে তিনি যেন ঘুমিয়ে পড়লেন অনন্তকালের মহানিদ্রায়। দুপুরের আগেই সব শেষ!"

জাহাজে তখনো কল-কোলাহল শুরু হয়নি। কথা বল্‌তে বল্‌তে ভদ্রলোকের মুখখানি বিষাদে মলিন হ'য়ে উঠ্‌লো। ডেক্‌-চেয়ারে তিনি গা এলিয়ে দিলেন। ধীরে ধীরে সারা আকাশ ফর্সা হ'য়ে এলো। প্রভাত-আলোর স্পষ্টতায় লক্ষ্য ক'রলাম ভদ্রলোক ক্লান্তিতে অবসন্ন, অন্তর বেদনায় মুহ্যমান।

কাহিনীর যোগসূত্র ধ'রে কিছুক্ষণ পরে তিনি আবার ব'ল্‌তে শুরু ক'রলেন—"একবার চিন্তা ক'রে দেখুন সেই অবস্থাটা। তিনি তো পরলোকের যাত্রী হ'য়ে চ'লে গেলেন অসীম-অনন্তের পানে, আর আমি

ব'সে রইলাম তাঁর সেই পিছনে ফেলে-যাওয়া প্রাণহীন দেহের পাশে। ও-সব জায়গায় গুজব রটতে বেশিক্ষণ লাগে না। অথচ, আমিও চ'লে যেতে পারছিলাম না সেখান থেকে। কারণ, আমি তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে, তাঁর কলঙ্ককাহিনী কখনো প্রকাশ হবে না। ওদিকে ঠিক তার আগের দিনই ভদ্রমহিলা সরকারী-ভবনে নেচে এসেছেন। সেখানকার অভিজাত-সমাজে তাঁর ঘনিষ্ঠতা খুব। যাওয়া-আসা, মেলা-মেশা তো লেগেই ছিল হরদম। এদিকে তাঁর মৃত্যু হ'লো। আর আমিই তার সাক্ষী। কাজেই লোকে যখন তাঁর অকস্মাৎ বিয়োগের কথা শুনবে, তখন আমাকেই বর্ণনা ক'রতে হবে সেই মৃত্যুর আসল কারণ ও বিবরণ। ভেবে দেখুন আমার অবস্থাটা। একবার মনে হ'লো, সরকারী ডাক্তারের ঘাড়ে সব দায়িত্ব দিয়ে স'রে পড়ি। কিন্তু পরক্ষণেই আবার মনে হ'লো তা অন্যায়। কি মুস্কিলেই যে ভগবান আমায় ফেল্লেন! চীনা ছেলেটিকে ডেকে বল্লাম—'এ ঘটনা যাতে কেউ জানতে না পারে, সে-জন্যে তোর গিন্নী-মা আমাকে বার বার ক'রে অনুরোধ ক'রে গেছেন, তা জানিস্ তো?' সে বেশ সহজভাবেই জবাব দিল যে, সে জানে তা।

"ঘরের মেঝেয় যত রক্ত আর ময়লা পড়েছিল সব সে এমনভাবে ধুয়ে মুছে ঘরখানাকে পরিষ্কার ক'রে তুল্লো যে, কারুর মনে কোনো সন্দেহ জাগবার আর কোনো অবকাশই রইলো না।

"মানুষ যখন সব হারাতে বসে, তখন সামান্য একটা জিনিসকে অবলম্বন ক'রেও সে বাঁচতে চায়। আমার অবস্থাও তখন প্রায় ঐ রকম। মনে হ'লো, আমার কর্মশক্তি যেন বেড়ে গিয়েছে অসম্ভব রকমের। ভদ্রমহিলার সেই অন্তিম-অনুরোধই ছিল আমার শেষ সম্বল। তাঁর সেই অনুরোধ রক্ষা করতে পারলেই আমার কর্তব্য শেষ। মনে মনে ঠিক ক'রে ফেল্লাম সব। যদি কেউ তাঁর মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করে

তাহ'লে এমন একটা রোগের নাম ব'লব, যা ওসব গরম জায়গায় প্রায়ই ঘটে থাকে! আমি ডাক্তার, কাজেই আমার কথা কেউ অবিশ্বাস করবে না। বাড়িতে লোকজন এলে, তাদের বললাম—'মহিলাটি হঠাৎ পীড়িত হবার সঙ্গে সঙ্গে, চীনা চাকর গিয়ে আমাকে ডেকে আনে।'

"ন'টা নাগাদ প্রধান চিকিৎসক এসে হাজির হ'লেন। মৃতদেহ তাঁরই পরীক্ষা ক'রে দেখবার কথা। এই ডাক্তারটির হাতেই ছিল আমাকে বদ্‌লী করবার ক্ষমতা। আমার সুখ্যাতির জন্য ভদ্রলোক আমাকে খুব ঈর্ষার চোখে দেখতেন। ঘরে ঢুকেই তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন—'শুন্‌লাম, মাদাম ব্ল্যাক্ নাকি হঠাৎ মারা গেছেন?'

"আমি জবাব দিলাম—'হাঁ, সকাল ছটায়।'

"তিনি আবার জিজ্ঞাসা ক'রলেন—'কখন তিনি আপনাকে হঠাৎ ডেকে পাঠালেন?'

"জবাব দিলাম—'গতকাল সন্ধ্যায়।'

"ভদ্রলোক বল্‌লেন—'আপনি জানেন বোধ হয়, আমিই এ বাড়ির ডাক্তার। এ কথা জানা সত্ত্বেও আপনি আমাকে ডেকে পাঠালেন না কেন?'

"বল্‌লাম—'ডাকবার মতো সময়ও ছিল না। তাছাড়া তিনি আমার ওপরেই নির্ভর ক'রে বলেছিলেন, আর কোনো চিকিৎসক যেন না ডাকা হয়।'

"তিনি রেগে উঠে বল্‌লেন—'আপনি আপনার কর্তব্য ক'রে থাকতে পারেন, কিন্তু আমাকে এক্ষুনি পরীক্ষা ক'রে দেখতে হবে মৃত্যুর কারণটা কি।'

"কোন জবাবই আর মুখ দিয়ে বেরুল না। তিনি মৃতার ঘরে ঢুকে যেই তাঁর শব পরীক্ষা ক'রতে এগিয়ে যাবেন, আমি তখুনি তাঁকে ডেকে বল্‌লাম—'শুনুন। পরীক্ষা করবার কোন দরকারই হবে না। সব কথা

আমি ভেঙেই বল্‌ছি। মাদাম ব্ল্যাক একজন দেশী ধাত্রীকে দিয়ে গর্ভপাত করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ব্যর্থ হ'য়ে শেষটায় আমাকে ডেকে পাঠান। আমি যখন তাঁর কাছে হাজির হ'লাম, তখন তাঁর অবস্থা খুবই সঙ্কটাপন্ন। কোনরকমেই তাঁকে আর বাঁচাতে পারলাম না। মরবার ঠিক আগে তিনি আমাকে মিনতি ক'রে ব'লে গেছেন, তাঁর এই কলঙ্ক কাহিনী যেন কেউ জানতে না পারে। আমি তাঁর কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, আমি তাঁর সেই অন্তিম অনুরোধ পালন ক'রব।'

"ভদ্রলোক ব্যঙ্গের সুরে ব'লে উঠ্‌লেন—'আপনি কি মনে করেন আমি আপনাদের এই কলঙ্ক চেপে যাব?'

"আমি বল্‌লাম—'ভালো ক'রে শুনুন আগে। ভুল বুঝবেন না আমাকে। তাঁর এই কলঙ্কের সঙ্গে অন্য লোক জড়িয়ে আছে, আমি নই। এ পাপ যদি আমি ক'রতাম, আমাকে তাহ'লে এ ঘটনার পর কখনোই আর জীবিত দেখতেন না। মহিলার চরিত্রকে আপনি কলমের আঁচড়ে কলঙ্কিত করতে পারবেন না, কিছুতেই না। জানবেন, আমার প্রাণে তাহ'লে নিদারুণ আঘাত লাগবে।'

"তিনি অবাক হয়ে ব'লে উঠ্‌লেন—'আপনি যদি এ ব্যাপারে জড়িয়ে না থাকেন, তাহ'লে আপনার প্রাণে আঘাত লাগবার কি আছে? আপনি যে আমার ওপর হুকুম চালাচ্ছেন মশাই? না না সে হবে না। মৃতদেহ পরীক্ষা ক'রে আমাকে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ লিখে যেতে হবে। জাল সার্টিফিকেট কখনোই আমি দিতে পারব না।'

"আমি তাঁর কথায় তখন উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছি। বেশ জোরেই ব'লে উঠ্‌লাম—'আপনাকে দিতেই হবে। না দিলে আপনাকে আর প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে হবে না।' আমি আমার শূন্য পকেটে হাত দিয়ে পিস্তল ওঠাবার ভান ক'রতেই তিনি আঁৎকে উঠে পিছিয়ে গেলেন।

"আমি আবার বল্লাম—"জীবনের পরোয়া করি না মোটেই। কত-টুকুই বা এ জীবনের দাম? ভদ্রমহিলার শেষ সময়ে তাঁকে যে কথা দিয়েছি, আমাকে তা রক্ষা করতেই হবে। আপনি সার্টিফিকেট লিখে দিন। লিখুন, একটা সংক্রামক রোগে হঠাৎ আক্রান্ত হওয়ায় ভদ্রমহিলা হার্ট ফেল ক'রে মারা যান। আমার এ অনুরোধ আপনাকে রাখতেই হবে। আমি কথা দিচ্ছি—সাত দিনের মধ্যেই আমি এ-দেশ ছেড়ে চ'লে যাব। আর, এতেও যদি আপনি খুশি না হন, তাহ'লে জেনে রাখুন, ভদ্রমহিলাকে সমাধিস্থ করবার সঙ্গে সঙ্গেই, আমি আত্মহত্যা করব, পিস্তলের গুলীতে নিজের মাথার খুলি দেব উড়িয়ে। আশা করি এবার আপনি খুশি হবেন নিশ্চয়ই?'

"আমার সেই উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে ভদ্রলোক যেন বেশ ভীত হ'লেন। কিন্তু আবার তিনি ব'লে উঠলেন—'দেখুন, জীবনে কখনো আমি জাল সার্টিফিকেট লিখিনি। এ রকম কাজকে আমি কিছুতেই বরদাস্ত ক'রতে পারি না। আমার কাছে এটা অন্যায়, এটা অধর্ম।'

"আমি জবাব দিলাম—'হ্যাঁ, সত্যি কথাই ব'লেছেন আপনি। এ ধরনের কাজ করতে আত্মসম্মানে লাগে বইকি! কিন্তু এটা হ'লো বিশেষ ঘটনা, গুরুতরও বটে। এটা তো বুঝতে পারেন, কলঙ্কের কথা যদি একবার ছড়িয়ে পড়ে, তাহ'লে ভদ্রমহিলার স্বামী সারা জীবন কি অশান্তিই না ভোগ ক'রবেন। আপনি কেন অমত করছেন, লিখে দিন আমি যা বল্লাম।'

"ভদ্রলোক কি ভেবে রাজী হ'লেন। আমরা তখন দু'জনে মিলে মৃত্যুর সার্টিফিকেট তৈরী ক'রে ফেল্লাম। সেটা শেষ হ'তেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তারপর আমাকে বল্লেন—'আপনি কিন্তু সামনের হপ্তায় জাহাজে উঠে অতি অবশ্য ইউরোপে রওনা হবেন।'

"বল্লাম—'সে তো নিশ্চয়ই। আমি তো আপনার কাছে আগেই প্রতিশ্রুত!'

"ভদ্রলোকের চালচলনে ও কথাবার্তায় তাঁর পাকা ব্যবসাদারী বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছিল। তিনি নিজের ক্রোধকে দমন করবার জন্যেই যেন কথার মোড় ঘুরিয়ে বল্‌তে শুরু ক'রলেন—'আমার যতদূর মনে হয়, ভদ্রমহিলার স্বামী, আমার সার্টিফিকেটে তেমন সন্তুষ্ট হ'বেন না। শবদেহ তিনি হয়তো ইংলণ্ডে নিয়ে যাবেন পরীক্ষা করাতে। বড়োমানুষের খেয়াল! বুঝতেই তো পারছেন! যাই হোক্, সেজন্য আপনি ভাববেন না। আমি কফিন তৈরী করিয়ে তার ভেতরে শবদেহটি ভালোভাবে শীল করিয়ে দেবার ব্যবস্থা করব'খন। মৃতার স্বামী এসে এটা নিশ্চয়ই বুঝতে পাববেন যে, এরকম গরম দেশে শবদেহ নিয়ে তাঁর আগমন প্রতীক্ষায় আমার বেশিদিন অপেক্ষা করা মোটেই সম্ভব নয়।'

"খুব অল্প সময়ের মধ্যেই যেন ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার ভাব হ'য়ে গেল। আমি বেশ বুঝতে পারলাম তাঁর এই পরিবর্তনের কারণ কি। কারণ, আমি চ'লে গেলে, চিকিৎসার পথে তিনি নিষ্কণ্টক হ'য়েই বিচরণ ক'রতে পারবেন। সেটা তাঁর পক্ষে পরম লাভ। একটু পরেই তিনি আমার সঙ্গে করমর্দন ক'রে বল্‌লেন—'আচ্ছা, আসি এখন। আশা করি, শীগগিরই আপনি সেরে উঠ্‌বেন।' এই ব'লেই তিনি বেরিয়ে গেলেন। আমাকে তিনি কি রোগগ্রস্ত মনে ক'রে গেলেন, না পাগল ভাবলেন ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পারলাম না। ঘর থেকে তিনি চলে যাবার পরমুহূর্তেই আমার শরীর ক্লান্তিতে যেন ভেঙে পড়লো। আমি সেই শব-দেহের পাশে অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়ে গেলাম। কতক্ষণ যে সে-ভাবে পড়ে ছিলাম তা মনে নেই। হঠাৎ কানে একটা আওয়াজ আসতেই মুখ তুলে

চেয়ে দেখি সেই চীনা ছেলেটি দাঁড়িয়ে আছে। সে বল্‌লে কে যেন বাইরে অপেক্ষা ক'রছে।

"আমি বল্‌লাম—'যেই হোক না কেন, তাকে ভেতরে আসতে দিবি না। সাবধান।'

"ছেলেটি যেন কি ব'লতে গেল। আমি তখন জিজ্ঞাসা করলাম—'লোকটা কে?'

"সে জবাব দিল—'সেই লোকটি।' মনে হ'লো সে যেন লজ্জায় তার নাম পর্যন্ত উচ্চারণ ক'রতে পারছে না। ছেলেটির কথার ভাবেই বুঝে নিলাম কে এসেছে।

"আপনি শুনলে হয়তো একটু অবাক হবেন যে, ভদ্রমহিলা আমার প্রস্তাব যেদিন প্রত্যাখ্যান করেন, সেই দিন থেকে আমি তাঁর প্রণয়ী, তাঁর কলঙ্ক-দাতার কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছিলাম। সেই লোকটিকে ভালোবেসে, কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে ভদ্রমহিলা তাকে দেহ দান ক'রে এই বিপদ ডেকে এনেছিলেন। আগে হ'লে হয়তো এই লোকটিকে আমি বাঁচতে দিতাম না কিছুতেই। কারণ, সেই ছিল তাঁর আসল প্রণয়ী, আমার প্রতিদ্বন্দ্বী!

"পাশের ঘরে ঢুকেই দেখি সুপুরুষ এক তরুণ ব'সে রয়েছে। মুখখানি তার বেদনামলিন। একটা কোমলতাও যেন তার মধ্যে জড়িয়ে আছে। উঠে আমাকে নমস্কার ক'রতে গিয়ে তার হাত দুটি কেঁপে উঠ্‌লো থর্‌থর্‌ ক'রে। ইচ্ছে হ'লো ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরি। বেশ ভালো করেই দেখলাম তাকে। না, প্রেমিক হবার যোগ্যই সে! প্রকৃত ভালোবাসার পাত্র তাতে আর সন্দেহ রইলো না। ভদ্রমহিলা যে তার প্রেমাসক্ত হবেন, তাতে আর আশ্চর্য কি!

"অশ্রুছলছল চোখে সে আমার দিকে তাকিয়ে করুণ কণ্ঠে ব'লে উঠ্‌লো—'আমি একটিবার তাকে দেখতে চাই।'

"আমি তার কাঁধে হাত দিয়ে ভেতরে নিয়ে গেলাম। যেতে যেতে সে আমার দিকে সকৃতজ্ঞ নয়নে বার বার চেয়ে রইলো। আমার মনে হ'লো দু'জনের অন্তরে অন্তরে কোথায় যেন একটা মিলন ঘটে গেছে। তাকে নিয়ে মৃতদেহের শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হ'লাম। পাছে আমি সেখানে থাকলে তার সঙ্কোচ বোধ হয়, সেই জন্যে আমি দূরে সরে দাঁড়ালাম। হঠাৎ সেই তরুণ, ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠ্‌লো। মাটিতে ব'সে পড়েছে সে অভিভূতের মত। কি করব তখন ভেবে পেলাম না। কাছে গিয়ে তাকে হাত ধ'রে তুলে এনে একটা সোফায় বসিয়ে দিলাম। কি সান্ত্বনা দেব তাকে? ছোট ছেলের মতো তার কোঁকৃড়ানো কোঁকৃড়ানো সুন্দর চুলগুলিতে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম।

"সে আমার হাতটা তার মুঠোর মধ্যে টেনে নিয়ে কাতর কণ্ঠে ব'লে উঠ্‌লো—'আমায় আপনি সত্যি ক'রে বলুন ডাক্তার,—সে কি সত্যিই আত্মহত্যা করেছে?'

"আমি ঘাড় নেড়ে বল্‌লাম—'না।'

"তরুণটি তখন ব'লে উঠ্‌লো—'তবে, এর জন্যে দায়ী কে?'

"আমি ধীরকণ্ঠেই জবাব দিলাম—'কেউই দায়ী নয় ভাই, এ শুধু অদৃষ্টের পরিহাস!'

"সে অস্থির হ'য়ে ব'লে উঠ্‌লো—'কিছুই আমি ভালো বুঝে উঠ্‌তে পারছি না। পরশু সন্ধ্যায় তো বল্‌রুমে তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। এত শীগ্‌গির এমন কি হ'লো, যে সে আর বাঁচলো না?'

"আমি তখন তাকে নানারকম মিথ্যা কথা ব'লে, আসল ঘটনাটা গোপন ক'রে গেলাম। পাছে তার ভাবপ্রবণ মনে কোনরকম আঘাত লাগে সেদিকে আমার সতর্কতা ছিল। একথা তাকে আমি কিছুতেই জানতে দিইনি যে, ভদ্রমহিলা আমার কাছে এসেছিলেন বিপদ থেকে

উদ্ধার পেতে। আর সে অনুরোধ আমি রাখিনি। এর পরে তার সঙ্গে আমার দু'দিন ধ'রে শুধু মহিলাটির কথা নিয়েই আলাপ হয়।

"কফিন যেদিন বন্ধ করা হ'লো, ভদ্রমহিলার স্বামীও সেইদিন এসে উপস্থিত হ'লেন। চারধারে তখন নানারকম গুজব। নানান্ জনে নানান্ কথা রটিয়ে বেড়াচ্ছে। ভদ্রলোকের মনেও সন্দেহ জ'মে ওঠে। মৃত্যুর প্রকৃত রহস্য জানবার জন্যে তিনি আমার খোঁজ পর্যন্ত করেছিলেন। কিন্তু যাঁর কাছে থেকে সেই নারী সুখী হ'তে পারেন নি, তাঁর সঙ্গে আমার দেখা করতে মন চাইলো না। চারদিন পর্যন্ত নিজের ঘরেই আত্মগোপন ক'রে রইলাম।

"ভদ্রমহিলার সেই তরুণ প্রণয়ী আমার জন্য বেনামীতে একটা পাসপোর্ট জোগাড় ক'রে দেয়। আমি সেটা সঙ্গে করে এক গভীর রাত্রে সিঙ্গাপুর-গামী এক জাহাজে গিয়ে উঠলাম। আমার যা কিছু টাকাকড়ি, যা কিছু ঐশ্বর্য সবই পড়ে রইলো পিছনে। ভদ্রমহিলার জন্য আমি আমার আত্মমর্যাদাটুকু চিরদিনের জন্য বিসর্জন দিয়ে এলাম। বাড়িতে আর থাকতে পারছিলাম না। সেই বিষাক্ত আবহাওয়ায় আমার দম যেন আট্‌কে আসছিল। তাই রাত্রির অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে চুপিসাড়ে বেরিয়ে পড়লাম। তাকে ভুলতে চাই, কিন্তু ভুলতে পারিনা যে কিছুতেই। অবশেষে আরও যেন জড়িয়ে পড়লাম।

"মাঝরাতে যখন আমি জাহাজে উঠেছি, তখন হঠাৎ নজরে পড়্‌ল, জাহাজে একটা কফিন তোলা হচ্ছে; পেতলে মোড়া একটা কফিন। চম্‌কে উঠ্‌লাম। মনে হ'লো, আমি যেমন ভদ্রমহিলাটিকে সেই পাহাড় থেকে সমুদ্র পর্যন্ত খুঁজে বেড়িয়েছি, এই কফিনও তেমনি ক'রে আমায় অনুসরণ করছে। এর হাত থেকে আমার কি নিস্তার নেই? কফিনটি যেখানে নামানো হ'লো, তার পাশেই মৃতা রমণীর স্বামী দাঁড়িয়েছিলেন।

তাঁর দিকে তাকাতে আমার ইচ্ছা হ'লো না। স্পষ্টই বুঝতে পারলাম, ভদ্রলোক ইংলণ্ডে গিয়ে শবদেহ পরীক্ষা করিয়ে মৃত্যুর আসল কারণ জানতে চান। আমিও ঠিক ক'রে ফেল্‌লাম, যেমন ক'রেই হোক এই কফিনটিকে শেষ অবধি আমি অনুসরণ ক'রব। ভদ্রলোক যাতে কিছুতেই তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুরহস্য উদ্‌ঘাটন করতে না পারেন সেজন্য আমি প্রাণপণ চেষ্টা ক'রব।

"আপনি নিশ্চয়ই এবার বুঝতে পারছেন, কেন আমি একলা থাকতে চাই, কেন আমি জাহাজের এই হট্টগোল সহ্য ক'রতে পারি না। ভদ্রমহিলার মৃতদেহ এই জাহাজেই চলেছে। একেবারে নীচের তলায় রাখা হয়েছে কফিনটিকে। রাতদিন আমি কেবল কফিনের কথাই ভাবছি। বার বার আমার মনে পড়ে যাচ্ছে মৃত্যুপথযাত্রী সেই অসহায় নারীর অন্তিম অনুরোধ। যেমন ক'রেই হোক্ সে অনুরোধ আমাকে রাখতেই হবে, আমি যে তাঁর কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এখনও কেবলই ভয় হয়—এই বুঝি সব কথা প্রকাশ হ'য়ে পড়লো। কিন্তু যে ভাবেই পারি ভদ্রমহিলার সুনাম আমাকে রক্ষা করতেই হবে।"

হঠাৎ কিসের একটা আওয়াজ হ'তেই ভদ্রলোক চেয়ার ছেড়ে একেবারে উঠে পড়লেন। বল্‌লেন—"আমি আর বসব না এখানে, চললাম।" মদের নেশায় তাঁর দু'চোখ তখন রক্তজবার মতো লাল হ'য়ে উঠেছে। তাঁর এই আকস্মিক আচরণে বিস্ময় প্রকাশ ক'রলাম। ভদ্রলোক এইভাবে আমার কাছে তাঁর মনের সকল কথা ব'লে ফেলে বেশ একটু কুণ্ঠিত হ'লেন, সঙ্কোচও বোধ ক'রলেন।

আমি বেশ হৃদ্যতার সঙ্গেই বল্‌লাম—"আজ সন্ধ্যার দিকে আমার কেবিনে যদি অনুগ্রহ ক'রে একবার আসতেন!"

তিনি একটু হেসে ঠোঁট দুটি কামড়ে জবাব দিলেন—"ধন্যবাদ। আমায় মাফ ক'রবেন। আমার পক্ষে একা একাই থাকা ভালো। আর একটা কথা বলছি শুনুন।"

"বেশ বলুন।" জবাব দিই আমি।

তিনি ব'লে চলেন—"আপনি যেন ভাববেন না, আপনার কাছে সব কথা খুলে ব'লে আমি মনটাকে হাল্‌কা বোধ করব বা কোনো সান্ত্বনা পাব। আমি আর নেই, ফুরিয়ে গেছি একেবারে। জীবনবীণার সকল তার ছিঁড়ে গেছে টুক্‌রো টুক্‌রো হ'য়ে। জোড়া লাগাবার কোনো উপায় নেই আর। ডাচ্-উপনিবেশের চাক্‌রী ক'রতে গিয়ে বিরাট একটা বিপর্যয়ের সৃষ্টি ক'রে বস্‌লাম, মাইনেও বন্ধ হ'য়ে গেল। জার্মাণীতে ফিরে গিয়ে এখন আমাকে ভিখারীর মতো খালি হাতে পথে পথে ঘুরতে হবে। বেশ বুঝতে পারছি, আমার দিন ফুরিয়ে এলো। যাক্। আপনার সঙ্গ পেয়ে তবু যেন কথা ব'লে বাঁচলাম। নিজেকে ধন্য মনে ক'রছি এজন্যে।

"একলা কেবিনে প'ড়ে থাকি, আর মদ খাই। শুধু মদই আমার প্রাণে শান্তি আনে, সান্ত্বনা দেয়। আর আছে একটা পিস্তল। আপনার কাছে সব কথা খুলে ব'লে যত আরাম পেলাম,—এই পিস্তলই হয়তো তার চেয়ে ঢের বেশি আনন্দ দেবে আমাকে!"

একটু থেমে আবার তিনি বল্‌লেন—"আর আপনাকে ধ'রে রাখব না। এবার আমিও চলি।" তাঁর চাহনী দেখেই স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, অন্তরে অন্তরে তিনি অসম্ভব রকম সঙ্কুচিত হ'য়ে উঠেছেন। আর কোনো কথা না ব'লে তিনি নিজের কেবিনের দিকে এগিয়ে গেলেন।...অন্যদিনের মতো সেদিনও মাঝরাতে উঠে ওপরকার ডেক-এ গিয়ে হাজির হ'লাম। কিন্তু অনেক খুঁজেও তাঁকে আর আবিষ্কার ক'রতে পারলাম না। এদিক্

ওদিকে তাকালাম। শুধু দেখলাম শোকার্ত ডাচ্ ভদ্রলোকটি নিজের মনে ডেক-এর ওপরে পায়চারী ক'রে বেড়াচ্ছেন।

নেপল্‌স্ বন্দরে এসে জাহাজ ভিড়্‌লো।

বেশির ভাগ যাত্রীই সেখানে নেমে গেল। তাদের সঙ্গে আমিও নিচে নেমে গেলাম। অপেরায় গিয়ে নাচ দেখলাম। তারপর সুন্দর একটা হোটেলে গিয়ে রাত্রের আহার সমাধা ক'রে জাহাজে ফিরে এলাম।

এসেই দেখি গোলমাল। হৈ চৈ কানে এলো। ব্যাপার কি দেখতে গিয়ে রেলিং ধ'রে দাঁড়ালাম। তাকিয়ে দেখি নিচেকার নৌকোগুলি থেকে মাঝিরা আলো ফেলে কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিন্তু ব্যাপারটা কি তা বুঝে উঠ্‌তে পারলাম না।

এরপর জাহাজটা যখন জেনোয়ায় গিয়ে থামলো, তখন একটা খবরের কাগজ কিনে পড়তে শুরু ক'রলাম। এমন সময় একটা সংবাদের দিকে আমার চোখ পড়তেই চম্‌কে উঠ্‌লাম—'এ কি!'

খবরটা এইরকম—

"অন্ধকারের মধ্যে যখন ডাচ্‌বন্দরাগত জাহাজটি থেকে একটি মহিলার শবাধার নৌকোয় নামানো হচ্ছিল তখন একটি দুর্ঘটনা ঘটে। শবাধারের সঙ্গে ঐ নৌকোতে ভদ্রমহিলার স্বামীও ছিলেন। তাদের নিয়ে নৌকোটি যেই একটু এগিয়েছে, অমনি জাহাজের ওপর থেকে একটা পাগল লাফিয়ে পড়ে নৌকোর ওপর। সঙ্গে সঙ্গে কফিনটি সুদ্ধ নৌকোটি ডুবে যায়। মৃতা রমণীর স্বামী ও অন্যান্য আরোহীরা রক্ষা পেয়ে যান কোন রকমে।"

এই খবরের সঙ্গেই একটু তলায় আবার লেখা আছে—"নেপল্‌স্ বন্দরের তীরে একটি মৃতদেহ পাওয়া গেছে। লোকটিকে সনাক্ত করা যায় নি। তার মাথায় একটা গুলির চিহ্নও আছে।"

কিন্তু কোন লোকই পূর্বোক্ত ঘটনার সঙ্গে এই মৃত ব্যক্তির যোগ আছে ব'লে মনে করবেন না!

এতক্ষণ ধ'রে যাঁর কথা আপনাদের শোনালাম, কাগজ পড়বার সময় বার বার তাঁর সেই বিষাদক্লিষ্ট মুখখানি মনে পড়তে লাগলো।

আর্থার স্কলিজ্‌লার—

জমিদারের অদৃষ্ট

রাণীর ভূমিকায় ক্লেয়ার হেল্‌কে আবার রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হ'তে দেখা যায়—মে মাসের এক সন্ধ্যায়। এ দু'মাস সে যে কেন অনুপস্থিত ছিল সে-কথা সকলেই জানে। মার্চের পনেরো তারিখে যুবরাজ রিচার্ড বেডেন-ব্রক ঘোড়া থেকে প'ড়ে আহত হন। তাঁরই সেবার ভার নিজের হাতে নিয়েছিল ক্লেয়ার হেল্! কিন্তু তার অনেক চেষ্টাতেও যুবরাজ আরোগ্য লাভ করেন নি। শোকটা এত গভীর যে, অনেকেই ভেবেছিল—এ আঘাত ক্লেয়ার হয়তো সহ্য ক'রতে পারবে না। সকলেরই চিন্তার অন্ত ছিল না। কারণ, এ আঘাত কাটিয়ে উঠ্‌তে না পারলে তার মতো সুকণ্ঠী গায়িকার গান হয়তো চিরতরে বন্ধ হ'য়ে যাবে। কিন্তু সকলের এই দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনাকে ব্যর্থ ক'রে দিয়ে ক্লেয়ার যেদিন আবার রঙ্গমঞ্চে আত্মপ্রকাশ ক'রলো সেদিন দর্শক সমাজ আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠেছিল।

গ্যালারীতে বসেছিল ফ্যানী। কি সুন্দর শিশুর মতো মুখখানি তার। ওপরতলাকার দর্শকেরা তাকে দেখতে পেয়ে খুশিতে উচ্ছল হ'য়ে ওঠে। এর কারণ ছিল। ফ্যানী সাধারণ একজন দোকানদারের সামান্য কর্মচারীর মেয়ে হ'লে হবে কি; সে যে সুন্দরী ক্লেয়ারের বন্ধু। তারা দুই সখী। ক্লেয়ারের সঙ্গে যে মেয়েরা গান গাইতো, তাদের মধ্যে ফ্যানীও ছিল একজন। ক্লেয়ারের বাড়ি থেকে মাঝে মাঝেই তার নিমন্ত্রণ আসতো। তাছাড়া মৃত যুবরাজের সঙ্গে প্রেমের ব্যাপারে সে-ও একবার জড়িয়ে পড়ে।

বিরামের অবসরটুকুতে ফ্যানী তার বন্ধুদের জানিয়ে দিল যে, জমিদার লিসেনভগ্‌ই সেদিন ক্লেয়ারকে রাণীর ভূমিকায় নামবার জন্য অনুরোধ

করেছেন। সামনের বক্সেই বসেছিলেন তিনি। পরিচিত সকলে যখন তাঁকে স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়ে অভ্যর্থনা করলেন, তখন তিনি কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে বসে রইলেন। পুরানো দিনের স্মৃতিবিজড়িত বহু দুঃখের কথাই তাঁর কেবল মনে পড়ছিল, দশ বছর আগে ক্লেয়ারের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ ও পরিচয়।

সেদিন সন্ধ্যায় জমিদার গিয়েছিলেন থিয়েটার দেখতে। সুন্দরী ক্লেয়ার সেদিন ফিলিনের ভূমিকায় নেমেছিল। জমিদার তখন যুবক। বছর পঁচিশ বয়স হবে তাঁর। অভিনয় শেষ হ'য়ে গেলে ইসেন্‌ষ্টীনের মধ্যস্থতায় অভিনেত্রী ক্লেয়ারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। ক্লেয়ারের কাছে তিনি প্রেম নিবেদন করেন। একথাও তিনি সেদিন উচ্ছ্বাসের সঙ্গেই বলেছিলেন যে, তার সকল রকম বিলাস-ব্যসনের খরচ তিনি সানন্দে বহন ক'রবেন। প্রয়োজন হ'লে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি ব্যয় ক'রতেও প্রস্তুত।

ক্লেয়ারের মা ছিলেন ডাক বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর স্ত্রী। মা আর মেয়ে এক সঙ্গেই থাকতেন। এই সময় ক্লেয়ারের প্রণয়ী ছিল মেডিকেল কলেজের একজন তরুণ ছাত্র। তাকে প্রায়ই দেখা যেত ক্লেয়ারের কক্ষে চায়ের আসরে। জমিদার এসব কথা জেনেও তাকে লাভ করবার আশা মন থেকে দূর করতে পারেন নি। প্রত্যেকটি উৎসব অনুষ্ঠানে জমিদার ফুল পাঠাতেন অভিনেত্রী ক্লেয়ারকে। সেই সঙ্গে আসতো রাশি রাশি উপহার। কত রকমের তার ঠিক নেই। মাঝে মাঝে ক্লেয়ারও তাঁকে নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠাতো।

সেই বছর হেমন্তকালে ক্লেয়ারের কাছে অনুরোধ এলো ডেট্‌মণ্ড্ থেকে। অভিনয় করবার অনুরোধ। লিসেন্‌ভগ্ সে সময় কি একটা সরকারী কাজে নিযুক্ত। বড় দিনের ছুটির সুযোগ নিয়ে তিনি সেবার ক্লেয়ারের সঙ্গে দেখা ক'রতে যান। মেডিকেল কলেজের ছাত্রটি এদিকে ডাক্তারী

পাশ ক'রে ক্লেয়ারকে বিয়ে করেছে। এ কথা জেনেও লিসেন্‌ভগ্‌ আর একবার তাঁর প্রেম নিবেদন করেন ক্লেয়ারের কাছে।

ক্লেয়ার তখন খোলাখুলি ভাবেই তাঁকে জানিয়ে দেয় যে, কোর্ট থিয়েটারের মালিকের সঙ্গে তার এখন একটা সুমধুর সম্পর্ক গ'ড়ে উঠেছে। তা হ'লেও সে শুধু তাঁর চিত্তবিনোদনের জন্যে পার্কে ব'সে তাঁর সঙ্গে গল্প ক'রতে পারে, কিংবা জমিদার যদি বলেন তাহ'লে সে থিয়েটারের রেস্তোরাঁতে আর সব অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সঙ্গে নৈশ ভোজের উৎসবে যোগ দিয়ে তাঁকে আনন্দ দেবার ব্যবস্থা করতে পারে। জমিদার তাতেও নিরুৎসাহ হন না। ক্লেয়ারকে দেখবার জন্য বার কয়েক তিনি ডেট্‌মণ্ডে গিয়ে থিয়েটার দেখেন। আর অভিনয়নৈপুণ্যে মুগ্ধ হ'য়ে ক্লেয়ারকে অন্তরের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন।

এর পরের বছর ক্লেয়ারের চুক্তি হ'লো হামবুর্গে। গান গাইবার জন্যে। জমিদারকে সেবার নিরাশ হ'য়ে ফিরে আসতে হয়। কারণ ক্লেয়ার তখন এক ডাচ্‌-বণিকের সঙ্গে ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে ব্যস্ত। নিজের আর্থিক অবস্থাটা ফিরিয়ে নেবার মতলবে ক্লেয়ার এই বণিকের সঙ্গে তখন মেতেছিল।

তার পরের বছর, ড্রেস্‌ডেনের কোর্ট থিয়েটারের সঙ্গে ক্লেয়ারের আর একটা চুক্তি হয়। এই বছর লিসেনভগ্‌ সরকারী চাক্‌রী ছেড়ে দেন। ক্লেয়ারকে তিনি কিছুতেই ভুলতে পারেন না। তার মধ্যে যেন মায়া আছে। জমিদার সেই আকর্ষণেই ড্রেস্‌ডেন যাত্রা করেন। সেখানে প্রত্যেক সন্ধ্যায় তিনি ক্লেয়ারের বাড়িতে গিয়ে মা ও মেয়ের সঙ্গে আলাপ করতেন। ক্লেয়ারের মা ছিলেন সুচতুরা। মেয়ের বন্ধুবান্ধবদের তিনি সুকৌশলে আদর অভ্যর্থনা ক'রে সন্তুষ্ট রাখতেন।

হঠাৎ সেই ডাচ্‌ ভদ্রলোকটির কাছ থেকে এক চিঠি এলো। তিনি

তাতে লিখেছেন যে শীগ্‌গিরই তিনি আসছেন। আর এ কথাও ক্লেয়ারকে তিনি স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিয়েছেন যে, তার পেছনে গুপ্তচর লাগানো হয়েছে। তিনি যদি তার কোনরকম বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় পান, তা হ'লে তাঁর হাতেই ক্লেয়ারের মৃত্যু সুনিশ্চিত। কিন্তু ডাচ্ ভদ্রলোকটি নির্দিষ্ট সময়ে এসে হাজির হন না। ক্লেয়ার তাই আরও বিচলিত হ'য়ে পড়ে।

লিসেনভগ্ ঠিক ক'রলেন এ সমস্যার তিনিই একটা সুরাহা ক'রে উঠবেন। এই ভেবে তিনি গেলেন ডেট্‌মণ্ডে, সেই ডাচ্-ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা ক'রতে। তিনি কিন্তু লিসেনভগ্‌কে জানালেন যে, তাঁর দাবীর জোর আছে এইটে দেখাবার জন্যেই ওভাবে ভয় দেখিয়ে ক্লেয়ারকে পত্রাঘাত করেছেন। কোনো বিষয়েই বিশেষ ভাবে জড়িয়ে পড়ার ইচ্ছে তাঁর নেই। তাঁর এই স্বীকারোক্তিতে লিসেন্‌ভগ্ খুশি হ'য়ে উঠ্‌লেন। ড্রেসডেনে ফিরে গিয়ে তিনি ক্লেয়ারকে সব কথা খুলে বলেন। ক্লেয়ার তাঁকে আন্তরিক ভাবে অভিনন্দিত করে। কিন্তু জমিদারের প্রেম নিবেদনে বড় একটা সাড়া দেয় না। লিসেন্‌ভগ্ তাই যেন একটু বিস্মিত হ'য়ে পড়েন।

জমিদারকে বারে বারে প্রত্যাখ্যান করার কারণ জিজ্ঞাসা করায় ক্লেয়ার জানায়—"আপনি যখন এখানে ছিলেন না, ঠিক সেই সময় প্রিন্স্ কাজেটান্ আমার কাছে প্রায়ই আসতেন। আমার প্রতি তিনি গভীরভাবে আকৃষ্ট হ'য়ে পড়েন। আমি তাঁকে প্রত্যাখ্যান ক'রলে তিনি আত্মহত্যাই ক'রবেন, একথা তিনি সেদিন অশ্রুসজল চক্ষে ব'লে গেছেন। রাজপরিবার, সেই সঙ্গে দেশ যাতে অনর্থক দুঃখে ভেসে না যায় সেই কথা চিন্তা ক'রেই আমি আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁর কথায় মত দিয়েছি।" এ কথা শোনবার পরও লিসেন্‌ভগ্ তার আশা ত্যাগ করেন না। ড্রেসডেন্ ছেড়ে তিনি ভিয়েনায় গিয়ে হাজির হন।

তাঁরই অনেক চেষ্টায় সেখানকার অপেরায় গান গাইবার জন্ম ক্লেয়ারকে ডাকা হ'লো। আর সব জায়গায় যথেষ্ট সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় ক'রে ক্লেয়ার অক্টোবর মাসে ভিয়েনায় গিয়ে হাজির হ'লো এবং অপেরায় যোগ দিল। সন্ধ্যায় যখন অভিনয় শেষ হ'য়ে যায়, জমিদার তখন ক্লেয়ারকে একরাশ ফুল পাঠিয়ে দেন তার সাজঘরে। এ তাঁর উপহার। সেদিন ক্লেয়ারের মুখ দেখে জমিদার একটু যেন আশান্বিত হ'য়ে উঠ্‌লেন। কিন্তু যখন শুনলেন ক্লেয়ার তার সহ-অভিনেতার প্রেমমুগ্ধ, জমিদার তখন দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। বুঝলেন তাঁর আর কোনো আশা নেই।

এমনি ভাবে কেটে যায় সাতটি বছর।

ওদিকে অভিনেত্রীর মন চায় নিত্য নতুন সঙ্গী, নিত্য নতুন প্রেম।

তখনকার এক বিখ্যাত তরুণ জকির সঙ্গে ক্লেয়ার প্রেমে পড়ল। তার নাম ফ্লেমেন। ফ্লেমেনও বিদায় নিলো। এলো এক গানের মাষ্টার। তারপর এলেন জমিদার এল্‌বান রেট্‌নি। এ ভদ্রলোকের যথাসর্বস্ব জুয়োখেলায় নষ্ট হ'য়ে যায়। এর পরের বছর এড্‌গার নামে এক কবির সঙ্গে ক্লেয়ার প্রেমাসক্ত হ'য়ে পড়ে। কবি তার নিজের খরচেই ট্রাজেডী নাটক রচনা ক'রে অভিনয় করার ব্যবস্থা ক'রতেন। তবু অভিনেত্রী ক্লেয়ার যেন খুশি নয়। নতুনের মোহে সে উন্মাদ। কবির পর উনিশ বছরের এক তরুণকে সে ভালোবাসল। তার চেহারাও যেমন ছিল কন্দর্পকান্তি, পরিচ্ছদের পারিপাট্যও ছিল তেমনি। সবদিকে ছিমছাম, সুন্দর। তরুণটির নাম উইল্‌হেল্‌ম্‌।

জমিদার লিসেনভগের কাছে ক্লেয়ার সব কথাই খুলে ব'লেছে, কিছুই গোপন রাখেনি। ক্লেয়ারের স্বভাবই ছিল হাসিখুশি আনন্দের মধ্য দিয়ে জীবন কাটানো। তাই তার ঘরে প্রায় সব সময়ই তরুণ-তরুণীদের ডাক পড়তো। চলতো—নাচ, গান হৈ হল্লা। অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যেও

ক্লেয়ারের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। কোন মেলার আয়োজন হ'লেই সে একটা দোকান ভাড়া ক'রে ব'সত। অভিজাত শ্রেণীর মেয়েরা এবং বড়লোক ইহুদীরা তার কাছ থেকে জিনিস কিনে নিজেদের ধন্য মনে ক'রত। রঙ্গমঞ্চের কাছে যে সব তরুণ-তরুণী সাগ্রহে তার প্রতীক্ষা করত, সে তাদের দিকে মধুর কটাক্ষপাত ক'রে চ'লে যেত। যে ফুল সে উপহার পেত, তাই ছড়িয়ে দিত জনতার দিকে। কেউ যদি সে ফুল সংগ্রহ ক'রতে না পারত, তাহ'লে সে তার দিকে সুমধুর দৃষ্টিতে চেয়ে মিষ্টি ক'রে ব'লত—"খুব দুঃখিত! কাল আবার এমনি সময় এসো। তোমাকে ফুল দেব!" তারপর সে এগিয়ে যেত তার গাড়ির দিকে। গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বের ক'রে সে হতাশায় দুঃখিত এই সব লোকদের লক্ষ্য ক'রে ব'লত—"কাল তোমরা ফুলও পাবে, কফিও পাবে।"

ফ্যানীও ক্লেয়ারের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে। তার কথায়, তার ব্যবহারে ক্লেয়ার খুব খুশি হয়। তাই মুগ্ধচিত্তে সে ফ্যানীকে আবার তার কাছে আসতে বার বার ক'রে অনুরোধ করে। ফ্যানীও নিয়মিতভাবে তার কাছে যাওয়া-আসা করে। দুজনের মধ্যে এইভাবে নিবিড় সখিত্ব গ'ড়ে ওঠে। যে সব দোকানদারের ছেলেরা ফ্যানীর সঙ্গে নাচতো, তাদের অনেকেই তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করেছিল। কিন্তু ফ্যানী রাজী হয়নি। সে ভালোবেসেছিল ক্লেয়ারের এক প্রশংসাকারী বন্ধুকে। জীবনে এই সে প্রথম প্রেমে পড়্‌ল।

ক্লেয়ার যুবরাজ ব্রেবডেনব্রককে প্রাণের চেয়েও ভালোবাস্‌লো।

ওদিকে জমিদার বার বার নিরাশ হ'য়েও ক্লেয়ারকে পাবার আশা একেবারে ছাড়তে পারেননি। দশ বছর ধ'রে তিনি যে মনোহর স্বপ্নের কল্পনা করেছিলেন, তা বোধ হয় আর পূর্ণ হয় না। ক্লেয়ার যখনই কোনো

প্রেমাস্পদকে প্রত্যাখ্যান করে, লিসেনভগ্‌ তখনই মনে মনে এই আশা পোষণ করেন, যে, এবার তিনি তাঁর বাঞ্ছিতাকে লাভ করবেন। যুবরাজ মারা গেলেন। জমিদার তখন তাঁর সুন্দরী রক্ষিতাকে ত্যাগ ক'রে ভাবলেন—এবার হয়তো ক্লেয়ার তাঁর বাহুবন্ধনে ধরা দেবে। কিন্তু ক্লেয়ার যুবরাজকে বোধ হয় সত্যিই ভালোবেসেছিল। তাই তার মৃত্যুতে শোকে সে এতই অধীর হ'য়ে পড়ে যে, সকলেই ভেবেছিল ক্লেয়ার এতদিনে প্রকৃত প্রেমের আস্বাদন থেকে নিজেকে বঞ্চিত করলো।

ক্লেয়ার এদিকে রোজ একবার ক'রে যায় সমাধিক্ষেত্রে। যুবরাজের কবরের উপর ছড়িয়ে দেয় ফুল। তার সাজ-সজ্জা সব গেল বদ্‌লে। কোথায় সেই চক্‌মকে গাউন আর ঝক্‌মকে অলঙ্কার! অনেক উপরোধ অনুরোধ ক'রে তবে তাকে কোনরকমে রঙ্গমঞ্চে নামানো যায়।

পরে, যুবরাজের মৃত্যুর পর এই যেবার ক্লেয়ার রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হ'লো তখন তার বাইরের আচরণে শোকের কোনো আভাসই দেখা যায় নি। শুধু সে মিশ্‌তো কম। পূর্বপরিচিত গুটিকয়েক বন্ধু-বান্ধবী ছাড়া তাকে বড় একটা কারুর সঙ্গে মেলামেশা ক'রতে দেখা যেত' না।

যুবরাজের দু'টি মাসতুতো ভাই প্রায়ই আসতো তার কাছে। তাদের সঙ্গে সে শুধু ভালোবাসার অভিনয়ই ক'রে যেত'। একদিন ফরাসী রাষ্ট্রদূতের দপ্তরের এক ভদ্রলোক, সেই সঙ্গে এক চেক্‌ পিয়ানো-বাদক এলেন ক্লেয়ারের সঙ্গে দেখা ক'রতে। এগারই জুন সবাই খুব অবাক হ'য়ে গেল ঘোড়দৌড়ের মাঠে ক্লেয়ারকে আবিষ্কার ক'রে। লুসিয়াস হ'লো যুবরাজের এক মাসতুতো ভাই। কবি প্রকৃতির এক তরুণ সে। তার কবিত্বপূর্ণ প্রেম-সম্ভাষণে ক্লেয়ার খুশি হ'ত খুব,—কিন্তু তার অন্তরে যেন কোনো সাড়া জাগ্‌তো না। তার কোনো পুরোনো বন্ধু বা বান্ধবী কখনো

যদি তার প্রেমের ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করত, তাহ'লে তার মুখখানি কেমন যেন মলিন হ'য়ে উঠত। কখনো তাকে দেখা যেত সম্পূর্ণ উদাসীন দৃষ্টিতে উপরের দিকে চেয়ে থাকতে। সে যেন কি ব'লতে চায়। পৃথিবীর পুরুষ জাতটাকে লক্ষ্য ক'রেই সে যেন কিছু ব'লবে!

জুন মাসের মাঝামাঝি এক সময়ে নতুন একজন গায়ক এলো উত্তর প্রদেশ থেকে। নাম তার ওল্‌সি। থিয়েটারে নেমে সে ভাগনারের স্বরলিপি থেকে একটি গান বেছে নিল। তার গলার স্বর খুব উঁচু পর্দায় উঠ্‌তো। তাই ব'লে তাকে ঠিক প্রথম শ্রেণীর গায়ক বলা যায় না। বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী হ'লেও, তার মুখের হাবভাব মন কেড়ে নেবার মত ছিল না। কিন্তু গান গাইবার সময় তার চোখদুটি এমন এক দীপ্ত সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠ্‌তো, যার একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য ছিল। সে দীপ্তি যেন তার সুন্দর অন্তরেরই বহিঃপ্রকাশ। প্রত্যেক তরুণীই তাতে মুগ্ধ হ'ত। থিয়েটারের বক্সে ক্লেয়ার বসেছিল অন্যান্য গায়িকাদের সঙ্গে। অপলক দৃষ্টিতে সে ওল্‌সির অভিনয় দেখছিল।

পরদিন সকালে ওল্‌সির সঙ্গে ক্লেয়ারের পরিচয় হ'লো রঙ্গমঞ্চের ব্যবস্থাপকের ঘরে। আন্তরিকতার সঙ্গেই ক্লেয়ার আলাপ করলো, কিন্তু গত রাত্রের অভিনয় সম্বন্ধে কোন মন্তব্য ক'রলো না একটিবার। সেদিন সন্ধ্যায় একরকম অনাহূত ভাবেই ওল্‌সি গিয়ে হাজির হ'লো ক্লেয়ারের বাড়িতে। জমিদার লিসেন্‌ভগ্‌ আর ফ্যানীও ছিল সেখানে। তারা সবাই একসঙ্গে ব'সে চায়ের আসর জমিয়ে তুল্‌ল।

ওল্‌সি ব'লে যায় তার জীবনের কাহিনী—"আমার গানে মুগ্ধ হ'য়ে একবার এক ইংরেজ ভদ্রলোক নেমে আসেন জাহাজ থেকে। আমার গান তাঁকে চঞ্চল ক'রে তুলেছিল এ আমার সৌভাগ্য। কিন্তু এই সঙ্গীতের অন্তরালে যে কি ব্যথা ও বেদনা আত্মগোপন ক'রে আছে, সে

কথা তো তিনি জানতেন না। আমি তখন সবে বিয়ে করেছি। সে ছিল ইটালীর মেয়ে। তাকে সঙ্গে ক'রেই সমুদ্র যাত্রা করেছিলাম। কিন্তু দেবতা হ'লেন অপ্রসন্ন। তাকে চিরদিনের জন্য সমুদ্রেই রেখে আসতে হ'লো!"

দুঃখে ভরা এই কাহিনী শুন্‌তে শুন্‌তে অভিনেত্রী ক্লেয়ারের মনে প'ড়ে যায় যুবরাজের কথা। সকলের অলক্ষ্যে সে যেন একটু অস্থিরতা প্রকাশ করে। কিন্তু পরক্ষণেই আবার মুখের ভাব স্বাভাবিক ক'রে আনে। তীক্ষ্ণদৃষ্টি লিসেন্‌ভগ্‌ কিন্তু এটা লক্ষ্য করেন।

ওল্‌সি বিদায় নিয়ে চ'লে যাবার পর, সবাই কিছুক্ষণ নির্বাক হ'য়ে ব'সে রইলেন।

এরপর ওল্‌সি মাঝেমাঝেই ক্লেয়ারের বাড়িতে যায়। কয়েকটা উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতও সে করেছিল কয়েকদিন। গানের গোড়া থেকে শেষ অবধি ক্লেয়ার শোনে তন্ময় হ'য়ে। এর মধ্যেই ক্লেয়ার একদিন ফ্যানীকে নিয়ে যুবরাজের সমাধি স্তম্ভে একটা ক্রশ চিহ্ন রেখে আসে।

জুনের শেষ দিকে এক সন্ধ্যায় ওল্‌সি ভাগনারের গানের খাতা থেকে শেষবারের মতো কয়েকখানা গান গায়। তার বিদায় উপলক্ষে ক্লেয়ার বিরাট একটা ভোজের আয়োজন করে। তার বন্ধু ও বান্ধবী সকলেই তাতে নিমন্ত্রিত হ'য়ে আসে। ওল্‌সি যে অভিনেত্রীর প্রতি গভীর ভাবে আকৃষ্ট হয়েছে, সে কথা সবাই জানতো। আহারের সময় আলাপ আলোচনার ফাঁকে লিসেন্‌ভগ্‌ ওল্‌সির সঙ্গে ভাব জমিয়ে তোলেন। ওল্‌সি হঠাৎ ফ্যানীকে ডেকে কথা বল্‌তে ফ্যানী চম্‌কে ওঠে। সে যেন এর জন্যে প্রস্তুত ছিল না, তাই কেমন যেন একটু বিচলিত হ'য়ে পড়ে। ওল্‌সি বলে—"শীগ্‌গির এ দেশ ছেড়ে চ'লে যাচ্ছি।" ফ্যানীর চোখ ছল্‌ছল্‌

ক'রে ওঠে, কিন্তু ক্লেয়ারের মনে কোনো চাঞ্চল্য দেখা যায় না। আর সবার সঙ্গে সে যেমন কথা বল্‌ল, ওল্‌সির সঙ্গেও তাই।

ওল্‌সি ক্লেয়ারের একখানা হাত তুলে নিয়ে তাতে চুম্বন করে। তার চোখে মুখে কেমন যেন একটা হতাশার বেদনা। এধারে অভিনেত্রী স্থির অচপল, নির্বাক। জমিদার কিন্তু তাদের এই হাবভাব সন্দেহের চোখে দেখেন। অভিনেত্রীর আর একটা ব্যবহারে চঞ্চল হ'য়ে ওঠেন লিসেন্‌ভগ্‌। ওল্‌সি এলো ক্লেয়ারের কাছে তার শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদায় নিতে। ঠিক সেই মুহূর্তে ক্লেয়ার হঠাৎ তার হাতখানা ধ'রে কানে কানে ব'লে ওঠে—"বন্ধু! আবার কিন্তু আসতে হবে।" ওল্‌সি যেন শুনেও শুন্‌তে পায় না সে-কথা। ক্লেয়ার আবার তেমনি ক'রে তার কানের কাছে ঠোঁট নিয়ে গিয়ে বলে—"বন্ধু আসতেই হবে তোমাকে। তোমার অপেক্ষায় থাকব আমি। এক ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসতে হবে তোমাকে।"

প্রফুল্লচিত্তে গায়ক চ'লে যায় বিদায় নিয়ে।

জমিদার লিসেন্‌ভগ্‌ তখন তাঁকে আর ফ্যানীকে নিয়ে যান তাঁর হোটেলে। কিছুক্ষণ পরে ফ্যানীর হাত ধ'রে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে ওল্‌সি। নির্জন পথ। রাতের স্নিগ্ধ হাওয়া বইছে তখন। ওলসির যেন মনে হ'লো ফ্যানী কাঁদ্‌ছে। তার কাছ থেকে কিছুক্ষণ পর, ওল্‌সি বিদায় নেয়। ট্যাক্সী ডেকে সোজা চ'লে যায় ক্লেয়ারের বাড়িতে। তার শোবার ঘর থেকে তখন একটা হাল্‌কা নীল আলো বেরিয়ে আসছিল পথের উপর। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ক্লেয়ার অভ্যর্থনা করে ওল্‌সিকে। তার প্রতীক্ষাতেই সে বসেছিল এতক্ষণ।

পরদিন সকালে লিসেন্‌ভগ্‌ বেড়াতে বেরিয়েছেন ঘোড়ায় চ'ড়ে। সেদিন যেন তিনি খুব হাসিখুশি। ভবিষ্যতের রঙীন স্বপ্ন ভেসে ওঠে তাঁর চোখের

সামনে। এভাবে ক্লেয়ার আর কতদিন তাঁকে বঞ্চিত ক'রবে তার প্রেম থেকে, কতদিনই বা সে আর অভিনয় ক'রে বেড়াবে রঙ্গমঞ্চে রঙ্গমঞ্চে? ভাবতে ভাবতে তিনি চ'লেছেন। কিছুক্ষণ পরেই তাঁর মনে হয়—ক্লেয়ার হয়তো খুব শীগ্‌গিরই নাট্য জগৎ থেকে বিদায় নেবে। তারপর তাঁরা পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হ'য়ে ভিয়েনার কাছাকাছি কোথাও গিয়ে বাস ক'রবেন। কল্পনার পর কল্পনা ক'রে চলেন লিসেন্‌ভগ্। সারা পৃথিবী তাঁরা ঘুরে বেড়াবেন। কখনো থাকবেন স্পেনে, কখনো বা ইজিপ্টে, কখনো ভারতবর্ষে। এই রকম নানা কল্পনায় বিভোর হ'য়ে তিনি চ'লেছেন। অবশেষে বাড়ির দোর গোড়ায় ঘোড়া এসে থামে। তিনি নেমে এসে একরাশ তাজা গোলাপ পাঠিয়ে দিলেন অভিনেত্রীর কাছে, তাঁর সহিসের হাত দিয়ে।

দুপুর বেলাকার আহারাদি সেরে জমিদার বিছানায় তার গা-টা এলিয়ে দিলেন। অভিনেত্রীর চিন্তায় তিনি বিভোর। কয়েকটি সুন্দরী রমণীর সঙ্গলাভও করেছেন তিনি। চিত্তবিনোদনের জন্যে এসেছিল তারা। কিন্তু সে সব কোন নারীই তাঁর চিত্তে ক্লেয়ারের মত দাগ কাটতে পারেনি। কল্পনার জাল বুনে চলেছেন লিসেন্‌ভগ্। কত রঙীন কত মনোহর সেই চিন্তা। তিনি ভাবেন—ক্লেয়ার হয়তো সত্যি একদিন তাঁর কাছে এসে হৃদয়ের বদ্ধ কবাট খুলে দিয়ে বল্‌বে—"ওগো প্রিয়, ওগো প্রিয়তম! এসো, তোমার জন্যেই আমার হৃদয়ে আসন রয়েছে বিছানো; আমার এই শূন্য আসনের তুমিই তো একমাত্র অধিকারী। এসো, এসো, এসো।" লিসেন্‌ভগ্ আবার ভাবেন—"ক্লেয়ার আমাকে ছাড়া এজগতে আর কাউকেই ভালোবাসে না। ভালোবাসার কল্পনাও ক'রতে পারে না।"

বেশবাস পরিবর্তন ক'রলেন জমিদার। তারপর তাঁর পরিচিত পথ ধ'রেই চল্‌লেন অভিনেত্রীর আবাসে। এ যেন তাঁর অভিসার-যাত্রা!

শীতের পর তখন গ্রীষ্ম আস্‌ব আস্‌ব ক'রছে। জমিদার ভাবতে ভাবতে চলেছেন—দু'জনে মিলে বেড়াবেন পাহাড়ে পাহাড়ে। দেখবেন তার সৌন্দর্য। যাবেন সমুদ্রের তীরে। দু'জনে মিলে উপলব্ধি ক'রবেন সেই বিরাটত্ব। চিন্তার সূত্র ছিন্ন হ'য়ে গেল হঠাৎ। সামনেই তিনি দেখতে পেলেন ক্লেয়ারের বাড়ি। শূন্য দৃষ্টি মেলে তিনি তাকিয়ে থাকেন অভিনেত্রীর জানালার দিকে! তারপর সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে যান। দরজায় আস্তে আস্তে কড়া নাড়েন। কিন্তু কোনো সাড়া নেই। আবার আঘাত করেন দরজায়। দরজা তবু খোলে না। নিরাশ হ'য়ে ফিরে আসতেই হঠাৎ নজরে পড়ে দরজার গায়ে অভিনেত্রী ক্লেয়ার হেলের নাম নেই। তার জায়গায় অন্য নামের বোর্ড ঝুল্‌ছে।

লিসেনভগের বিস্ময়ের আর অন্ত নেই। নিচে নেমে গিয়ে তিনি অনুসন্ধান করেন। বাড়ির চাকর জবাব দেয়—"তিনি তো কোথায় চলে গিয়েছেন!" দ্রুত পাদক্ষেপে তিনি নিচে নেমে আসেন। পথে দাঁড়িয়ে নিজের অজ্ঞাতসারেই আবার তাঁর দৃষ্টি অভিনেত্রীর বাড়ির দিকে ফিরে যায়। অন্যান্য দিনের অপরাহ্ণ বেলার কথা তাঁর মনে পড়লো। সূর্যাস্তের সময় লাল আভা প'ড়ে বাড়িখানাকে কি সুন্দরই না দেখাতো। আজও সেই লাল আভা এসে পড়েছে বাড়িখানার গায়ে। কিন্তু এ দৃশ্য আজ আর লিসেন্‌ভগের ভালো লাগে না। এ যেন শুধু পানপাত্রই পড়ে আছে, তাতে সুরা নেই।

তবে কি ক্লেয়ার সত্যি সত্যি চলে গেল! সে কি আর ফিরে আস্‌বে না? এই ধরনের কতো চিন্তা একসঙ্গে ভিড় ক'রে আসে। ভাবতে ভাবতে তিনি এগিয়ে চলেন নাট্যশালার দিকে। তাঁর হঠাৎ মনে প'ড়ে যায়, দু'দিন আগেই তো সে আর রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করেনি। তিনি তখন চিন্তাকুল মনে রিজেসারের বাড়িতে গিয়ে হাজির হন। পরিচারিকা

এসে দরজা খুলে দেয়। জমিদারকে চিনতে পেরেই সে অভিবাদন করে। রিঙ্গেসার আসতেই লিসেন্‌ভগ. তাকে ফ্যানীর কথা জিজ্ঞাসা করেন—"ফ্যানী কোথায় ?" রিঙ্গেসার তখন জমিদারকে অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে গিয়ে ঘরে বসায়। বলে—"ফ্যানী তো এখানে নেই। ক্লেয়ার তাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেছে ছুটি উপভোগ করতে।"

—"কোথায় তারা গেছে, ব'লতে পারেন ?" জমিদার প্রশ্ন করেন সাগ্রহে।

রিঙ্গেসার জবাব দেয়—"না, তা তো বলতে পারিনা স্যার! আজ সকাল আটটা অবধি ক্লেয়ার তো এখানেই ছিল। ফ্যানীকে নিয়ে যাবার জন্যে বার বার ক'রে সে অনুরোধ করে। শেষটায় আমার মত পেয়ে ফ্যানীকে সে সঙ্গে ক'রেই নিয়ে গেছে।"

লিসেন্‌ভগ্ ভাবেন, কোথায় তারা যেতে পারে ? কোথায় যাওয়া সম্ভব ? তারপর কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। "আচ্ছা, আমি তাহ'লে আসি"—এই ব'লে তিনি রিঙ্গেসারের করমর্দন ক'রে বিদায় নিলেন। গাড়িতে উঠেই তিনি কোচ্‌ম্যানকে আদেশ করলেন—"সোজা হোটেল ব্রিষ্টলে চলো।" ওল্‌সি এখনো চ'লে যায়নি শহর ছেড়ে। লিসেন্‌ভগ্‌কে সে অভ্যর্থনা ক'রে ঘরে নিয়ে বসায়। তারপর তাঁকে সন্ধ্যাটা কাটিয়ে যেতে অনুরোধ করে।

লিসেন্‌ভগ্ এই ভেবে আশ্চর্য হয়ে যান যে, ওল্‌সি এখনো কেন ভিয়েনায় রয়েছে। ওল্‌সি জিজ্ঞাসা করে ক্লেয়ারের সম্বন্ধে। তার সহানুভূতির সুরে লিসেন্‌ভগের চোখ অশ্রুপূর্ণ হ'য়ে ওঠে। ওল্‌সি তাঁর কাছে বিশেষ ভাবে জানতে চায় ক্লেয়ার সম্বন্ধে—"সব কথা আপনি খুলে বলুন।" লিসেন্‌ভগ্ ওল্‌সির একটা তোরঙ্গের ওপরে চেপে ব'সে অভিনেত্রীর গুণাগুণ বর্ণনা ক'রে চলেন। তার কথা বল্‌তে গিয়ে

জমিদারের চোখ মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে। কতগুলি কথা তিনি গোপন ক'রে যান। তাতে অভিনেত্রীর সম্মানে আঘাত লাগতে পারে এই তাঁর আশঙ্কা। মুগ্ধ বিস্ময়ে ওল্‌সি জমিদারের কথা শুনে যায়।

নৈশভোজের আসরে ওল্‌সি বলে—"দয়া ক'রে একবার আমার জমিদারীতে যাবেন। বিশেষ অনুরোধ করছি আপনাকে।" জমিদার খুব খুশি হন এই কথা শুনে। বলেন—"বেশ তো, আসছে গরমের সময়ই আপনার ওখানে যাওয়া যাবে। কথা দিচ্ছি।"

আহারের পর্ব চুকিয়ে দু'জনেই স্টেশনের দিকে রওনা হন। পথে যেতে যেতে ওল্‌সি বলে—"আমি মশাই দিলদরিয়া মানুষ। সত্যি কথা বল্‌তে কি ক্লেয়ারের জানালার দিকে আমার একবার তাকাতে ইচ্ছে ক'রছে।" লিসেন্‌ভগ্‌ একবার আড়চোখে তাকিয়ে দেখেন ওল্‌সিকে। ক্লেয়ারের বাড়ির সামনে দিয়ে যাবার সময় ওল্‌সি সেই দিকে একবার চেয়ে ভাববিহ্বল কণ্ঠে ব'লে ওঠে—"বিদায়! সুন্দরী, বিদায়।"

লিসেন্‌ভগ্‌ বলেন—"আপনার এই বিদায়বাণী ব্যর্থ হবে না। ক্লেয়ার ফিরে এলে আমিই তার কাছে পৌঁছে দেব।" ওল্‌সি অবাক্ হয়ে যায় একথা শুনে। লিসেন্‌ভগ্‌ আবার ব'লে চলেন—"আজ সকালে সে চ'লে গেছে। কাউকেই সে কোন কথা বলে যায় নি।" বিস্মিত হয়ে ওল্‌সি বলে—"চলে গেছে?" কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসে সুদীর্ঘ একটা নিশ্বাস। গাড়ির মধ্যে দুজনেই তখন নির্বাক। ট্রেন ছাড়বার আগে ওল্‌সি আলিঙ্গন করে লিসেন্‌ভগ্‌কে। একান্ত পরিচিতের মতই তারা জড়িয়ে ধরে পরস্পরকে।

রাত্রে বাড়ি ফিরে নিজের বিছানায় শুয়ে জমিদারি ছোট শিশুর মতো কেঁদে ওঠেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। তাঁর মনে প'ড়ে যায় ক্লেয়ারের সঙ্গে কত রাতই না তিনি গল্পগুজব ক'রে কাটিয়েছেন! কি মধুর, কি সুন্দর সেই

রাত্রিগুলি। তার সঙ্গে আজকের রাতের কতই না প্রভেদ। বিরহ-বেদনায় ভদ্রলোক অভিভূত হ'য়ে পড়েন। তাঁর মনে প'ড়ে যায় সেই রাত্রের কথা, যে-রাত্রে তিনি ক্লেয়ারকে শেষবারের মতো দেখেছিলেন। ক্লেয়ারের মধ্যে সেদিন যেন একটা কিসের উন্মাদনা ছিল। জমিদারের স্থির বিশ্বাস হ'লো মৃত যুবরাজের অশরীরী আত্মা যেন ক্লেয়ারের চারপাশে ঘুরে বেড়ায়। হয়তো, ক্লেয়ারকে তিনি আর পাবেন না। চিরদিনের মতই হারাতে হবে তাকে। ভাবতে গিয়ে তিনি শিউরে ওঠেন।

এরপর দিনকতক লিসেন্‌ভগ্‌ ভবঘুরের মতো ভিয়েনার পথে পথে ঘুরে বেড়ান। কেমন ক'রে যে তাঁর দিন কাটবে তা আর ভেবে পান না। কখনো তাসের আড্ডায় সময় কাটে, কখনো বা ঘোড়ায় চ'ড়ে ঘুরে বেড়ান। কিন্তু কোনমতেই তাঁর স্বস্তি নেই, কোনমতেই তিনি শান্তি পান না। সব কিছুই যেন নির্ভর ক'রে ক্লেয়ারের উপর। জমিদারের চোখে আজ সমস্ত ভিয়েনা-শহর কুয়াশাচ্ছন্ন। লোকের সঙ্গে তিনি কথা বলেন—কিন্তু তাতে যেন প্রাণের স্পন্দন নেই, নেই কোনো আন্তরিকতার স্পর্শ।

লিসেন্‌ভগ্‌ একদিন সন্ধ্যায় গিয়ে হাজির হলেন স্টেশনে। ইস্‌চেলের একখানা টিকেট কেটে তিনি ট্রেনে চেপে বসেন। পূর্বপরিচিত অনেকেই এসে হাজির হ'লো ইস্‌চেলে। তারা সকলেই ক্লেয়ারের খবর জানতে উৎসুক। কিন্তু কি হ'লো, জমিদার যেন রেগে গেলেন হঠাৎ। কর্কশ কণ্ঠে ব'লে গেলেন কতগুলি কথা। একটা হৈ চৈ শুরু হ'য়ে গেলো। শেষটায় হাতাহাতি, মারামারি পর্যন্ত। কোথা থেকে একটা গুলী এসে লিসেন্‌ভগের কান ঘেঁষে বেরিয়ে যায়। জমিদার আধ ঘণ্টার মধ্যেই সে জায়গা ত্যাগ করেন।

সেখান থেকে লিসেন্‌ভগ্‌ গেলেন টাইবলে। তারপর ওবারল্যাণ্ড, জেনেভা। জেনেভা-হ্রদ তিনি সাঁতরে পার হ'য়ে ওপারে এক পার্বত্য

উপত্যকায় গিয়ে হাজির হ'লেন। তারপর ঘুরে বেড়াতে লাগলেন পাহাড়ে পাহাড়ে। কোথায় কেমন ক'রে যে তাঁর একটু শান্তি মিল্‌বে, তা তিনি আর বুঝে উঠ্‌তে পারেন না।

এর মধ্যে অপ্রত্যাশিতভাবে ভিয়েনা থেকে হঠাৎ একটা তার এলো। কৌতূহলী হ'য়ে তিনি খুলে দেখেন ওল্‌সি জানাচ্ছে—"দেরি না ক'রে শীগ্‌গির চ'লে আসুন। তাহ'লেই বুঝ্‌ব আপনি আমার সত্যিকারের বন্ধু।"

লিসেন্‌ভগ্‌ ভাবলেন, এর সঙ্গে হয়তো ক্লেয়ারের কোনো সম্পর্ক জড়িয়ে আছে। তাই তাড়াতাড়ি সব গুছিয়ে নিয়ে তিনি রওনা হ'লেন। এইক্স থেকে হামবুর্গ, তারপর মিউনিক। সেখান থেকে জাহাজে ক'রে সোজা মোল্ডে এসে পৌঁছুলেন। তখন সবে সকাল হয়েছে।

সুদীর্ঘ এই ভ্রমণ, কত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে দিয়ে আসা,—তবু যেন লিসেন্‌ভগের মনে কোনো শান্তি নেই। ক্লেয়ারের চেহারাও তিনি যেন আর মনে করতে পারছেন না, তার গানও তিনি ভুলে যাচ্ছেন। এ কি হ'লো তাঁর। অবশেষে অপরাহ্ন বেলায় জাহাজ ভিড়লো ভিয়েনার বন্দরে, মনে হ'লো তিনি যেন দশ বছর পরে ভিয়েনায় ফিরে এলেন। জাহাজ ঘাটায় দাঁড়িয়ে আছে ওল্‌সি। পরনে তার সাদা পোশাক। জমিদার তাকে দেখতে পেয়েই আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন। ডেক থেকে তিনি দেখলেন ওলসিকে, ওলসিও দেখলে তাঁকে। লিসেন্‌ভগ্‌ সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলেন।

ওল্‌সি তাঁর হাত ধ'রে ব'লে ওঠে—"বন্ধু, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। আপনি এসে প'ড়েছেন এ আমার সৌভাগ্য। কি ব'লে যে ধন্যবাদ দেব তা বুঝতে পারছি না। তবু বলি ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। আপনি হয় তো জানেন না, এদিকে আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে। আমি আর বাঁচব না।"

সে কি! জমিদার ভালো ক'রে দেখেন ওল্‌সিকে। মুখ তার বিবর্ণ, পাংশু। চুলগুলোও সব যেন পেকে গিয়েছে। উৎকণ্ঠার সঙ্গে লিসেন্‌ভগ্‌ জিজ্ঞাসা করেন—"কি হ'য়েছে, সব খুলে বলুন তো?"

—"হ্যাঁ, খুলেই ব'ল্‌ছি সব।"

ওল্‌সির কণ্ঠস্বরে কেমন যেন একটা অস্বাভাবিকতা। লিসেন্‌ভগ্‌ টের পেলেন তা। দু'জনেই গাড়ি ক'রে চ'লেছেন, সমুদ্রের ধার দিয়ে। পথের দুধারে গাছের সারি। চমৎকার এক তরুবীথিকা। তাঁদের গাড়িও চল্‌ল সেই পথ ধ'রে। কিন্তু কারুর মুখেই কোনো কথা নেই। লিসেন্‌ভগ্‌ তাকিয়েছিলেন বাইরে, সুনীল সমুদ্র-সলিলের দিকে। দৃষ্টি তাঁর উদাসীন। সমুদ্রের উপরে ছোট ছোট ঢেউ। অকারণে তা-ই গুনে চলেন লিসেন্‌ভগ্‌। উন্মুক্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখেন মাঝে মাঝে। হঠাৎ তাঁর মানস-লোকে ভেসে ওঠে সুন্দর একখানি ছবি,—এক অপূর্ব নারীমূর্তি। সে আর কেউ নয় তাঁরই মানসপ্রিয়া ক্লেয়ার হেল্‌। গাড়ি এসে থাম্‌ল সাদা একটা বাড়ির সাম্‌নে।

সন্ধ্যাবেলায় দু'জনে খেতে বসেছেন বারান্দায়। সামনেই দেখা যাচ্ছিল দিগন্তব্যাপী অনন্ত সমুদ্র। বয় এসে মাঝে মাঝে শূন্য পাত্র পূর্ণ ক'রে দিয়ে যাচ্ছিল। লিসেন্‌ভগ্‌ হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে ব'লে ওঠেন—"একি আপনি যে চুপ ক'রেই রইলেন?"

মাথা তুলে সাম্‌নের দিকে তাকায় ওল্‌সি। ধীরে ধীরে বলে—"কি আর ব'লব বলুন। আমার আর কোন মূল্যই নেই। আমি ফুরিয়ে গেছি একেবারেই, শেষ হয়ে গেছি জীবনের মতো!"

—"আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। আপনার জন্য আমি কি ক'রতে পারি বলুন?"

—"কিছুই না।" নির্লিপ্ত কণ্ঠে জবাব দেয় ওল্‌সি। ধীরে ধীরে তার

দৃষ্টি গিয়ে পড়ে টেবিল ঢাকনার ওপর; তারপর বারান্দায়, বারান্দা ছাড়িয়ে বাগানে, বাগান ছাড়িয়ে নীল সমুদ্রের দিকে।

লিসেন্‌ভগ্‌ অবাক্ হয়ে গেছেন একেবারে। নানারক দুশ্চিন্তা এসে তাঁকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে।—"তবে কি ক্লেয়ার আর নেই! ওল্‌সি কি তাকে হত্যা করেছে! তাকে কি সমুদ্রে নিক্ষেপ করেছে সে?" পরক্ষণেই তাঁর মনে হয়—"ওল্‌সিও কি মরে গেছে? না না, ঐ তো সে আমার সামনে ব'সে। কিন্তু ও কথা বল্‌ছে না কেন? এত নীরব কিসের জন্য?"

লিসেন্‌ভগ্‌ হঠাৎ চীৎকার ক'রে ব'লে ওঠে—"বলুন, ক্লেয়ার কোথায়, কোথায় সে?"

ওল্‌সি ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে তাঁর দিকে। জমিদারের মনে হয়, থিয়েটারের সঙের মতো মুখোস প'রে ওল্‌সি যেন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে।

বারান্দার রেলিঙে একটা সবুজ শাল ঝুল্‌ছিল। লিসেন্‌ভগ্‌ সেটাকে তাঁর কোনো পুরোনো বন্ধু ব'লেই মনে করেছিলেন। কিন্তু ভালো ক'রে চেয়ে দেখতেই তাঁর ভুল ধরা পড়ে। তিনি আবার ওল্‌সির দিকে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে ব'লে ওঠেন—"দয়া ক'রে বলুন ক্লেয়ার এখন কোথায়?"

—"ব্যস্ত হবেন না। তার সম্বন্ধে আমাদের নিশ্চয়ই একটা ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু তার আগে বলুন, আপনি আমার সত্যিই বন্ধু তো?"

—"নিশ্চয়ই। আমি আপনার সত্যিকারের একজন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। আমায় কি ক'রতে হবে বলুন?"

ওল্‌সি বলে—"আপনার কি মনে আছে সেই সন্ধ্যার কথা, যে সন্ধ্যায় ভিয়েনা ছেড়ে চ'লে যাবার আগে হোটেল ব্রিষ্টলে আপনাতে আমাতে

দু'জনে ব'সে আহার ক'রেছিলাম? তারপর দু'জনে মিলে একসঙ্গে স্টেশনে যাই?"

লিসেন্‌ভগ্‌ মাথা নেড়ে জবাব দিলেন, সে-কথা তাঁর স্পষ্ট মনে আছে।

ওল্‌সি আবার ব'লে চলে—"ক্লেয়ার যে সেদিন ঐ একই ট্রেনে ভিয়েনা ছেড়ে চ'লে যাচ্ছিল, সেকথা নিশ্চয়ই আপনার ধারণাতে আসেনি একটিবার?"

লিসেন্‌ভগ্‌ মাথা নাড়লেন।

ওলসি বলে—"আমার নিজেরও কোনো ধারণা ছিলনা তার ভিয়েনা-ত্যাগ সম্বন্ধে। সকালে ট্রেনটা একটা স্টেশনে থামতেই, আমি নেমে গিয়ে প্রাতরাশ সেরে আসি। ঠিক সেই সময় স্টেশনের রেস্তোরাঁতে তার সঙ্গে আমার দেখা। ক্লেয়ার ও ফ্যানী এক টেবিলে ব'সে কফি খাচ্ছিল।"

—"তারপর?"

—"সেদিন সকাল বেলায় ক্লেয়ার ও ফ্যানীর সঙ্গে অষ্ট্রিয়ার লেকের ধারে আমার দিন কাটে। সুন্দর একটা কক্ষে, মহা আনন্দেই ছিলাম আমরা।"

কথাগুলি সে এমন খাপছাড়া ভাবে ব'লে যায়, তাতে জমিদারের মনে সন্দেহ জাগে ওল্‌সি হয়তো পাগল হ'য়ে গিয়েছে।

লিসেন্‌ভগ্‌ চোখ বুজে ভাবেন,—"ওল্‌সি আমায় ডেকেছে কেন! কি তার প্রয়োজন আমাকে! ক্লেয়ার কি কোনো গোপন কথা ব'লে পাঠিয়েছে তাকে দিয়ে! কিন্তু ও কেন আমার দিকে অমন ক'রে চাইছে! কেন আমি ওর সঙ্গে এমন পাগলের মত ব'সে আছি! একি সব স্বপ্ন! আমি কি তবে ক্লেয়ারের বাহুবন্ধনে ঘুমিয়ে প'ড়ে স্বপ্ন দেখছি! রাত কি

ফুরোয় নি এখনো!" চোখ খুলে গেল লিসেন্‌ভগের। তাঁর দিকে চেয়ে ওল্‌সি হঠাৎ ব'লে উঠ্‌ল—"প্রতিশোধ নেবেন না আপনি?"

—"প্রতিশোধ!" অবাক হ'য়ে যান জমিদার। "কেন, প্রতিশোধ নেব কিসের জন্য?"

—"কারণ, সে আমায় নষ্ট ক'রে ফেলেছে একেবারে। আমি আর নেই, নিঃশেষ হ'য়ে গেছি।"

—"কিছুই আমি বুঝতে পারছি না। সব কথা বুঝিয়ে বলুন দয়া ক'রে।" অধৈর্য হ'য়ে জমিদার জবাব দেন।

—"ফ্যানী আমার সঙ্গেই ছিল। ভারি সুন্দর মেয়ে, চমৎকার মেয়ে, তাই না?"

—"হ্যাঁ, ফ্যানী সত্যি ভারি ভালো মেয়ে।" লিসেন্‌ভগ্ বলেন।

তারপর অল্প আলোতে ঘরের আসবাবপত্র তাঁর চোখের সামনে ভেসে ওঠে। নীল মখ্‌মলে আগাগোড়া মোড়া সব। জমিদারের মনে হ'লো যেন এক যুগ আগে এই ঘরেই তাঁর সঙ্গে ফ্যানীর মার আলাপ হয়েছিল।

—"কি হ'লো বন্ধু? থামলেন কেন?"

ওল্‌সি আবার বলে—"একদিন সকাল বেলায় ক্লেয়ারের কাছে গিয়ে দেখি, সে তখনও ঘুমিয়ে আছে। একটু বেলা ক'রেই সে আজকাল ওঠে। আমি তখন সেখান থেকে ফিরে, বন-পথের দিকে এগিয়ে চল্‌লাম। হঠাৎ দেখি, পেছন পেছন দৌড়ে আস্‌ছে ফ্যানী। সে চেঁচিয়ে বললে—'আপ্‌নি শীগ্‌গির পালিয়ে যান। পালিয়ে যান এখান থেকে। আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ। আপনি আর এক মুহূর্তও থাকবেন না এখানে। আমি দিব্য চোখে দেখতে পাচ্ছি, একটা বিপদ ঘনিয়ে আসছে। কারা যেন আপনার সমূহ অনিষ্ট ক'রতে আসছে।' আমার আর বুঝতে বাকি

রইলো না, কোন্ বিপদের কথা সে বল্‌তে চাইছে। ফ্যানী কিন্তু মনে মনে স্থির জানতো, আমি ইচ্ছা ক'রলেই সে বিপদ এড়াতে পারি।"

বারান্দার রেলিঙের ওপরকার সেই সবুজ শালটা হঠাৎ জাহাজের পালের মতো ফুলে উঠ্‌লো। টেবিলের বাতিটাও জল্‌তে লাগলো দপ্ দপ্ ক'রে।

লিসেন্‌ভগ্ সাগ্রহে জিজ্ঞাসা ক'রলেন—"ফ্যানী আপনাকে আর কি বলেছিল?"

—"আচ্ছা, আপনার কি মনে পড়ে সেই সন্ধ্যাবেলাকার কথা, যেদিন আপনি ও আমি দু'জনেই ক্লেয়ারের বাড়িতে উপস্থিত ছিলাম? তার ঠিক পরের দিন ক্লেয়ার ফ্যানীকে সঙ্গে করে যুবরাজের সমাধিক্ষেত্রে হাজির হয়। ক্লেয়ার তখন ফ্যানীকে একটা ভয়ঙ্কর গোপন রহস্যের কথা শুনিয়েছিল।"

—"গোপন রহস্য! আমি তো কিছুই বুঝে উঠ্‌তে পারছি না।" কাঁপা গলায় জবাব দিলেন লিসেন্‌ভগ্।

ওল্‌সি বলে—"আপনি বোধ করি একথা জানেন যে, ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়েই এক ঘণ্টার মধ্যে যুবরাজের মৃত্যু হয়?"

—"হাঁ, সে-কথা আমি জানি।"

—"তখন শুধু এক ক্লেয়ারই ছিল যুবরাজের অন্তিমশয্যার পাশে।"

—"হাঁ, সে-কথাও আমার মনে আছে।"

—"শেষ নিশ্বাস ফেল্‌বার ঠিক আগেই যুবরাজ একবার ক্লেয়ারের দিকে তাকিয়েছিলেন। তখন তিনি একটা অভিশাপ দিয়ে যান।"

জমিদার ভীতিবিহ্বল বিস্মিত কণ্ঠে ব'লে ওঠেন—"অভিশাপ!"

—"হাঁ অভিশাপ বৈ কি? যুবরাজ ক্লেয়ারের দিকে তাকিয়ে ব'লেছিলেন—'তোমাকে একটা অভিশাপ দিয়ে যাচ্ছি যাবার আগে।

তুমি আমাকে ভুল্‌তে পারবে না কখনো। ভুলে গেলে কিন্তু আমি স্বর্গে গিয়েও শান্তি পাব না।' তার জবাবে সেদিন ক্লেয়ার বলেছিল—'ভুলব না, তোমাকে কিছুতেই ভুলব না আমি।' যুবরাজ আবার বলেছিলেন—'তাহ'লে শপথ কর।' শপথ ক'রে সেদিন ক্লেয়ার জবাব দিয়েছিল—'ভুলব না, আমি কিছুতেই ভুলব না।' যুবরাজ আবার তার দিকে তাকিয়ে ব'লে ওঠেন—'ক্লেয়ার! প্রিয়তমা আমার! তোমাকে আমি যে প্রাণের চেয়ে ভালোবাসি। এবার তাহ'লে আমি শান্তিতে চির বিদায় নিচ্ছি এই পৃথিবী থেকে।'"

"কে! কে কথা বল্‌ছে?"—পাগলের মত চীৎকার ক'রে ওঠেন জমিদার।

ওল্‌সি জবাব দেয়—"ভয় নেই, আমি। ফ্যানী আমাকে যা যা বলেছিল আমি শুধু তারই পুনরাবৃত্তি করছি। ক্লেয়ার তাকে যা বলেছিল, ফ্যানী আমার কাছে সবই তা খুলে বলেছে। যুবরাজ ক্লেয়ারকে যা বলেছিলেন, ফ্যানী সবই তার কাছ থেকে শুনেছিল। এতক্ষণে সবই আপনি বুঝতে পারছেন, আশা করি?"

মন দিয়ে শুনছিলেন লিসেন্‌ভগ্‌। হঠাৎ যেন তাঁর মনে হ'লো যুবরাজ সেই নিস্তব্ধ রাত্রির নীরবতা ভঙ্গ করে বেরিয়ে আসছেন কবর থেকে। তিনি যেন ব'লছেন—"আমি তোমাকে ভালোবাসি ক্লেয়ার, প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসি তোমাকে। কিন্তু কি ক'রব, আয়ু আমার ফুরিয়ে এসেছে। বেশ টের পাচ্ছি আমি। আমি জানি, আমি যখন আর এ পৃথিবীতে থাকব না, তখন আর এক তরুণ এগিয়ে আসবে তোমার কাছে প্রেমের জয়মাল্য পরাতে। তোমার আলিঙ্গনে সে বাঁধা পড়বে, আনন্দ পাবে অফুরন্ত। কিন্তু কিছুতেই সে আর এ আনন্দকে ধ'রে রাখতে পারবে না। ক্লেয়ার শোনো। তাই তোমাকে আজ

অভিশাপ দিয়ে যাচ্ছি যে, যে তোমার অধর চুম্বন ক'রে আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ ক'রবে, তাকে নরক-যন্ত্রণা ভোগ ক'রতে হবে। এ আমার অভিশাপ। জান তো, মরা-মানুষের অভিশাপে স্বর্গের দেবতারাও সাড়া দেন? ক্লেয়ার, যে আসবে তোমার কাছে, তাকে তুমি জানিয়ে দিয়ো, তাকে উন্মাদ হ'য়ে যেতে হবে, সে ম'রে যাবে ব্যথা ও বেদনায় ক্লিষ্ট হ'য়ে।"

জমিদারের মনে হ'লো, তিনি যেন স্পষ্টই শুনলেন, ওল্‌সির মুখ দিয়ে মৃত যুবরাজই কথা ব'ল্‌ছেন। আবার যেন তাঁর মনে হ'লো সবুজ রঙের সেই শালটা রেলিঙ্‌ থেকে বাগানে গড়িয়ে পড়ল।

ধীরে ধীরে চোখ বুজে এলো জমিদারের। অসাড় হ'য়ে ঝিমিয়ে পড়লেন তিনি। আর কোনো কথাই তাঁর মুখ দিয়ে বেরুল না।

লিসেন্‌ভগে্‌র সেই অবস্থাতেও মনে হ'লো একটি দিনের কথা। সেদিনটি তাঁর কাছে চিরস্মরণীয়। সঙ্গীত শিক্ষকের ঘরে সেইদিন তাঁর প্রথম আলাপ ক্লেয়ারের সঙ্গে। আবার মনে হ'লো রঙ্গমঞ্চের কথা। তিনি যেন দেখতে পেলেন, রঙ্গমঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে আছে একটা সঙ্‌। সে ব'লে চলেছে—"যুবরাজ অভিশাপ দিয়ে বলেছিলেন, যে তাঁর প্রণয়িনীর প্রতি প্রেমাসক্ত হবে, তার মৃত্যু অনিবার্য।" তিনি যেন আবার দেখতে পেলেন, রঙ্গমঞ্চ ফেটে পড়ছে খান্‌ খান্‌ হয়ে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোখ দুটোও যেন সমুদ্রের অতল গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছে। তিনি ডুবে যাচ্ছেন সমুদ্রে। হঠাৎ চেয়ার থেকে তিনি পড়লেন মাটিতে, অসাড় নিস্পন্দ দেহে।

চীৎকার করে ওল্‌সি।—"কে কোথায় আছ, শীগ্‌গির ছুটে এসো।" দুটি চাকর এসে মূর্ছিত জমিদারকে তুলে ধরে, তারপর একটা আরাম-কেদারায় নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দেয়। ডাক্তার ডাকতে ছুটে যায় একজন। আর একজন নিয়ে আসে জল আর ভিনিগার। চোখে মুখে তাঁর জলের ঝাপ্‌টা দিয়ে, ওল্‌সি খানিকটা ভিনিগার নিয়ে কপালে মালিশ ক'রে দেয়।

কিন্তু জমিদারের চেতনা আর ফিরে আসে না। ডাক্তার এসে সব দেখে শুনে বল্‌লেন—"সব শেষ।"

সিঁড়ি বেয়ে ওল্‌সি উঠে গেল ওপরকার ঘরে। তার শোবার ঘর সেটা। তারপর, একখানা চিঠি লিখ্‌ল। চিঠিখানা এইরকম—

"ক্লেয়ার! প্রিয়তমা আমার! মোল্ডে গিয়ে আমি তোমার তার পাই। স্বীকার ক'রতে এখন আর বাধা নেই যে, তোমায় আমি আগে মোটেই বিশ্বাস করতাম না। তখন ভাবতাম, তুমি আমার সঙ্গেও প্রবঞ্চনা করবার চেষ্টায় আছ। কিন্তু, এখন আমাকে তুমি ক্ষমা ক'রো। আর আমি তোমাকে অবিশ্বাস করি না। আমার চিঠি পেয়েই লিসেন্‌ভগ্‌ এখানে এসেছিলেন। অদ্ভুত একটা কাণ্ড করেছিলাম আমি। তাঁকে মৃত যুবরাজের অভিশাপের কথা বল্‌তেই, তিনি যেন কেমন হ'য়ে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার থেকে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে অজ্ঞান হ'য়ে যান। তাঁর জ্ঞান আর ফিরে আসে না। তিনি একটু আগেই মারা গেছেন।"

চিঠি লেখা শেষ না ক'রেই ওল্‌সি যেন নিবিষ্ট মনে কি ভাবতে বস্‌ল। খানিক বাদেই লাফিয়ে উঠ্‌ল সে। ঘরময় আনন্দে ঘুরে বেড়িয়ে গান গাইতে শুরু ক'রে দিল। প্রথমে খাদে, পরে ধীরে ধীরে উঁচু পর্দায় গান গায় সে। তার গান ক্রমশঃ যেন সমুদ্র-গর্জনের মত চতুর্দিক প্রকম্পিত ক'রে তোলে। গান গেয়ে সে আজ চরম আনন্দ পায়। প্রশান্ত একটা হাসি ফুটে ওঠে তার ঠোঁটের কোণে। আবার সে চিঠি লিখতে বসে। এইভাবে সে লেখা শেষ করে—

"ক্লেয়ার! ক্ষমা কর আমাকে। আমার আগেকার অবিশ্বাস তুমি ভুলে যাও। আনন্দে আজ আমার মন ভ'রে উঠেছে। আর তুমি ভেব না। আমি আসছি। তিনদিনের মধ্যেই আমি তোমার প্রেমের মন্দিরে হাজির হব, বিরহিনী প্রিয়া আমার!"

লড্‌উইগ টীক্—

অপদেবতা

বাপ বল্‌লেন—"মেরী গেল কোথায়? অতটুকুন মেয়ে, গেল কোথায়?"

জবাব দিলেন মা—"পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে ওদিক্‌কার মাঠটায় খেল্‌ছে।"

—"ছুটোছুটি ক'রতে গিয়ে আবার এদিক্-ওদিক না চ'লে যায়। যা ছেলেমানুষ সব! অত বুদ্ধিশুদ্ধি তো আর হয়নি এখনো!" বাপ ব'লে ওঠেন।

মা গিয়ে পাড়ার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মেরীকে ডেকে আনেন। বিকেলবেলাকার খাবার খেতে দেন তাদের।

ওদের মধ্যে বড় ছেলেটি বলে—"বেশ গরম গরম আছে দেখ্‌ছি। মেরী! তুই তো বহুদিন থেকেই লাল চেরীর কথা ব'ল্‌ছিলি। আজ জুটে গেল। নে, খা।"

মা বললেন—"লক্ষ্মী ছেলেমেয়েরা! দুষ্টুমি ক'রো না কেউ। আমি আর উনি এখন মাঠে যাচ্ছি। বাড়ি থেকে কেউ এখন দূরে যেও না কিন্তু। আর ঐ বনে যেও না খবরদার!"

ছোট্ট এ্যানড্রেস্ বল্‌লে—"কিছু ভাববেন না আপনি! ঐ বন আমাদের যা ভয় দেখায় বাপু, কে যাচ্ছে ওখানে? বাড়ির কাছেই তো কত লোকজন আসা-যাওয়া ক'রছে। আমরা এখানেই ব'সে থাকব, এক পা-ও নড়ছি না।"

মা ভিতরে চ'লে গেলেন। একটু পরেই আবার স্বামীর সঙ্গে বেরিয়ে এলেন বাইরে। দরজায় তালা লাগিয়ে মাঠের দিকে গেলেন তাঁরা। সেখানে মজুরেরা কি রকম কাজ করছে, খড়ের গাদা কি রকম তোলা হয়েছে, তাই দেখাই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। একটু উঁচু সবুজ টিলার ওপরে তাঁদের বাড়িটি। তার চার ধারে কি সুন্দর বাগান। বাগানের মধ্যে কত ফুল ও ফলের গাছ। বাগানের বাইরে সবুজ কাঁটা গাছের বেড়া। নিচের দিকে তাকালে ছোট ছোট গ্রামগুলি চোখে পড়ে। আর একটু দূরে ও-পাশটায় চোখ পড়লে দেখা যায় কাউণ্টের প্রাসাদ। এই কাউণ্টের কাছ থেকেই একদিন মার্টিন জমিজমা পত্তন নেয়। তারপর হয় ক্ষেতখামার-এর মালিক। এখন সে সুখেস্বচ্ছন্দেই স্ত্রী আর সবেধন মেয়েটিকে নিয়ে সেখানে বসবাস ক'রছে। প্রত্যেক বছরই সে কিছু না কিছু টাকা জমিয়েছে; মনে মনে তার আশা ছিল, নিজের পরিশ্রমের গুণেই একদিন সে বড়লোক হয়ে উঠ্‌বে।

জমিতে ফসল ফলেও খুব; আর, কাউণ্ট-ও তার প্রতি বেশ সদয়। এ দুটোই সে তার উন্নতির পথে সুলক্ষণ ব'লে মনে করেছিল।

স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে মাঠের দিকে যাবার সময় চারধারে তাকিয়ে সে বেশ উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। তারপর বলে—"আচ্ছা ব্রিগিট্টা, আমরা আগে যেখানে থাকতাম, তার চেয়ে এ জায়গাটা, এ বাড়িটা কত সুন্দর, না? এখানকার মাঠগুলো কি সবুজ। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া ফলের গাছগুলি কেমন সারা গ্রামখানিকে ঘিরে রয়েছে বলতো! মাঠে মাঠে কি সুন্দর লতানো গাছ, কি সুন্দর ফুল। গোটা বাড়িই কি পরিষ্কার, ঝক্‌ঝকে। খুশির আমেজ লেগে রয়েছে সারাক্ষণ। বাড়ির লোকজনেরও যেন কোনো ভাব্‌না নেই, চিন্তা নেই, পরম নিশ্চিন্ত মনেই রয়েছে তারা। হাঁ, আরও একটা কথা। এখানকার ঐ বনভূমি কিন্তু অন্য জায়গার চেয়েও বেশি তাজা, বেশি

সবুজ। এখানের আকাশও যেন গাঢ় নীল। যে দিকে তাকাও না কেন, সেদিকেই সৌন্দর্য। প্রাণমন আপনা থেকেই যেন আনন্দে ভ'রে ওঠে।"

ব্রিগিট্টা জবাব দেয়—"আর তুমি যখন ঐ ছোট নদীটির ওপর দিয়ে যাবে, তখন তোমার মনে হবে যেন আর এক রাজ্যে গিয়ে পড়েছ। কোথায় সেই প্রফুল্লতা, কোথায় সেই আনন্দ। চতুর্দিক সেখানে যেন বিষাদ-মলিন, ঝ'রে গিয়েছে সব, রুক্ষতায় ভ'রে উঠেছে যা-কিছু। অথচ, মজা এই, যারা আমাদের গাঁয়ে আসবে বেড়াতে, তারাই লোকের কাছে ব'লে বেড়াবে, যে, ধারে-কাছে 'এমন গ্রামটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি'!"

স্বামী ব'লে ওঠে—"আচ্ছা ওসব কথা না হয় ছেড়েই দাও! কিন্তু ঐ দেবদারুগাছের পেছনদিকটা তাকিয়ে দেখতো একবার। এই চমৎকার দৃশ্যের মধ্যে এই সুন্দর পরিবেশের মাঝখানে ও জায়গাটা যেন একটা ব্যতিক্রম। কি অন্ধকার, আর কি নির্জন বল তো! ঐ ধূসর দেবদারু গাছ, তার পেছনকার কুঁড়ে ঘরগুলি থেকে অনবরত বের হচ্ছে ধোঁয়ার কুণ্ডলী। পুরোনো দিনের ধ্বংসপ্রাপ্ত কতগুলি আস্তাবলও রয়েছে সেখানে। পাশ দিয়ে নীরবে মন্থরগতিতে ব'য়ে চলেছে সরু একটা জলধারা।"

"হাঁ সত্যি তাই।"—জবাব দেয় ব্রিগিট্টা—"তুমি যদি ওর কাছে এগিয়ে যাও, তাহ'লে তোমার মন ভারী হয়ে উঠবে, কেমন যেন অস্বস্তি বোধ ক'রবে তুমি। অথচ, তার কারণ কি, বুঝতে পারবে না তা। ওখানে কারা বাস করে? ওরা কেমন ধারা লোক যে, আর সবাইকে ছেড়ে, আমাদের বাদ দিয়ে ওখানে দিব্যি নিজেদের ঘরকন্না করছে? এ-সব দেখলে মনে হয়, ওরা বোধ হয় মানুষ নয়! যত অপদেবতার বাস ওখানে!"

তরুণ কৃষকটি ব'লে ওঠে—"পাগ্‌লামি তোমার, অপদেবতা হ'তে যাবে কেন? আমার যতদূর ধারণা, ওরা হচ্ছে বেদের দল। অন্য জায়গায় চুরি-ডাকাতি ক'রে ওখানে তাদের চোরাইমাল সব লুকিয়ে রাখে। কিন্তু ভেবে অবাক হই, জমিদারের এত অনিষ্ট ওরা ক'রছে অথচ তিনি একেবারে নির্বিকার!"

"কে জানে!" সমবেদনার সুরে জবাব দেয় ব্রিগিট্টা। "কিন্তু ধরো, এও তো হ'তে পারে যে ওরা খুব গরীব। দারিদ্র্যের লজ্জায় বাইরে বেরুবার সাহস ওদের নেই। যাই বলো না কেন, ওদের কিন্তু কেউ নিন্দে করে না। কথা হচ্ছে, ওরা কেউ গীর্জ্জায় আসে না উপাসনা করতে, আর কেউ খবরও রাখে না ওরা কি ক'রে ওখানে বসবাস ক'রছে, কি খেয়েই বা ওদের দিন চল্‌ছে। ঐ তো সামনেকার মাঠ। তাও পড়ো জমি, প'ড়ে আছে আজ বহুকাল ধ'রে। আর অন্য জমিও ওদের নেই নিশ্চয়!"

যেতে যেতে মার্টিন বলে—"ভগবান জানেন! তারা কি ব্যবসা করে। কোনো মানুষই যায় না ওদের কাছে। লোকে অবশ্যি বলে ওটা ভূতের আড্ডা। যত সব অপদেবতার বাস ওখানে। তার ফলে, জোয়ান জোয়ান লোকগুলোও আর সাহস ক'রে ওদিকে পা মাড়ায় না। আশ্চর্য!"

মাঠের পথে চল্‌তে চল্‌তে তারা এই বিষয়েই কত কথা ব'লে যায়। তারা যে জায়গাটার কথা বল্‌ছিল, সেটা গাঁয়ের ধারেই। খুব বেশি দূরে নয়। আপনি যদি তাকিয়ে দেখেন, তাহ'লেই দেখতে পাবেন ক্ষুদ্র একটা উপত্যকা। তার মধ্যে দেবদারু গাছে ঘেরা একটি কুঁড়েঘর। তার সঙ্গেই ধ্বংসপ্রাপ্ত কতগুলি অফিস-বাড়ি। কোনদিনই এসব বাড়ি থেকে ধোঁয়া বেরুতে কেউ দেখেনি। কোনো লোককেও এর আশেপাশে দেখা যায়নি কোনদিন। কিন্তু সাহস ক'রে যারা একটু কৌতূহলী হ'য়ে এগিয়ে

গেছে, তারাই দেখেছে ঐ কুঁড়েঘরের সামনের বেঞ্চে কতগুলি কদাকার মেয়েছেলে ব'সে আছে। পরনে তাদের নোংরা ছেঁড়া কাপড়-চোপড়। কোলে তাদের আরও কদাকার কতগুলি ছেলেপুলে। নোংরার একশেষ! বোঁট্‌কা গন্ধ বেরুচ্ছে গা থেকে, কতগুলি কালো কুকুর তাদের আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

একদিন সন্ধ্যায় নাকি দেখা গেল যে দৈত্যের মত একটা বিরাট পুরুষ ঐ মজা নদীটার সাঁকো পার হয়ে এসে কুঁড়েঘরের মধ্যে প্রবেশ করলে। অন্ধকারের মধ্যে আবার দেখা গেল, কতগুলি ছায়ামূর্তি। খোলা জায়গায় আগুনের চারপাশে তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। কতরকমের যে তাদের আকার তার ঠিক নেই। এখানকার এই কালো দেবদারুর গাছে ঘেরা এই ধ্বংসপ্রায় পোড়োবাড়িগুলির সঙ্গে, পাশের গাঁয়ের ঐ সবুজ মাঠ, ঐ ধব্‌ধবে সাদা বাড়ি, ঐ নতুন প্রাসাদের কি অদ্ভুত পার্থক্য!

এদিকে বাড়ির সেই ছোট ছোট ছেলেমেয়ে দুটি ততক্ষণ তাদের ফল খাওয়া শেষ ক'রে ফেলেছে। তখন তাদের মনে হ'লো এবার একটু মাঠে ছুটোছুটি করা যাক্। এ্যানড্রেস মেরীর সঙ্গে পেরে ওঠে না। মেরী আগেই ছুট্ দেয়। এ্যানড্রেস তখন বেগতিক দেখে চেঁচিয়ে ওঠে—"এটা কিন্তু ঠিক হচ্ছেনা। এসো একসঙ্গে দৌড়ই। দেখা যাবে, কে জেতে কে হারে।"

মেরী বল্‌লে—"বেশ। তাই হোক্। কিন্তু ঐ নদীর দিকে আমরা যাব না মোটেই।"

এ্যানড্রেস জবাব দেয়—"না না ওদিকে যাব না। তার চেয়ে চল যাই ঐ পাহাড়টার দিকে, ঐ বড় ন্যাসপাতি গাছটার কাছে। কতদূর আর হবে! সিকি মাইলও হবে না বোধ হয়! আমি বাঁ পাশ দিয়ে ঐ দেবদারু

গাছে ঘেরা মাঠ পার হয়ে দৌড়ব। তুমি কিন্তু ডান দিক দিয়ে মাঠ ঘুরে যেতে পারবে না। কাজেই পাহাড়ে উঠে দেখা যাবে, কে বেশি দৌড়তে পারে।"

মেরী বল্লে—"বেশ। চলো।" এই ব'লেই সে ছুটলো।

এ্যানড্রেস্ তার আগেই দৌড় দিয়েছে!

মেরী ডান দিকে তাকিয়ে দেখল, এ্যানড্রেসকে আর দেখা যাচ্ছে না। নিজের মনেই সে তখন বল্লে—"এতো ভারি মজা হ'লো···বেশ আমি তাহ'লে ঐ সাঁকোর পাশ দিয়ে, কুঁড়েঘর পেরিয়ে মাঠ দিয়ে ছুটি, তাহ'লে আমিই আগে গিয়ে পৌঁছুতে পারব।" ইতিমধ্যেই সে সেই মজানদীর ধারে এসে গেছে। তার পাশেই মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে দেবদারু গাছগুলি। "দৌড়ব? না, ভারি ভয় ক'রছে!" আপন মনেই মেরী তখন ব'লে ওঠে।

একটা সাদা কুকুর একটু দূরেই দাঁড়িয়েছিল।

অনবরত সে ঘেউ ঘেউ ক'রে ডাকছে।

ভয় পেয়ে মেরী তখন কয়েক পা পিছিয়ে গেছে। ভাবছে, এটা তো কুকুর নয়, যেন দৈত্যি! পরক্ষণেই তার মনে হ'লো—"দূর ছাই! কি ভাবছি। আমি এদিকে ভেবে মরছি, ওদিকে বোকারাম এতক্ষণ অর্ধেক পথ চলে গিয়েছে!"

সাদা কুকুরটা তখনো ডেকে চলেছে। মেরী তাকে আড়চোখে একবার দেখে নেয়। না দেখতে ভয়ঙ্কর নয়, বরং বেশ সুন্দরই। গলায় কেমন একটা লাল বগ্‌লশ, তার সঙ্গে ঝুলছে একটা চক্‌চকে ঘন্টি। মুখ তুলে যেই ও ডাকতে শুরু করে, গলার ঘন্টিটাও তেমনি বেজে ওঠে টুংটাং শব্দ ক'রে।

মেরী আপন মনেই চীৎকার ক'রে ওঠে—"না। আর দাঁড়িয়ে থাকলে

চল্‌বে না। ভয় ক'রলেও চল্‌বে না। এক্ষুনি আমাকে দৌড়োতে হবে।" এই ব'লেই মেরী তখন সেই মজানদীর সাঁকোর ওপর দিয়ে প্রাণপণে ছুটল। কুকুরটির ডাক তখন থেমে গেছে। মেরীর দিকে তাকিয়ে সে লেজ নাড়ছে। একটু পরেই মেরী নদীর ওপারে গিয়ে দেখে যে সে দেবদারু-ঘেরা সেই পরিত্যক্ত জায়গায় পড়ে আছে। সেখান থেকে তাদের বাড়িঘর আর দেখা যায় না। সমস্ত গ্রামটাই যেন অদৃশ্য হ'য়ে যায়।

মেরী অবাক হ'য়ে যায় এই নতুন জায়গায় এসে।

সে দেখতে পায়, কি সুন্দর সুন্দর ফুলের বাগান তার চারপাশে। কত রঙ্-বেরঙের ফুল-ই না ফুটেছে সেখানে। করবী, গোলাপ পদ্মের যেন ছড়াছড়ি। কি চমৎকার তাদের রঙ্। নীল আর সোনালী-রঙ্ মেশানো প্রজাপতিগুলো উড়ে বেড়াচ্ছে ফুলে ফুলে। গাছের ডালে ডালে চক্‌চকে তারের খাঁচা। তার মধ্যে কত রঙ্-বেরঙের পাখী। কি সুন্দর গান গাইছে তারা। আর ঐ তো কত ছেলেমেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কি সুন্দর সোনালী চুল তাদের, আর কি উজ্জ্বল চোখ! পরনে তাদের ছোট ছোট সাদা ফ্রক। তাদের কেউ ছাগলছানা নিয়ে খেলা করছে, কেউ বা খাওয়াচ্ছে পাখীদের, কেউ বা ফুল তুলে নিজেদের মধ্যেই বিলিয়ে দিচ্ছে। কেউ বা আবার চেরী, আঙুর, আর পাকা পাকা জরদ-আলু খাওয়াইতেই ব্যস্ত।

এখানে কোনো কুঁড়েঘর নেই। তার বদলে প্রকাণ্ড সুন্দর একটা বাড়ী। বড় বড় দরজা, উঁচু উঁচু পাথরের মূর্তি সব দেখা যাচ্ছে। এ সব দেখে শুনে মেরীর তো বিস্ময়ের অন্ত নেই। কি করবে এখন সে আর ভেবে পায় না। তাই ব'লে মেরী পেছিয়ে যাবার মেয়ে-ও নয়। সবার আগে সে এগিয়ে গেল ছেলেমেয়েদের কাছে। তাদের দিকে হাত-খানা এগিয়ে দিল সে। ভাবখানা এই যে, ভাব ক'রতে চায় তাদের সঙ্গে।

তাদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর ছেলেটি বলে উঠলো—"শেষ পর্যন্ত তুমি তাহ'লে আমাদের সঙ্গে দেখা ক'রতে এলে? নদীটার ওপারে তোমাকে আমি দৌড়োতে দেখি, খেল্‌তে দেখি। কিন্তু এদিকে আস না কখনো! তুমি বুঝি আমাদের ছোট্ট কুকুরটাকে দেখে ভয় পাও, না?"

মেরী তখন জবাব দেয়—"ও হরি! তোমরা দেখছি তাহলে বেদে বা গুণ্ডাদের ছেলে নও! এ্যানড্রেস কিন্তু সব সময়ই ওই কথা বলে। বলে, তোমরা যত বেদে, তোমরা যত গুণ্ডা! ওটা একটা আস্ত হাঁদারাম! যা জানে না, তাই নিয়ে ও ফট্‌ফট্‌ ক'রবেই!"

ওদের দলের একটি ছোট্ট মেয়ে বল্‌লে—"আমাদের সঙ্গে তুমি থাক না ভাই! তোমার খু—ব ভালো লাগবে।"

"কিন্তু আমরা যে রেস্‌ দিচ্ছি!"

"সঙ্গীকে শীগ্‌গিরই তুমি পাবে। নাও, এসো! ফল খাও।"

ফল নিয়ে মেরী মুখে দেয়। বাঃ ভারি মিষ্টি তো! জীবনে এমন সুন্দর ফল মেরী খায়নি কখনো। এর পরেই কিন্তু মেরী ভুলে যায় এ্যানড্রেসের কথা, ভুলে যায় তাদের দৌড়ের প্রতিযোগিতা, ভুলে যায় বাপ-মা'র নিষেধ। কিছু আর মনে থাকে না তার।

এমন সময় জম্‌কালো পোশাকে একটি মহিলা এসে উপস্থিত সেইখানে। তিনি বল্‌লেন—"এ আবার কে! কোথাকার মেয়ে? এখানে কেন?"

মেরী বল্‌লে—"আমি মেরী। ছুট্‌তে ছুট্‌তে এখানে হঠাৎ এসে পড়েছি। এখন কিন্তু ওরা আমাকে ছাড়তে চাচ্ছে না।"

মহিলাটি বল্‌লেন—"জেরিনা! তুমি তো জান, ও এখানে বেশিক্ষণ থাকতে পারবে না। তাছাড়া আমার কাছ থেকে তোমাদের অনুমতি নেওয়া উচিত ছিল।"

জেরিনা—"হ্যাঁ আমি তা জানি। ভেবেও ছিলাম তা। যখন ঐ

পুল পার হ'য়ে আসছিল, আমি তখনই ভেবেছিলাম যে, আপনাকে বলব। আমরা প্রায়ই ওকে ঐ মাঠে খেলতে দেখি। আপনিও কিন্তু ওর ঐ হাসিখুশি ভাবটি ভারি পছন্দ করেন! অথচ, ও আমাদের শীগ্‌গিরই ছেড়ে চ'লে—যাবে।"

"না, আমি যাব না। এখানেই থাকব।" জবাব দেয় মেরী। "কি সুন্দর এই জায়গাটা। এখানে কি সুন্দর সুন্দর খেলবার জিনিস। কি মিষ্টি মিষ্টি ফল। কি সুন্দর ঐ চেরীগুলো! আমাদের ওদিকটায় এসব কিন্তু নেই।"

সেই সোনালী-পোশাক-পরা মহিলাটি একটু মৃদু হেসে চলে গেলেন। ছেলে-মেয়েরা এইবার এলো হাত ধরাধরি ক'রে। মেরীকে ঘিরে দাঁড়ালো তারা। উল্লাসে আর কলরবে মেতে উঠলো সব। মেরীকে হাত ধরে নাচালো কেউ; কেউ তাকে এনে দিলো ভেড়ার বাচ্চা; কেউ বা আনলো মজার মজার খেল্‌না; আবার কেউ কেউ সেতার, বেহালা বাজিয়ে গান শুরু ক'রে দিলো।

মেরী কিন্তু প্রথম-দেখা সেই জেরিনা মেয়েটির সঙ্গেই থাকে। এর আর একটা কারণও ছিল। জেরিনাই হ'লো ওদের মধ্যে সব চেয়ে দেখতে সুন্দর আর সব চেয়ে ভালো মন তার।

মেরী চীৎকার ক'রে ব'লে ওঠে—"তোমাদের কাছেই আমি থাকব, চিরদিন থাকব। তোমরা সব আমার ভাই-বোন হবে।"

মেরীর এই কথা শুনে ছেলেমেয়েরা হেসে ওঠে খিল্‌ খিল্‌ করে, জড়িয়ে ধরে মেরীকে আনন্দের আবেগে।

জেরিনা বলে—"দাঁড়াও এবার রাজবাড়ি থেকে খেল্‌না নিয়ে আস্‌ছি।" এই ব'লেই সে দৌড়ে যায় প্রাসাদের দিকে। একটু পরেই ছোট্ট একটা সোনার বাক্স হাতে ক'রে ফিরে আসে। তার মধ্যে ছিলো কতগুলি বীজ, চক্‌চকে বালুর মতো দেখতে। জেরিনা কতগুলি বীজ তুলে নেয় তার

হাতে, তারপর ছড়িয়ে দেয় সেই সবুজ মাঠে। সঙ্গে সঙ্গে সাগরের বুকে ঢেউয়ের মতো ঘাসগুলি দুলতে থাকে। একটু পরেই সেখানে দেখা দেয় কতগুলি গোলাপ গাছের ঝাড়; এক সঙ্গে কুঁড়ি থেকে প্রস্ফুটিত হয় সুন্দর সুন্দর গোলাপ; সুগন্ধ বিলিয়ে দেয় চতুর্দিকে।

মেরীও সেই সোনার বাক্স থেকে কতগুলি বীজ নিয়ে ছড়িয়ে দেয়। তার ফলে সেখানে ফুটে ওঠে কত শ্বেত পদ্ম আর রঙ্-বেরঙের সুগন্ধি ফুল। জেরিনার একটা ইঙ্গিতে কিন্তু সেই ফুলগুলি হঠাৎ কোথায় মিলিয়ে যায়। তার জায়গায় গজিয়ে ওঠে অন্য ফুলের গাছ।

"এবার দেখ আরও বড় কিছু।" জেরিনা ব'লে ওঠে।

তারপরেই সে দুটো পাইন্-বীজ মাটিতে রেখে পা দিয়ে খুব জোরে মাড়াতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে সেখানে বড় দুটো সবুজ ঝোপ ওঠে গজিয়ে। জেরিনা বলে—"আমাকে খুব জোরে চেপে ধর।" মেরীও সঙ্গে সঙ্গে তাকে জাপ্‌টে ধরে তার ছোট্ট ছোট্ট হাত দুটি দিয়ে। তৎক্ষণাৎ তার মনে হ'লো সে যেন ক্রমশঃই ওপরের দিকে উঠছে। তাকিয়ে দেখে সেই গাছ দুটি তীব্র বেগে তাদের ঠেলে ওপরের দিকে নিয়ে চলেছে। সে আর জেরিনা পরস্পরকে জড়িয়ে ধ'রে আছে শক্ত ক'রে। শূন্যে দুলছে তারা। পায়ের নীচ দিয়ে ভেসে চলেছে মেঘের দল। সূর্যের রাঙা আলোয় তাদের রঙও হয়েছে লাল। বাকী ছেলেমেয়েরা সব গাছের ডালে ডালে ঝুল্‌ছে, দোল খাচ্ছে, হাসছে, গান গাইছে। কেউ কেউ আবার গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে মাটিতে, চ'লে যাচ্ছে হাল্‌কা হাওয়ায় ডিগবাজী খেতে খেতে। মেরী কিন্তু এতক্ষণে বেশ ভয় পেয়েছে। তাই দেখে জেরিনা হঠাৎ জোর গলায় কি একটা সুর তোলে তার কণ্ঠে। সঙ্গে সঙ্গে গাছ দুটি আবার মাটিতে নেমে যায়, তারাও নেমে পড়ে লাফিয়ে। মেঘলোক থেকে তারা এবার মর্ত্যলোকে নেমে এলো।

এরপরে তারা রাজবাড়ির ফটকের ভেতর দিয়ে চ'লে যায় ভিতরে। ফটকের দরজা দুটো পেতলের। সেখানে গিয়ে তারা দেখে কত সুন্দর সুন্দর স্ত্রীলোক, তাদের মধ্যে অনেকেরই বেশ বয়স হয়েছে। কেউ বা আবার তরুণী। তারা সবাই গোল হলঘরটায় ব'সে কি সুন্দর সুন্দর মিষ্টি ফল খাচ্ছে আর বাজনা শুনছে। বাজনাটা যে কোথায় হচ্ছে তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। হল্ঘরের ছাদে কি সুন্দর সুন্দর সব ছবি রয়েছে আঁকা। কত গাছ, কত ফুল, কুঞ্জবনের ছবি। তাদের মধ্য থেকে ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়েদের মুখও দিচ্ছে উঁকি। কি সুন্দর ভঙ্গী তাদের। কিন্তু কি আশ্চর্য, সেই অদ্ভুত বাজনার সুরে সুরে ছাদের এই ছবিগুলোও বদ্লে যাচ্ছে একে একে। তার জায়গায় দেখা যাচ্ছে কত রকমের উজ্জ্বল রঙ্। নীল আর সবুজ রঙ জ্বলে উঠলো প্রখর দীপালোকের মতো। পরক্ষণেই সে রঙ মিলিয়ে যেতে দেখা দিলো উজ্জ্বল বেগুনী রঙ। একটু পরেই দেখা গেল ছাদে আঁকা সেই নগ্ন ছেলেমেয়েগুলি যেন জীবন্ত হ'য়ে উঠেছে ফুলগাছের মধ্যে, ফুলের মালার ভিতরে। তারা যেন নিশ্বাস ফেল্ছে মনে হ'লো! তাদের টুকটুকে লাল ঠোঁটগুলিও যেন নড়ে উঠলো। সেই সঙ্গে তাদের দাঁতগুলিও পড়লো ওদের নজরে। আর তাদের নীল চোখও যেন জ্বলে উঠলো, তাদের চোখের সামনে।

এই হলঘর থেকে একটা পেতলের সিঁড়ি নেমে গিয়েছে নিচে একটা কক্ষে। এখানে রাশি রাশি সোনা-রূপো ছড়িয়ে রয়েছে চতুর্দিকে। তাদের মধ্যে থেকে কত মণিমুক্তা চুনী-পান্না ঝক্মক্ করছে। দেওয়ালে ঠেস্ দেওয়ানো রয়েছে কত অদ্ভুত অদ্ভুত কলসী আর কুঁজো। মনে হলো সবগুলিই যেন দামী দামী জিনিসে ভর্তি। নানা আকারের, নানা রকমের সোনার জিনিস ছড়িয়ে আছে সমস্ত ঘরে। তাদের লাল আভায় সমস্ত ঘরখানি যেন উজ্জ্বলতর হ'য়ে উঠেছে। কতগুলি বামন সেই সোনার

জিনিসগুলি বাছাই ক'রতে গলদ্‌ঘর্ম হ'য়ে উঠেছে। বাছাই ক'রে ক'রে তারা সেগুলি রাখছে কল্‌সীতে বোঝাই ক'রে। আরও অনেক লোক কাজ করছে সেই ঘরে। তাদের কারো পিঠ কুঁজো, কেউ বা আবার খোঁড়া, লম্বা লম্বা লাল নাকওয়ালা সব। পিঠে তাদের বস্তা। উঁচু হয়ে চলেছে তারা। বস্তা খুলে সোনার গুঁড়ো ঢেলে রাখে একখানে। তারপর কিছুক্ষণ ধ'রে তারা অদ্ভুত ভাবে কতগুলি সোনার তাল নিয়ে লোফালুফি করে আর ডিগবাজী খায়, গড়িয়ে পড়ে এ ওর ঘাড়ে। এসব অদ্ভুত, বিদ্‌ঘুটে যত কাণ্ডকারখানা দেখে মেরী তো আর হেসে বাঁচে না। কিন্তু ওরা যায় রেগে। পেছন দিকে কে একটা লোক রয়েছে বসে। এ লোকটাও ছোট্ট এতটুকু। কিন্তু তার বয়স আছে। বার্ধক্যের ভারে নুয়ে পড়েছে সে। দেহের চামড়াগুলোও সব গিয়েছে কুঁকড়ে। লোকটাকে দেখে কিন্তু জেরিনা শ্রদ্ধাভরে অভিবাদন জানায়। সে-ও মাথা নেড়ে তাকে আশীর্বাদ করে। তার হাতে একটা রাজদণ্ড, মাথায় রাজমুকুট ; সেটা ঝুলে পড়েছে একেবারে চোখের ওপর। ঘরের সমস্ত বামনই তাকে তাদের প্রভু হিসাবে শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রে যাচ্ছে একে একে।

জেরিনা ও মেরী তাঁর কাছে গিয়ে হাজির হ'তে, সেই রাজা তখন কর্কশ কণ্ঠে ব'লে ওঠেন—"তোমাদের আবার কি চাই ?" মেরী তো ভয়ে সারা। গলা দিয়ে স্বর বেরোয় না। কিন্তু তার সঙ্গী তখন উত্তর দেয়—"আমরা শুধু দেখতে এসেছি।"

বামন-রাজা বলেন—"বুঝেছি, এ সেই বুড়োখোকার কারসাজি !" এই ব'লেই তিনি মুখ ঘুরিয়ে তাঁর ভৃত্যদের আগের মত কাজ চালাতে হুকুম দেন। কাউকে তিনি বাইরে পাঠান, কাউকে আবার ধম্‌কে ওঠেন।

মেরী বলে—"কে সেই বুড়ো-খোকা ?"

ঘরের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে জেরিনা জবাব দেয়—"আমাদের ধাতু-রাজপুত্তুর !"

এরপরে তারা আবার মুক্ত আলো-বাতাসে এসে দাঁড়ায়। একটা হ্রদের ধারে গিয়ে হাজির হয় মেরী আর জেরিনা। তারা দেখে আকাশে কিন্তু সূর্য নেই। মাথার উপরে আকাশই নেই তো সূর্য থাকবে কোত্থেকে ? একটা নৌকা এসে থামে তাদের সামনে। দু'জনে উঠে পড়ে তাতে। দ্রুতবেগে ছুটে চলে নৌকাটি। হ্রদের মাঝখানে তারা গিয়ে দেখতে পায় সেখান থেকে কত ছোট নদী-নালা, খাল-বিল বেরিয়ে গেছে কত দিকে।

জেরিনা বলে—"ডানদিকটার ঐ নদীটা তোমাদের বাগানের নিচ দিয়ে চ'লে গিয়েছে। সেইজন্যেই তোমাদের বাগান অত সুন্দর। বুঝলে তো ? বাঁদিককার ঐ ছোট নদীটা কিন্তু বড় একটা নদীর স্রোতের সঙ্গে গিয়ে মিশেছে।" হঠাৎ সেই হ্রদের চতুর্দিক থেকে একসঙ্গে কতগুলি ছেলেমেয়ে সাঁতরে আসতে লাগলো। তাদের কারুর কারুর গলায় পদ্মফুলের মালা, কারুর হাতে শাপলা, কারুর হাতে জলশঙ্খ। অন্ধকার তীর থেকে আরও কল-কোলাহল ভেসে এল একসঙ্গে। সে যেন হাসিখুশির স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সুন্দরী রমণীরাও সাঁতার দিয়ে আসছেন। তাদের কারো পিঠে, কারো কাঁধে, কারো গলায় ঝুলছে ছোট্ট শিশুর দল। চুমু খেয়ে জড়িয়ে ধরেছে তাদের গলা। কি অফুরন্ত আনন্দ তাদের। সবাই এখন আগন্তুকদের অভিবাদন ক'রে চ'লে যায় এদিক ওদিক। নৌকা তখন তীরে গিয়ে লাগে। তীরে উঠেই জেরিনা খাড়া উঁচু পাড়ের গায়ে ধাক্কা দেয় হাত দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে দরজার মতো সেটা ফাঁক হ'য়ে যায়। একটি স্ত্রীলোক এগিয়ে আসে, হাত ধ'রে তাদের নিয়ে চলে ভিতরে।

জেরিনা বলে—"তোমরা সকলেই এখানে কাজ করছ তো ?"

স্ত্রীলোকটি জবাব দেয়—"হাঁ, সকলেই কাজে ব্যস্ত। সকলেই এখানে হেসে খেলে আনন্দে আছে। এখানকার আবহাওয়া সত্যি বড় চমৎকার।"

তারপর তারা একটা ঘোরানো-সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে যায়। মেরী দেখতে পায় তার সামনেই একটা হল-ঘর। আলোয় আলোয় সেটা এত উজ্জ্বল হ'য়ে আছে যে, চোখ ঝল্‌সে যায়! দেওয়ালে দেওয়ালে ঝোলানো রয়েছে কাজ করা কত পরদা। অগ্নিশিখার মতো তাদের রঙ্। চার পাশে বেশ একটা বেগুনী রঙের জ্যোতিও বিচ্ছুরিত হচ্ছে। অত আলোয় মেরীর চোখে প্রথমটা ধাঁধা লাগে। সে-ভাবটা কেটে যেতে সে দেখতে পায় তার চোখের সামনে সেই পরদাগুলিতে সূঁচের কাজ করা মানুষগুলি সব যেন আনন্দে নৃত্য ক'রে বেড়াচ্ছে। এ কি অদ্ভুত কাণ্ড! ঐ মূর্তিগুলি একদিকে যেমন সুন্দর, অন্যদিকে তেমনি মাপ মত। দেখতে তাই ভারি ভালো লাগছিল মেরীর। পরদার ঐ মূর্তিগুলি যেন লাল স্ফটিক দিয়ে তৈরী। দেখে তাই মনে হচ্ছিল তাদের দেহের রক্তও যেন চলাচল করছে। মেরীকে দেখে তারা যেন একটু মৃদু হাসলো, তারপর নানাভাবে অভিনন্দন জানালো তাকে। এমনি সময় মেরী এগিয়ে যাচ্ছিল সেই পরদার দিকে। হঠাৎ জেরিনা তার পোশাক চেপে ধ'রে চীৎকার ক'রে ব'লে উঠ্‌লো—"যেও না মেরী, যেও না। তুমি তাহ'লে পুড়ে মরবে। ওগুলো সব আগুন দিয়ে তৈরী।"

মেরীও টের পেল আগুনের তাপ। জেরিনার দিকে তাকিয়ে সে ব'লে উঠ্‌লো—"ঐ সুন্দর মানুষগুলি কেন ওখান থেকে নেমে এসে আমাদের সঙ্গে খেলা করছে না বল তো?"

জেরিনা জবাব দিলো—"আমরা বাস করছি বাতাসে, আর ওরা রয়েছে আগুনে। কি ক'রে ওরা আমাদের সঙ্গে খেলা করবে বলো?

ওরা যদি আগুন থেকে বেরিয়ে আসে, তাহ'লে এই বাতাসের স্পর্শ লেগেই ওরা মূর্ছিত হ'য়ে পড়বে। দেখ, ওখানে ওরা কি খুশি,—কেমন আনন্দে ওরা হাসছে, কলরব করছে। ঐ যারা নিচের দিকে রয়েছে ওরাই পৃথিবীতে উত্তাপ-বন্যার সৃষ্টি করে। মাটির নিচে ঐ আগুনের স্রোত বয়ে যায় ব'লেই তো ফুল ফোটে, ফল পাকে। ঐ লাল স্রোত আবার নদীর ধার দিয়েও বয়ে চলেছে। অগ্নিশিখার মধ্যকার ঐ মূর্তি-গুলির তাই কত কাজ। কিন্তু তোমার পক্ষে এ জায়গাটা বড্ড গরম, তাই না? আচ্ছা, চ'লে এসো, আমরা আবার বাগানে ফিরে যাই।"

বাগান থেকে তারা চলে আসবার পর, ইতিমধ্যে সেখানকার দৃশ্য আবার বদ্‌লে গিয়েছে। ফুলে ফুলে এখন ছড়িয়ে পড়েছে চাঁদের আলো। পাখীরা এখন নীরব। ছেলেমেয়েরাও সব ঘুমিয়ে পড়েছে সেই কুঞ্জবনে, এক এক দলে ভাগ হ'য়ে। মেরী আর তার বন্ধু জেরিনা কিন্তু এখনো পরিশ্রান্ত হ'য়ে পড়েনি। সারারাত তারা জেগে কাটিয়ে দেয় গল্প ক'রে আর বেড়িয়ে।

সকাল হ'তেই তারা দুধ আর ফল খেয়ে বেশ চাঙ্গা হ'য়ে ওঠে। মেরী বলে—"আচ্ছা ভাই! চলো না কেন ঐ পথটা ঘুরে আমরা দেবদারুর বনে যাই। সেখানে কেমন লাগে একবার দেখাই যাক্‌ না। যাবে?"

জেরিনা জবাব দেয়—"চলো। আমি নিশ্চয় ক'রে বল্‌তে পারি ও'জায়গা তোমার খু-ব ভালো লাগবে। ওখানে প্রহরীরা সব রয়েছে, তারা তোমাকে খুব আনন্দ দেবে। গাছের মধ্যেই তারা দাঁড়িয়ে আছে দেখতে পাবে।"

তারপর তারা দু'জনে সেই কুঞ্জবনের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চল্‌লো। কত ফুল রয়েছে ফুটে। কত দোয়েল-শ্যামা ডাক দিয়ে যাচ্ছে। কি মিষ্টি

তাদের ডাক। যেতে যেতে তারা গিয়ে উঠ্‌লো একটা পাহাড়ে। সেখানে আঙুর ফলে রয়েছে চতুর্দিকে। তাই ওর নাম দেওয়া হয়েছে 'আঙুর-পাহাড়। সেই পাহাড়ে উঠে, ছোট একটা ঝরণা পার হ'য়ে তারা গিয়ে পৌঁছুল সেই দেবদারু-তলে।

মেরী ব'লে ওঠে—"কি ক'রে এই এতটা পথ চ'লে এলাম বল তো?"

তার সঙ্গী বলে—"কি জানি ভাই, সে আমি জানি না। কিন্তু চ'লে তো এলাম।"

তারা তখন সেই দেবদারু-গাছ বেয়ে উঠতে থাকে। একটা ঠাণ্ডা কন্‌কনে হাওয়া এসে লাগে তাদের চোখেমুখে। দূরে দেখা যায় একটা কাঁটা ঝোপ। গাছের উপরে উঠে তারা দেখতে পায় কতগুলি অদ্ভুত জীব রয়েছে দাঁড়িয়ে। ধূলো-কাদা মাখা যত নোংরা মুখ। সাদা প্যাঁচার মতই তাদের মাথাগুলি। পশমের পোশাকে তারা শরীর রেখেছে ঢেকে। মাথায় ধ'রে রয়েছে অদ্ভুত ধরনের ছাতা। অদ্ভুত চামড়া দিয়ে তৈরী সেগুলি। তাদের হাতে রয়েছে কতগুলি বাদুড়ের পাখনা। তাই দিয়ে জোরে জোরে হাওয়া খাচ্ছে তারা, সেই হাওয়ায় তাদের পোশাক উড়ছে কেমন অদ্ভুত ভাবে। মেরী ব'লে উঠলো বেশ জোরেই—"যদিও আমি খুব ভয় পেয়েছি, তবু আমার হাসি পাচ্ছে খুব এদের কাণ্ডকারখানা দেখে।"

জেরিনা জবাব দিলো—"এরাই আমাদের প্রহরী। খুব বিশ্বাসী এরা। ওই যে ওরা অমন ক'রে পাখায় বাতাস খাচ্ছে, তার কারণ কি জানো? যাতে কোনো ভয়, ভাবনা ওদের কাছে না আসতে পারে, তাই ওরা বাতাস দিয়ে তাদের কাছে ঘেঁষতে দিচ্ছে না। পশমের পোশাকে কেন ওরা গা ঢেকে রয়েছে জানো? এই যে ঠাণ্ডা হাওয়া আর বৃষ্টি হচ্ছে, এ ওরা সইতে পারে না কিছুতেই। এখানে বরফ পড়ে না, ঠাণ্ডা কন্‌কনে

হাওয়া আসতে পারে না কখনো। চির-বসন্ত আর গ্রীষ্ম এখানে। তা নইলে এই প্রহরী বেচারারা কবে যে ম'রে শেষ হ'য়ে যেতো তার ঠিক নেই।"

গাছ থেকে নামতে নামতে মেরী জিজ্ঞাসা করে—"আচ্ছা, তোমরা সব কে বল তো? তোমাদের কি কোনো নাম নেই?"

জেরিনা মৃদু হেসে জবাব দিল—"আছে। লোকে আমাদের বলে—অপদেবতা। কেউ কেউ আবার নাম দিয়েছে বামন-ভূত!"

ঠিক এই সময় মাঠে একটা কলরব শোনা গেল।

ছেলেমেয়েরা যেন হঠাৎ উল্লসিত হয়ে উঠেছে। তারা চীৎকার ক'রে বল্‌ছে—"সুন্দর-পাখী আজ এসেছে; ঐ দেখ সেই সুন্দর-পাখী! সুন্দর-পাখী!"

সঙ্গে সঙ্গে সবাই ছুট্‌লো হল্‌ঘরের দিকে। ছেলে বুড়ো যে যেখানে ছিলো সবাই এলো ভিড় ক'রে। কি তাদের আনন্দ, কি তাদের উল্লাস। যন্ত্রসঙ্গীতে চতুর্দিক মুখরিত হ'য়ে উঠলো। মেরী আর জেরিনা ঘরে ঢুকে দেখে সবাই ওপরের দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে আছে। আর, প্রকাণ্ড একটা পাখী গম্বুজের ঠিক নীচে ঘুরে ঘুরে চক্রাকারে উড়ছে।

যন্ত্রসঙ্গীতের সুর যেন ক্রমশঃ মধুর থেকে মধুরতর হ'য়ে উঠতে লাগলো। ঘরের আলো আর রঙও যেন মুহূর্তে মুহূর্তে বদ্‌লাতে শুরু ক'রে দিলো। সে এক অশ্রুতপূর্ব সুমধুর সঙ্গীত, অভূতপূর্ব সুমধুব এক চমৎকার দৃশ্য।

যন্ত্রসঙ্গীতের সুর যখন ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল বাতাসে—পাখীটি তখন নামতে সুরু করলো। গম্বুজটার নিচে বড় একটা জানালা। বাইরের আলো আর বাতাস প্রবেশ ক'রে সেইখান দিয়ে। জানালাটার ঠিক নিচেই আবার একটা সিংহাসন। শূন্যে দুল্‌ছে সেটা। আলোয়

করছে ঝক্‌ঝক্‌। পাখীটি এসে বস্‌লো সেই দ্যুতিময় ঝুলন্ত সিংহাসনের ওপর বিকট চীৎকার ক'রে।

পাখীটার গায়ের রঙ বেগুনী আর সবুজে মেশানো। মাঝে মাঝে আবার সোনালী ডোরা কাটা। মাথায় একটা ঝুঁটি। সেটা এত সুন্দর যে, আলো প'ড়ে হীরের মতো জল্‌জল্‌ ক'রছে। ঠোঁটদুটো তার টুকটুকে লাল, আর পা দু'টি গাঢ় নীল। বর্ণ-বৈচিত্রে পাখীটি এত সুন্দর যে, দেখলেই বিস্ময়-বিমুগ্ধ নেত্রে চেয়ে থাকতে হয়। পাখীটা আকারে একটা ঈগলের সমান হবে। কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর আর অদ্ভুত।

পাখীটা এবার তার লাল ঠোঁটদুটো ফাঁক করতেই তার কণ্ঠ থেকে ভারি মিষ্টি সুর বের হ'তে আরম্ভ করলো। মনে হ'লো একসঙ্গে যেন বহু গায়ক পাখী সুমিষ্ট স্বরে গান ধরেছে ধীরে ধীরে। এমন একটা সুর-মূর্ছনার সৃষ্টি হ'লো যে; প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ে আনন্দে নেচে উঠ্‌লো একসঙ্গে, চোখ দিয়ে তাদের গড়িয়ে পড়তে লাগলো আনন্দাশ্রু। পাখীর গান যখন থামলো, ছেলেমেয়ে, বুড়ো-বুড়ি সবাই তখন মাথা নত ক'রে তাকে জানালো অভিনন্দন। পাখীটি তখন আবার চক্রাকারে উড়ে গিয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল আকাশে। দূরে, দূরে, অনেক দূরে চ'লে গেল সে। একটা লালবিন্দু ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। ধীরে ধীরে তাও মিলিয়ে গেল একেবারে।

মেরী এবার তার খেলার-সাথী সেই জেরিনার দিকে একটু নিচু হয়ে জিজ্ঞাসা করলো—"তোমরা এত আনন্দ করলে কেন বল তো?" মেরী বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখল জেরিনা যেন গতকালের চেয়ে আকারে আরও একটু ছোট হয়ে গেছে।

জেরিনা বল্‌লে—"আনন্দ করব না? আমাদের রাজা আসছেন যে! আমাদের মধ্যে অনেকেই তাঁকে এর আগে দেখেনি কিনা! তাই এত

উল্লাস। রাজার দৃষ্টি যে দিকে পড়ে, সেদিকেই আনন্দের আর খুশির বন্যা বয়ে যায়। শীতের শেষে তোমরা যেমন সাগ্রহে বসন্তের প্রতীক্ষা কর আমরাও তেমনি রাজার শুভাগমনের জন্য উদ্‌গ্রীব থাকি। এই পাখীই তার অগ্রদূত। সে এসে ব'লে গেল, ঘোষণা করে গেল যে, রাজা আসছেন।

"এই যে পাখীকে রাজামশাই পাঠিয়েছিলেন তার নাম কি জানো? ফিনিক্স। ফিনিক্স এর নাম। এর গুণও যেমন অনেক, জ্ঞানও তেমনি অগাধ। বহুদূরে আরবদেশে এক গাছে এর বাসা। সেখানে কিন্তু ওর মতো আর কোন পাখীই নেই। বল্‌তে গেলে এ পৃথিবীতে ফিনিক্স হলো অদ্বিতীয়! ও যখন ক্রমশঃ বুড়ো হ'তে থাকে, তখন একদিন গান গাইতে গাইতে নিজেই নিজেকে ভস্ম ক'রে ফেলে। সেই ভস্ম থেকেই আবার জন্ম নেয় নতুন ফিনিক্স। সৌন্দর্য কিন্তু একটুও কমে না তার। এই ফিনিক্সকে কিন্তু দেখা যায় খুবই কম। অনেক যুগ পরে যখন একটিবার এই সুন্দর পাখীটি মানুষের দৃষ্টিপথে আসে, তখন সকলেই এটাকে শুভসূচক ব'লে মনে করে; তাদের বর্ষপঞ্জিকায় এই দিনটির কথা স্পষ্টাক্ষরে লিখে রাখে। কিন্তু বন্ধু! এবার আমাকে তোমার কাছে বিদায় নিতে হবে। কারণ, রাজাকে দেখবার তোমার কোনো অধিকার নেই।"

এই সময়, আবার সেই সোনালী পোশাক-পরা মহিলাটি এসে হাজির হ'লেন। মেরীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি হাঁটতে হাঁটতে বল্‌লেন—"বাছা! এবার তুমি যাও। তোমাকে যেতেই হবে। রাজা এখন আসবেন। এখানে তিনি কুড়ি বছর, হয় তো বা তারও বেশি সময় দরবার করবেন আমাদের নিয়ে। তাঁর আসার সঙ্গে সঙ্গে ফুলে ফলে ভ'রে উঠ্‌বে দেশ; বিশেষ করে আমাদের এই রাজ্যে আনন্দের আর সীমা থাকবে না।

নদী-নালা-খাল-বিল ভ'রে উঠবে জলে ; মাঠে মাঠে ফল্‌বে কতো ফসল ; বাগ-বাগিচায় ফুটবে কতো ফুল ; ধরবে কতো ফল ; আমাদের পানীয় হবে আরও সুমিষ্ট ; মাঠ হবে আরও উর্বরা ; বনভূমি সাজবে নতুন পাতায় ; সুমধুর বাতাস বইবে চতুর্দিকে ; ঝড় উঠবে না, বন্যা হবে না। এই আংটিটা তুমি নাও। আমাদের কথা মনে ক'রো তুমি। কিন্তু সাবধান! আমাদের কথা যেন কাউকে ব'লো না কখনো। তাহ'লে কিন্তু আমরা এখান থেকে সব উড়ে চ'লে যাব। তার ফলে, তুমি এবং আর সকলেই এখানকার সুখ-শান্তি ও শুভেচ্ছা থেকে চিরতরে বঞ্চিত হবে। যাও, তোমার ঐ খেলার সাথী বন্ধুটিকে আর একবার চুম্বন ক'রে আমাদের কাছ থেকে বিদায় নাও।"

জেরিনা তখন কাঁদতে থাকে। মেরী এসে তাকে জড়িয়ে ধরে দু'হাত দিয়ে। তারপর, তারা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নেয়।

আগের সেই সংকীর্ণ পুলটার কাছে এসে গেছে মেরী। দেবদারু বন থেকে একটা ঠাণ্ডা হাওয়া তার পিঠে এসে বেঁধে। ছোট্ট কুকুরটা তখন প্রাণপণে চীৎকার ক'রে চলেছে তার দিকে চেয়ে। তার গলার ঘন্টিটাও বেজে ওঠে সেই সঙ্গে। মেরী এবার চারিদিকে একবার তাকিয়ে দেখে। তারপরেই প্রাণপণ শক্তিতে ছুটে চলে সামনের দিকে। দেবদারু বনের ঐ অন্ধকার, ধ্বংসপ্রাপ্ত ঐ কুঁড়েঘরগুলি, আর গোধূলির সেই ম্লান ছায়া—সব জড়িয়ে কেমন একটা ভীতির সঞ্চার করে মেরীর মনে। ভয়ে সে কাঁপতে কাঁপতে ছুটে চলে।

মাঠের পথে ছুটতে ছুটতে তার মনে জাগে বাপ-মার কথা। নিজের মনেই সে বলে—"আমার জন্য একরাত্রি মা-বাবার কি উৎকণ্ঠাতেই না কেটেছে! কিন্তু আমি কোথায় গিয়েছিলাম, আর কি-ই বা সব

অদ্ভুত জিনিস দেখে এলাম সে কথা বল্‌ব না তাঁদের। বলেই বা কি হবে! তাঁরা তো সে-কথা বিশ্বাসই করবেন না।"

দুটো লোক পাশ দিয়ে চ'লে গেল। ছোট্ট নমস্কারও ক'রে গেল তাকে। মেরী শুনতে পেল তারা যেন বলাবলি করতে করতে চলেছে —"ভারি সুন্দর মেয়ে তো! কোথায় থাকে এ?"

লম্বা লম্বা পা ফেলে মেরী এসে বাড়ির সামনে দাঁড়ালো। কিন্তু এ কি কাণ্ড! কাল বিকালে মেরী যে সব গাছে থোকা থোকা ফল ঝুল্‌তে দেখে গেছে, আজ সেই সব গাছে পাতা নেই! ন্যাড়া হয়ে, রুক্ষ মূর্তিতে দাঁড়িয়ে আছে গাছগুলি। বাড়িটার রঙও গিয়েছে বদ্‌লে। নতুন একটা গোলাঘরও উঠেছে বাড়ির পেছনে। মেরী তো বিস্ময়ে হতবাক্! মনে হ'লো সে যেন স্বপ্ন দেখছে। দরজাটা খুলে ফেল্‌লো সে। টেবিলের পিছনেই তার বাবা রয়েছেন ব'সে। তাঁর এক পাশে একজন অপরিচিতা মহিলা, অন্য পাশে একটি অপরিচিত তরুণ।

মেরী চীৎকার ক'রে ব'লে ওঠে—"বাবা! বাবা! আমি এসেছি। কিন্তু আমার মা কই? আমার মা-মণি কোথায়?"

এই কথা শুনে সেই মহিলাটি যেন চম্‌কে উঠলেন। মেরীর দিকে এগিয়ে এসে তিনি বল্‌লেন—"তোমার মা? আরে! তুমি? হাঁ হাঁ তুমি, নিশ্চয় তুমি। তুমিই আমার সেই হারানো ধন, আমার বুকের মানিক, আমার মেরী। মেরী সোনা!"

প্রথমটায় মেরীকে তিনি চিনতে পারেননি। কিন্তু মেরীর গালের নিচের ঐ জড়ুলটা আর তার চোখ দেখেই তিনি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। বাপ-মা সকলেই মেরীকে ফিরে পেয়ে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন। চোখ দিয়ে তাদের অবিরল ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়তে থাকে। মেরী অবাক হ'য়ে দেখে সে নিজেই কতবড় হয়ে গেছে; সে এখন

তার বাবার প্রায় সমান সমান। সে বুঝতে পারে না এ কি করে সম্ভব হলো। কি করে এক রাত্রেই এতো পরিবর্তন। কি করে এই অল্প সময়ের মধ্যে তার মা এতো বুড়িয়ে গেলেন! অপরিচিত ঐ তরুণটির নাম-ই বা কি? বাপকে সে জিজ্ঞাসা করে।

তিনি জবাব দেন—“সে কি রে! এ যে আমাদের পাড়ার ছেলে। এ্যানড্রেস! তুই যে মা আবার ফিরে আসবি, আমরা তা আশাই করিনি। সাত বছর পরে তুই ফিরে এলি। এতদিন কোথায় ছিলি বল্‌তো? কি করে আমাদের ছেড়ে তুই এতদিন ছিলি মা?”

জবাব শুনে মেরীর সব কেমন যেন ওলট্‌ পালট্‌ হ’য়ে যায়। অবাক হ’য়ে সে বলে—“সাত বছর! সাত বছর পরে আমি ফিরে এলাম!”

হাস্‌তে হাস্‌তে এ্যানড্রেস তার হাতে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলে—“হ্যাঁ গো হ্যাঁ! আমাদের সেই দৌড়ের কথা তোমার মনে নেই? আমি কত আগে তোমাকে পেছনে রেখে বাড়ি ফিরে এলাম—আর তুমি রইলে কোথায়। সাতটি বছর পার হ’লো—তারপর আজ তুমি এলে।”

তাঁরা সকলেই তখন মেরীকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন ক’রতে থাকেন। কিন্তু মেরীর মনে প’ড়ে যায় সেই সোনালী-পোশাক-পরা মহিলাটির উপদেশ আর নির্দেশের কথা। তাই সে চুপ ক’রে থাকে, কিছু বলে না। তার কাছ থেকে কোন জবাবই না পেয়ে তাঁরা নিজেরাই তখন তার হারিয়ে যাওয়া সম্পর্কে বেশ একটা গল্প তৈরী করেন। তাঁরা বলেন—পথ হারিয়ে মেরী যখন পথে পথে কাঁদতে কাঁদতে চলেছিল, সে সময় ঘোড়ার গাড়িতে ক’রে কারা যেন সেই পথ দিয়েই যাচ্ছিলেন। মেরীকে ওভাবে একলাটি দেখতে পেয়ে, তাঁরা তাকে গাড়িতে ক’রে তাঁদের বাড়িতে নিয়ে যান। তাঁরা অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করেন। মেরী

কিন্তু কিছুতেই তার বাপ-মার নাম বা বাড়ির ঠিকানা ব'লতে পারে না। মেরী তাঁদের কাছেই অতি আদরে যত্নে লালিত পালিত হ'তে থাকে। অবশেষে তাঁরা একদিন মারা যান। মেরীর তখন মনে পড়ে যায় তার বাপ-মা বাড়ি ঘরের কথা। তাই সে ছুটে এসেছে আবার তার হারানো রাজ্যে, তার বাপ-মায়ের কোলে।

মা বলেন—"ওসব কথায় আর আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই। আমরা যে আবার আমাদের মেরী সোনাকে ফিরে পেয়েছি, এই আমাদের যথেষ্ট।"

এ্যানড্রেস তখন মেরীকে খেতে যাবার জন্য ডাকে। মেরী কিন্তু বাড়িতে ফিরে তেমন স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না। সবই কেমন যেন অপরিচিত, অদ্ভুত অদ্ভুত ঠেকছে তার কাছে। বাড়ীটা যেন আগের মত বড় নেই। সে নিজের পোশাকের দিকে তাকিয়ে দেখে। সাদাসিধে আর পরিষ্কার হ'লে কি হবে, এ পোশাক তো তাদের দেশের নয়! এবার তার নজর পড়লো গিয়ে তার হাতের আংটিটার ওপর। সোনার আংটি, মাঝখানে একটা লাল পাথর বসানো। জ্বল্‌জ্বল্‌ কর'ছে। আংটিটা দেখে তার বাপ প্রশ্ন ক'রতেই সে বল্‌লে—"এটা আমাকে সেই হিতৈষী-বন্ধুরাই দিয়েছেন।"

ঘুমের সময় হ'তেই মেরী গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো বিছানাতে। সে যেন একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। পরদিন সকালে যখন তার ঘুম ভাঙ্‌লো, তখন একে একে মনে পড়তে লাগলো অনেক কথাই। বাড়ীতে পাড়া-প্রতিবেশী লোকজনের আনা-গোনার আর অন্ত নেই। মেরীকে তাঁরা প্রশ্নের পর প্রশ্ন ক'রে একেবারে অতিষ্ঠ ক'রে তুলছেন। সকলেই অবিশ্যি মেরীকে ফিরে পেয়ে খুব খুশি। সব চাইতে আনন্দ করছে এ্যানড্রেস। মেরীর জন্য সে যে কি করবে আর না করবে, তা ভেবে

পাচ্ছে না। পঞ্চদশী মেরী আজ তার মনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করতে আরম্ভ করেছে। গতকাল তো সে ভালো ক'রে ঘুমোতেই পারেনি। রাজবাড়ি থেকেও মেরীর ডাক আসে। তাঁরাও সকলে শুনতে চান তার অন্তর্ধান কাহিনী। মেরীও ব'লে যায় বাঁধাধরা বুলির মতো, কি ক'রে সে হারিয়ে যায়, কি ক'রে এই সাতটি বছর অন্যের আশ্রয়ে থেকে মানুষ হ'য়ে ওঠে।

রাজবাড়ির বুড়ো রাজা আর তাঁর রাণী মেরীর কথা বলার বাঁধুনি দেখে ভারি অবাক হ'য়ে যান। ধীরে ধীরে সব কথাই সে বলে, অথচ উচ্ছ্বাসে একেবারে ভেঙ্গে পড়ে না। তাঁদের সমস্ত প্রশ্নেরই সে জবাব দেয় সুন্দর ভাবে, সুন্দর ভাষায়। এখানকার রাজপ্রাসাদ, এখানকার রাজা-রাণী কিন্তু মেরীর কাছে আর সম্ভ্রম জাগায় না। কারণ, সেই বামন-ভূতের দেশে সে যা দেখে এসেছে, তার তুলনায় এসব কিছুই নয়। রাজবাড়ির ছেলেরা অবিশ্যি মেরীর রূপ দেখে মুগ্ধ হয়।

এখন ফেব্রুয়ারী-মাস।

অন্যান্য বারের চেয়ে এবার যেন আগেই, গাছে গাছে ফুলের কুঁড়ি ধরলো, দেখা দিল ফলের সম্ভাবনা। বুলবুলের ডাক শোনা গেল এরই মধ্যে। মাঠে মাঠে বসন্ত গোলাপ যেন হেসে উঠ্‌লো তাদের পাপ্‌ড়ি মেলে। ছোট ছোট নদী-নালা জলে ভরে উঠ্‌লো সবদিকে। মাঠের জল সেচনে তারা যেন সাহায্য করতে চায়। পাহাড়ে পাহাড়ে আঙুরের যেন এবার ছড়াছড়ি। গাছে গাছে ফল যেন আর ধরে না। এক কথায় হেসে উঠ্‌লো চতুর্দিক।

সকলেই এবার আশার অতিরিক্ত আয় করলো। একটা দিনও এবার খারাপ গেল না। ঝড় নেই, বাদলা নেই, সব দিকেই প্রশান্ত ভাব।

আঙুরগুলো এত রস দিচ্ছে এবার যে, মদ তৈরী করতে ফেলা যাচ্ছে না কিছু। গ্রামের সব লোকই ভাবে, কি ক'রে এমন সুদিন এলো এবার। এ সবই যেন তাদের কাছে স্বপ্নের মতো মধুর লাগে। এর পরের বছরও ঠিক এমনি সুদিন এলো, চারিদিক ধনধান্যে পূর্ণ হ'য়ে উঠলো। ক্রমশঃ আর বিস্ময় থাকলো না। এই স্বচ্ছল-অবস্থাতেই তারা যেন সকলে অভ্যস্ত হ'য়ে উঠলো; শরৎকালে মেরী তার বাপ-মাকে জানালো যে এ্যানড্রেস তাকে ভালবাসে, তাকে বিয়ে করতে চায়। বাপ-মা তো মহা খুশি। সেই শীতেই তাদের দু'জনের বিয়ে হ'য়ে গেল মহা আনন্দে আর উৎসবে।

মেরীর কিন্তু মাঝে মাঝে মন চ'লে যায় ঐ দেবদারু বনের অন্তরালে, সেই স্বপনপুরীর রূপমহলে। কি আনন্দ, আর কি শান্তি বিরাজ করে সেখানে। মেরী ভাবে, আর ক্রমশঃ তার মন খারাপ হ'য়ে যায়। বিশেষ ক'রে তার মা-বাবা যখন বলেন—ঐ দেবদারু বনের ভিতরে থাকে যত বাউণ্ডুলে বেদের দল, মেরীর মন তখন আরও বিরূপ হ'য়ে ওঠে তাঁদের প্রতি। মেরী এক একবার ভাবে—বাপ-মাকে, বিশেষ ক'রে এ্যানড্রেসকে সে সব কথা খুলে ব'লে প্রমাণ করে যে, তাদের ধারণা সম্পূর্ণ ভুল; কিন্তু সেই মহিলার কথা স্মরণ ক'রে সে চুপ ক'রে থাকে। কিছু বলে না আর। একটা বছর কেটে যায় এমনি ক'রে। পরের বছর মেরীর একটি মেয়ে হয়। সে তার নাম রাখে এল্‌ফ্রিডা।

মেরী তার স্বামীকে নিয়ে বাপ-মার কাছেই থাকে। তাদের বাড়িটা বেশ বড়ই। কারুরই কোনো অসুবিধা হয় না। সকলেই সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করে। ছোট্ট এল্‌ফ্রিডা কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই একটু অদ্ভুত ধরনের হ'য়ে ওঠে। অল্প দিনের মধ্যেই সে হাঁটতে শেখে। এক বছর

পার হ'তে না হ'তেই পরিষ্কার কথা বলে সে। কয়েক বছরের মধ্যেই সে এত সুন্দর হ'য়ে উঠ্‌লো যে সবার মুখেই তার কেবল প্রশংসা। 'অমন বুদ্ধিমতী আর গুণবতী মেয়ে হয় না'—এই কথাই শোনা যায় লোকের মুখে মুখে। মেরী কিন্তু মনে মনে ভাবে, তার মেয়ে ঠিক ঐ দেবদারু বনের সেই ছেলে-মেয়েদেরই একজন। তাদের মতই রূপ তার, তাদের মতই মিষ্টি সে। এল্‌ফ্রিডা কিন্তু পাড়ার ছেলেমেয়েদের সঙ্গ ভালোবাসে না মোটেই। তাদের ঐ নাচ-গান-হল্লা থেকে সে সর্বদাই দূরে থাকতে চায়। নির্জনতাই যেন তার বেশি পছন্দ। সে হয় বাগানের এক কোণে বসে বই পড়ে, নয়তো সুঁচ-সুতো নিয়ে সেলাই করে। কখনো আবার তাকে দেখা যায় গভীর চিন্তামগ্ন। গালে হাত দিয়ে ব'সে ব'সে কত কী-ই না সে ভাবে। কখনো আবার আপন মনে পায়চারী ক'রে বেড়ায়, আর নিজের মনেই কি যে বল্‌তে বল্‌তে চলে। মেরী বা এ্যানড্রেস তার এই আনমনা ভাব দেখে ততটা বেশি উদ্বিগ্ন হতো না, যতটা বেশি বিচলিত ও উৎকণ্ঠিত হ'তো তার অদ্ভুত অদ্ভুত কথাবার্তা শুনে। ওর দিদিমা ব্রিগিট্টা প্রায়ই বল্‌তেন—"এরকম অসাধারণ মেয়ে বহু যুগে একটা জন্মায়। কিন্তু এ পৃথিবীতে যোগ্য স্থান এরা পায় না এই যা দুঃখু!"

ভারি অদ্ভুত এই মেয়েটি। প্রত্যেকটি কাজেই তার একটা না একটা বিশেষত্ব ফুটে উঠবে। বাড়ির মধ্যে সে-ই উঠবে ঘুম থেকে সকলের আগে। নিজের কোনো কাজ সে অন্যকে দিয়ে করিয়ে নেবে না কখনো। ঘুম থেকে উঠে হাত-মুখ ধুয়ে নিজের পোশাক সে নিজেই পরে নেবে, কারুর সাহায্য দরকার হয় না তার। নিজের ছাড়া কাপড় জামা সে নিজেই ধুয়ে নেবে, এমন কি এ বিষয়ে সে তার মার সাহায্যও নেবে না কখনো। তার এই কাণ্ডকারখানা দেখে মেরী খুব

ঠাট্টা করে মেয়েকে। বলে—"পাগলী মেয়ের কাণ্ড দেখ! এখন থেকেই কেমন স্বাবলম্বী হয়ে উঠছে।"

কিন্তু মেরী একদিন ভারি অবাক হয়ে গেল মেয়ের এক কাণ্ড দেখে।

সেদিন ছুটির দিন। মেয়েকে সঙ্গে করে রাজবাড়ীতে বেড়াতে যাবার কথা; এল্‌ফ্রিডা কিন্তু কিছুতেই যাবে না। খালি কাঁদছে মায়ের হুকুম শুনে। মেরী সবিস্ময়ে হঠাৎ দেখতে পেল যে, এল্‌ফ্রিডার গলায় একটা অদ্ভুত ধরনের সোনার জিনিস ঝুল্‌ছে। সুতো দিয়ে সেটা তার গলায় পরানো। মেরী হঠাৎ চম্‌কে উঠ্‌লো। এ-রকম সোনা তো সেই দেবদারু বনের রাজপুরীতেই সে কেবল দেখেছে। মেরী যেন কেমন একটু ভয়ও পেল। মেয়েকে এ-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করাতে সে বল্‌লে—"বাগানে খেলা করতে করতে সেদিন ওটা পেয়েছি।" মেয়েটি তখন মেরীকে বার বার ক'রে অনুরোধ করলো ওটা তাকে ফিরিয়ে দেবার জন্যে। মেয়ের ঐ কাতর অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে সংশয়াকুল চিত্তে মেরী আবার সেটা পরিয়ে দিল মেয়ের গলায়। তারপর মেয়েকে সঙ্গে নিয়েই সে চল্‌লো রাজবাড়ীতে। সারা পথ তার আর ভাবনার অন্ত নেই।

পথের ধারে ফসল ও চাষের সাজসরঞ্জামের কতগুলি গুদাম ঘর আর অফিস। গেরস্থালীর নানা জিনিস পত্তরও মেলে সেখানে। তার ঠিক পেছনেই একটা সবুজ মাঠ। বেশ একটা কুঞ্জবনও রয়েছে সেখানে, কিন্তু এখন সেটা প্রায় জন পরিত্যক্ত! গুদাম-ঘরগুলি ওঠ্‌বার পর থেকে কেউ বড় একটা সেখানে যায় না। এল্‌ফ্রিডা কিন্তু প্রায়ই এই কুঞ্জ-বনে এসে খেলা করে। ভারি ভালো লাগে তার এ জায়গাটা। তাকে বিরক্ত করবার কেউ নেই এখানে, দিনের অর্ধেক সময়ই সে এই বিজন বনে এসে কাটিয়ে যায়।

একদিন বিকেলে মেরী এলো এই রকম একটা অফিসে। তার কিছু গেরস্থালীর জিনিস কেনা দরকার; ঘরে ঢুকেই তার নজর গিয়ে পড়লো একটা দেওয়ালের দিকে। সেখানকার একটা ফুটো দিয়ে ঘরের মধ্যে এক ঝলক আলো এসে পড়েছে। মেরী গিয়ে সেই ফুটোর মধ্যে চোখ রাখতেই দেখতে পেল তার মেয়েকে, সেই জনপরিত্যক্ত কুঞ্জবনে ব'সে সে যেন কি করছে। একটা পাথর তাকে কতকটা আড়াল ক'রে রেখেছে। যাই হোক, মেরী আরও একটু ভালো ক'রে দেখবার চেষ্টা করলো। এবারে তার আর বিস্ময়ের অন্ত নেই। সর্বশরীর তার রোমাঞ্চিত হয়ে উঠ্‌লো। ছোট্ট একটা বেঞ্চের উপরে বসে রয়েছে এল্‌ফ্রিডা, আর তার পাশে বসে আছে দেবদারু বনের সেই জেরিনা! দু'জনেই খুব হাসি খুশি। আনন্দে উচ্ছল হ'য়ে উঠেছে দু'জনেই। এল্‌ফ্রিডার গলা জড়িয়ে ধরে বিষাদপূর্ণ কণ্ঠে জেরিনা বলে ওঠে—"লক্ষ্মীটি! তোমার মা যখন ছোট্ট ছিল তার সঙ্গে যেমন করে খেলা করেছি তোমার সঙ্গেও তেমনি আজ আনন্দে মেতে উঠেছি আমি। কিন্তু তোমরা এই মানুষগুলো ভারি অদ্ভুত। তাড়াতাড়ি তোমরা কত বড় হয়ে যাও, ভারিক্কি হয়ে ওঠো! আমার ভারি খারাপ লাগে দেখে। আচ্ছা, আমি যেমন চিরকাল ছোট্ট আছি তুমিও কি তেমনি ছোট্ট থাকতে রাজী আছ?"

এল্‌ফ্রিডা জবাব দেয়—"সানন্দে রাজী আমি। কিন্তু, মা-বাবারা সব বলেন, আমার নাকি এই ছেলেমানুষি শীগগিরই দূর হ'য়ে যাবে। আমি তখন খেলাধুলো সব ছেড়ে দেব। তাঁরা আমার মধ্যে নাকি অসাধারণত্ব খুঁজে পান। বলেন, জ্ঞানী হবার সকল রকম লক্ষণই নাকি আমার মধ্যে আছে। তা'হলে তো আমি আর তোমাকে কাছে পাব না জেরিনা! কি হবে তা হ'লে? ঐ দেখ কি সুন্দর ফল ও ফুলের গাছ। কি সুন্দর সুন্দর ছোট কুঁড়ি ধরেছে প্রত্যেকটি আপেল গাছে।

পথ দিয়ে যখন লোক চলে যায় তারা বলাবলি করে—এই কুঁড়ি থেকেই একদিন কি সুন্দর আপেল বেরুবে। তাই হয়। সূর্যের কিরণ এসে পড়ে গাছে গাছে। ছোট ছোট কুঁড়ি থেকে হয় ফুল, তারপর সে ফুল যায় ঝরে, দেখা দেয় ছোট্ট আপেলটি। ধীরে ধীরে সে আপেলও একদিন কত বড় হ'য়ে ওঠে। তখন সে আপেল হয় কত সুন্দর, কত মিষ্টি। কিন্তু ছোট বেলাকার ঐ যে ফুলফোটা তার কাছে কি আর কিছু লাগে? অত সুন্দর জিনিস কি এ পৃথিবীতে আছে? মানুষও এমনি করে ছোট থেকে ক্রমশঃ বড় হয়ে ওঠে। আমি কিন্তু বড় হতে চাই না কখনো। আমার এই শৈশব ছেড়ে কিছুতেই বড় হব না। না না না। আচ্ছা জেরিনা! তোমার সঙ্গে আমার কি আর দেখা হবে না?"

জেরিনা বলে—"আমাদের সঙ্গে রাজা যতদিন থাকবেন ততদিন দেখা হওয়া অসম্ভব বললেই চলে। সে যাই হোক মাঝে মাঝে আমি তোমার কাছে আসবো। এখানে বা সেখানে কেউই আমাকে দেখতে পাবে না। আমি অদৃশ্য হয়ে উড়ে আসব আকাশ পথে। যতদিন তুমি ছোট্টটি আছ, ততদিন তোমার সঙ্গে কি আনন্দেই না আমার কাটবে ভাই! তোমার জন্যে আমি কি করব বলতো এল্‌ফ্রিডা?"

—"কিচ্ছু করতে হবে না তোমাকে। এমনি ক'রে শুধু আমায় ভালবাসবে। সে কথা যাক্। এখন এসো আরেকটা গোলাপ তৈরী করি।"

জেরিনা তার জামার মধ্য থেকে পূর্ব পরিচিত সেই বাক্সটি বের করে। তারপর, তা থেকে দু'টো বীজ নিয়ে ছড়িয়ে দেয় মাটিতে। সঙ্গে সঙ্গে দু'টো গাছ গজিয়ে ওঠে। দুটি বড় বড় লাল গোলাপ ফুল ফুটে ওঠে সেই গাছ দুটিতে। এমন ভাবে তারা পরস্পরের দিকে ঝুঁকে পড়ে যে মনে হয়, তারা যেন পরস্পরকে চুম্বন করছে। জেরিনা ও এল্‌ফ্রিডা মৃদু হেসে ফুল ছিঁড়ে নিতেই—গাছ দু'টি অদৃশ্য হ'য়ে যায়।

এল্‌ফ্রিডা বলে—"কিন্তু এতো শুকিয়ে যাবে শীগ্‌গিরই! তাই না? আচ্ছা, এমন কিছু কি করা যায় না, যাতে ক'রে এত তাড়াতাড়ি পৃথিবীর এই লাল সুন্দর ছেলেটি ঝ'রে পড়বে না অকালে?"

জেরিনা বলে—"আচ্ছা, দাও তো দেখি ফুলটি।" এল্‌ফ্রিডার হাত থেকে সেই লাল গোলাপটি নিয়ে সে তার উপরে তিন বার ফুঁ দেয়। তারপর তিনবার সেটিকে চুম্বন ক'রে বলে—"নাও। শীতকাল পর্যন্ত আর এ ফুল ঝ'রে পড়বে না। তাজা-ই থাকবে ততদিন।"

এল্‌ফ্রিডা সাগ্রহে ফুলটিকে নিয়ে বলল—"এটিকে আমি সযত্নে রেখে দেব আমার কাছে। তোমাকেই তাহ'লে বার বার করে মনে পড়বে আমার। এই ফুলটিই যেন হবে তোমার প্রতিমূর্তি। সকাল সন্ধ্যায় তোমাকে স্মরণ ক'রেই একে আমি চুমু খাব।

জেরিনা বল্‌লে—"সূর্য এখন অস্ত যাচ্ছে। এবার ফিরতে হবে।" এই ব'লে তারা দু'জনে পরস্পরকে নিবিড় স্নেহালিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে। জেরিনা অদৃশ্য হয়ে যায় একটু পরেই।

সেদিন সন্ধ্যায় মেরী তার মেয়েকে খুব আদর করে। চুমো খায়, বুকে জড়িয়ে ধরে আনন্দে। এরপর থেকে মেয়েকে সে আরও স্বাধীনতা দেয় আগের চেয়ে। এ্যানড্রেস যখন মেয়েকে খুঁজে বেড়ায়, মেরী তাকে বারণ করে। ইদানীং মেয়ের এই বাড়ীতে না থাকা এ্যানড্রেসের কাছে ভালো লাগছিল না। সে ভাবতো এতে ক'রে মেয়ে নিজের সম্বন্ধে অসাবধান হ'য়ে, শৈশব-চাপল্যে না জানি কি অমঙ্গলই ডেকে আনবে। মেরী প্রায়ই সেই গুদামঘরে গিয়ে, সেই ফুটো দিয়ে কুঞ্জবনের দিকে তাকিয়ে থাকতো; আর দেখতো দেবদারু বনের সেই সুন্দর অপদেবতাটি তার মেয়ের সঙ্গে কি আনন্দেই না খেলাধূলো ক'রছে।

জেরিনা একদিন এল্‌ফ্রিডাকে জিজ্ঞাসা করে—"আকাশে উড়তে চাও নাকি ?"

এল্‌ফ্রিডা বলে—"নিশ্চয়ই। আমাকে তুমি উড়িয়ে দাও না ভাই।"

দু'জনে তখন পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে। মেরী দেখতে পায় দু'জনেই শূন্যে উঠে যাচ্ছে। সে তখন সব ভুলে গিয়ে ছুটে বেরিয়ে আসে।

আকুল নয়নে চেয়ে থাকে ওপরের দিকে।

জেরিনা কিন্তু ওপর থেকে মেরীকে দেখতে পায়। আঙুল নেড়ে তাকে ইসারা করে, আর মৃদু হাসে। মেরী আবার সরে যায় আড়ালে।

তারপর এল্‌ফ্রিডাকে সঙ্গে নিয়ে নিচে নেমে আসে জেরিনা। তাকে চুম্বন করে বিদায় নেয় অবশেষে।

এরপরে আরও একদিন এভাবে জেরিনা দেখে ফেল্‌লো মেরীকে। সেদিনও মাথা নেড়ে ইসারায় সে তাকে কিছু না বলতে আদেশ করলো। এই আদেশের মধ্যে কিন্তু কঠোরতা ছিল না একটুও— বন্ধুত্বের পরশ ছিল তার মিষ্টি হাসিতে।

স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করতে করতে মেরী প্রায়ই বলতো—"তোমরা কিন্তু দেবদারু বনের ঐ কুঁড়ে ঘর আর প্রাণীগুলো সম্বন্ধে নেহাতই অবিচার করছো।" মেরীর এই কথা শুনে এ্যানড্রেস ভারি অবাক হয়ে যায়। সে বলে—"গ্রামের সবাই যখন একই ধারণা পোষণ করছে তখন তুমি একা যে কেন ঐ কথা বলছ, আমি তা বুঝে উঠতে পারছি না। কেন বল তো তোমার এই বিরুদ্ধ ধারণা হলো ?" মেরী বিচলিত হয়ে ওঠে। ভাবে সব কথা খুলে বলে। কিন্তু কি ভেবে আবার চুপ করে যায়। কোনো কথা বলে না।

কথায় কথায় এ্যানড্রেস একদিন ভারি রেগে যায়। বলে—"যেমন ক'রেই হোক গ্রামের ঐ নোংরা অঞ্চলটাকে কেটে সাফ ক'রে ফেলতে

হবে। যত সব বিচ্ছিরি লোক ; আর বিচ্ছিরি আবহাওয়া! গ্রামকে ওরাই বিষাক্ত ক'রে তুলছে।"

মেরীও উত্তেজিত কণ্ঠে বলে—"অমন কথা বলো না কখনো। ওরাই তোমাদের প্রকৃত হিতৈষী। এই গ্রামের সকলেরই মঙ্গল করছে ওরা।"

—"কি বল্‌লে! হিতৈষী? এই সব বদ্‌মায়েস ভবঘুরে দল করছে আমাদেরই মঙ্গল। তুমি কি পাগল হলে নাকি!" বিস্ময়ের স্বরে জবাব দেয় এ্যানড্রেস।

শেষটায় মেরী আর থাকতে পারে না! এ্যানড্রেস কারুর কাছে এ-কথা বল্‌বে না এই সর্তে,—সে তখন সমস্ত ঘটনা আদ্যোপান্ত খুলে বলে তার কাছে। এ্যানড্রেস কিন্তু বিশ্বাস করে না মোটেই। হেসে উড়িয়ে দিতে চায় মেরীর কাহিনী। মেরী তখন তাকে নিয়ে যায় সেই গুদাম ঘরে, ফুটো দিয়ে দেখায় কুঞ্জবন। এ্যানড্রেস সবিস্ময়ে দেখে ছোট্ট সুন্দর সেই অপদেবতাটির সঙ্গে তার মেয়ে পরমানন্দে খেলা করছে। কি বলবে সে ভেবে পায় না। নিজের অজান্তে একটা বিস্ময়-সূচক ধ্বনি বেরিয়ে যায় তার কণ্ঠ থেকে। জেরিনা চোখ তুলে তাকায়।

সঙ্গে সঙ্গে তার উজ্জ্বল মুখখানি একেবারে বিবর্ণ হয়ে যায়, রাগে কাঁপতে থাকে সে। এবার আর বন্ধুত্বের স্নেহদৃষ্টি নিয়ে সে তাকায় না। চোখ দিয়ে তার যেন আগুন বেরোয় ঠিকরে। এ যেন তার ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত।

এল্‌ফ্রিডাকে সে তখন বলে—"আর উপায় নেই, আমি চল্‌লাম। ওরা নিজেদের যত বুদ্ধিমান ভাবে, ঠিক তত বুদ্ধিমান ওরা নয়।" তারপর সে খুব তাড়াতাড়ি এল্‌ফ্রিডাকে আলিঙ্গন করে। একটু পরেই একটা দাঁড়কাকে রূপান্তরিত হ'য়ে সে উড়ে চলে যায় আকাশে, বিকট কর্কশ চীৎকার করতে করতে।

সন্ধ্যাবেলায় এল্‌ফ্রিডাকে ভারি বিষণ্ণ দেখায়। কাঁদতে কাঁদতে গোলাপ ফুলকে সে একবার চুম্বন করে। মেরীও খুব মন খারাপ ক'রে বসে থাকে। ভয়ও পায় সে। এ্যানড্রেসও বেশি কথা বলে না। সেদিন ক্রমশঃ রাতের আঁধার ঘনিয়ে আসে।

হঠাৎ যেন কি হলো। চতুর্দিকে উঠলো একটা কলরব। গাছপালা দুলতে থাকে, পাখীরা চেঁচামেচি ক'রে উড়ে যায়, বাজ পড়ে যেন সশব্দে। মাটিও তখন কাঁপছে ভীষণ। কান্নার রোলে মুখর হ'য়ে ওঠে সারা গ্রাম। এ্যানড্রেস বা মেরীর তখন আর উঠে দাঁড়াবার সাহস নেই। তারা একটা চাদরে নিজেদের জড়িয়ে কোন রকমে রাতটা কাটিয়ে দেয় আতঙ্কে আর আশঙ্কায়। ধীরে ধীরে ভোর হয়, চতুর্দিক শান্ত হয়ে আসে। শাল-পিয়ালের মাথা দিয়ে সূর্যিঠাকুর উঁকি দেয় পুব আকাশে। চতুর্দিক আবার রবির কিরণে ঝল্‌মল্ করে ওঠে।

এ্যানড্রেস্ শয্যা ত্যাগ করে বাইরে বেরুবার পোশাক পরে' নেয়। মেরী কিন্তু সবিস্ময়ে দেখতে পায় তার হাতের সেই আংটির পাথরটির ঔজ্জ্বল্য কমে গিয়েছে অনেকখানি।

দরজা খুলে বের হতেই এক ঝলক সূর্যালোক এসে পড়ে তাদের মুখে চোখে। কিন্তু বাইরের সমস্ত দৃশ্য দেখে তারা অবাক হয়ে যায়। কিছুই যেন আর চিনতে পারে না তারা। একি অদ্ভুত পরিবর্তন! বনের সেই সজীবতা আর নেই, পাহাড়গুলো যেন আরও অনেক ছোট হয়ে গেছে, নদী প্রায় শুকনো, আকাশের রঙও যেন কেমন ধূসর।

দেবদারু বনের দিকে তাকালে কিন্তু আর সেটায় ভয় হয় না। আগের সেই অন্ধকারও যেন আর সেখানে নেই। বনের পিছনে সেই কুঁড়ে ঘরগুলিও আর আতঙ্ক জাগায় না মনে। গ্রামের বহু লোক এসে তাদের ঘিরে ধরে। রাত্রের সেই প্রলয়ে তাদের আর ঘরবাড়ি নেই।

তারা অবাক হ'য়ে যায় মেরী আর এ্যানড্রেসকে দেখে। ভাবে, এরা কি করে রাত কাটালো। বেদের দলের অভিশাপ লেগেছে গ্রামে। কিন্তু তাদের বাড়ি ঘর কেন উড়ে যায়নি, সেই ভেবে তারা বিস্ময় প্রকাশ করে। তাদের সকলের মুখ শুকনো, বিবর্ণ, পাংশু। এক রাত্রেই তাদের কি অদ্ভুত পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে।

এলফ্রিডা সঙ্গোপনে তার মাকে বলে—"কাল সারারাত আমি ঘুমোতে পারিনি মা! সেই ভয়ঙ্কর বজ্রপাতের সময় আমি একমনে খালি প্রার্থনা করেছি। ঠিক সেই সময়, আমার ঘরের দরজা খুলে গেল। আর আমার সেই খেলার সাথী ঢুকলো দরজা দিয়ে। আমার কাছ থেকে বিদায় নিতে এসেছিল সে। তার পরনে ছিল একটা ভ্রমণেব পোশাক, মাথায় ছিল একটা টুপি, আর হাতে ছিল প্রকাণ্ড একটা লাঠি। তোমার উপরে সে ভারি রেগে গিয়েছে মা। তোমার ঐ কাণ্ডের ফলে আজ তাকে নানা শাস্তি ভোগ করতে হচ্ছে। সে কিন্তু তোমায় খু-ব ভালবাসতো মা। তোমাকে ভালোবাসতো বলেই সে আমার কাছে আসতো: নইলে আর কেউ এখানে আসা পছন্দ করতো না মোটেই।"

মেরী তাকে একথা আর কাউকে বলতে নিষেধ ক'রে দেয়।

এই সময় খেয়াঘাটের এক মাঝি আসে। সে এসেই নতুন একটা খবর দেয় সকলকে। সে বলে—"কাল রাতে হঠাৎ এক আগন্তুক এসে হাজির। লম্বা চওড়া প্রকাণ্ড চেহারা তার। রাত্রের জন্য আমার কাছ থেকে সে নৌকাটা ভাড়া নিয়ে চলে যায় একসর্তে। সে সর্ত হ'লো আমি ঘর থেকে এক পাও বের হব না। আমি তখন রীতিমত ভয় পেয়ে গেছি। সারারাত এই অদ্ভুত নৌকা ভাড়ার জন্যে আর ঘুমোতে পারি না। জানালা দিয়ে আমি তাকিয়ে থাকি নদীর দিকে। আকাশে তখন বড় বড় মেঘ উড়ে চলেছে; দূরের ঐ বনে শব্দ হচ্ছে

ঝড়ো হাওয়ার। উঃ সে কি আওয়াজ! আমার মনে হ'লো, আমার ছোট্ট কুঁড়ে বুঝি আর থাকে না, ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে যায়। একটু পরেই চতুর্দিকে উঠ্‌লো দারুণ আর্তনাদ আর কোলাহল। হঠাৎ দেখতে পেলাম একটা সাদা আলো এসে পড়ছে লম্বা ভাবে। ক্রমেই সেটা বড় হ'তে লাগলো। কি আলো তার। মনে হ'লো যেন হাজারে হাজারে আকাশের তারা একসঙ্গে আলো দিচ্ছে। জ্বল্‌ জ্বল্‌ করছে সেই আলোর তীব্র জ্যোতি। দেবদারু বন থেকে এই আলো আরম্ভ হয়ে মাঠের ওপর দিয়ে সোজা নদীর বুকে এসে পড়ে। তারপর, আমি শুনলাম, কারা যেন কাছেই হেঁটে বেড়াচ্ছে, নাচ্‌ছে, দৌড়োচ্ছে, কথা বল্‌ছে। শব্দটা আমার নৌকার দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। মনে হ'লো যেন, ছেলে-বুড়ো বহু নরনারী উঠ্‌লো সেই নৌকায়। তাছাড়া আরও অনেক রকম উজ্জ্বল মূর্তি দেখা গেল নদীর ওপরে। সবই ভারি অদ্ভুত ধরনের। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি, সাদা সাদা মেঘ আর আলো ঘুরে বেড়াচ্ছে চতুর্দিকে। সকলেই তখন কান্না জুড়ে দিয়েছে। তাদের প্রিয় ঘরবাড়ি ছেড়ে চ'লে যেতে হচ্ছে ব'লেই তারা তখন কাঁদছিল। জলের মধ্যে দাঁড়ের ছপাৎ ছপাৎ শব্দ হ'লো। নৌকাটি বহুবার এপার থেকে ওপারে যেতে লাগলো লোকজন আর জিনিস পত্তর নিয়ে। কি অদ্ভুত চেহারা সেই লোকগুলির। অমন চেহারা জীবনে কখনো দেখিনি। ঠিক যেন সব অপদেবতার দল; ভূত-প্রেত আর কি কি জানি! সে এক পরমেশ্বরই জানেন। এসব লোক পার হয়ে গেল। সেই লম্বা লোকটিই পার করলো সবাইকে। তার পর এলো এক অপূর্ব রাজপুরুষ। কি উজ্জ্বল তার চেহারা। লোকটি অবিশ্যি বুড়ো হয়েছে বেশ। দেখতে পেলাম একটা সাদা ঘোড়ায় চ'ড়েই সে এসেছে। বহুলোক তাকে ঘিরে রয়েছে চারধারে।

ঘোড়াকে আমি পুরোপুরি ভালো করে দেখতে পাইনি, মাথাটাই কেবল দেখেছি। কারণ, তার সর্বাঙ্গ ছিল দামী পোশাকে ঢাকা। আলোয় তা ঝকমক্ করছিল। বুড়ো লোকটির মাথায় ছিল একটা মুকুট। সেটা এত উজ্জ্বল যে, আমি ভেবেছিলাম সূর্যিঠাকুর বুঝি বা তার মাথা থেকে কিরণ ছড়াচ্ছেন। এই ভাবে সমস্ত রাত কেটে গেল। তারপর আর মনে নেই। কারণ আমি তারপরই গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আমার মনে তখন একদিকে অভূতপূর্ব আনন্দ, অন্য দিকে অজানার আতঙ্কও ছড়িয়ে পড়েছে। সকাল বেলায় উঠেই কিন্তু দেখতে পেলাম সব শান্ত। নদীও বয়ে যাচ্ছে ঠিকভাবে, আর আমার নৌকাও রয়েছে খেয়াঘাটে। কিন্তু ও নৌকো আমি ছুঁতে আর সাহস পাচ্ছি না মোটে!

সেই বছরই গ্রামে দারুণ অজন্মা হ'লো। এক ফোঁটা বৃষ্টি নেই কোথাও। গাছের পাতা গেল ঝ'রে, নদীর জল গেল শুকিয়ে। শরৎকালে যে জায়গার দৃশ্য পথিকজনের মন ভোলাত, আজ সে জায়গার আর সে রূপ নেই। চতুর্দিকে একটা শূন্যতা ও রিক্ততা বিরাজ করছে সর্বক্ষণ। ধূ ধূ করছে রুক্ষ মাঠ, ধূ ধূ করছে বালুকাময় শূন্য নদীতট। ঘাসের চিহ্নও যেন কোথাও নেই। এতটুকুন ফলের গাছগুলি সব গেছে শুকিয়ে। দ্রাক্ষাবন আজ নিশ্চিহ্ন। চতুর্দিকে আবহাওয়া এতই বিষাদ-মলিন হয়ে উঠলো যে, রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে রাজামশাই তাঁর স্বজন পরিজনদের নিয়ে স্থানান্তরে চ'লে গেলেন। ধীরে ধীরে একদিন সেই রাজপ্রাসাদ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হ'লো।

এল্‌ফ্রিডা সারা দিন-রাত কেবল সেই গোলাপ ফুলটির দিকে তাকিয়ে থাকে, আর তার খেলার সাথী সেই সুন্দরী জেরিনার কথা ভেবে কাঁদে। ক্রমে যেদিন সেই ফুলটিও ঝরে পড়লো এল্‌ফ্রিডাও সেদিন দীর্ঘনিঃশ্বাস

ত্যাগ করলো চিরদিনের জন্য। বসন্ত সমাগমের পূর্বেই ফুলের মত এই সুন্দর মেয়েটিও ঝরে গেল অকালে।

মেরী মাঝে মাঝে সেই কুঁড়েঘরগুলির দিকে তাকিয়ে থাকে, আর ভাবে তার পুরোনো উজ্জ্বল মুহূর্তগুলির কথা। কি শান্তি আর কি আনন্দেই না কেটেছে তার সে সময়। মেয়ের মত সেও ক্রমশঃ শুকিয়ে যায় বিষাদে আর চিন্তায়। একদিন সেও শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে চলে যায় স্বর্গে।

বৃদ্ধ মার্টিন তখন জামাইয়ের হাত ধ'রে তাদের পুরোনো বাড়িতে ফিরে যায়।

—সমাপ্ত—